ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার

দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস

দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস

মূল ঃ ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার

অনুবাদ ঃ এম. আনিসুজ্জামান

খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০
ফোন ঃ ৭১১৭৭১০, ৭১১৭০৮৪

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

সীমান্তে বিদ্রোহী শিবির ॥ ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অবিরাম ষড়যন্ত্র ॥ ৩৩
— শাহ্ নিয়ামত উল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী ॥ ৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমান আইনবিদদের সিদ্ধান্ত ॥ ৯২
— তিনটি শর্ত, যার ফলে একটা ইসলামী দেশ
দারুল-হার্ব বা শত্রু দেশে পরিণত হয় ॥ ১০৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃটিশ শাসনে ভারতীয় মুসলমানদের অন্যায় ॥ ১২৬
— বাংলায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্টনের
খতিয়ান ঃ এপ্রিল, ১৮৭১ ॥ ১৪৮
পরিশিষ্ট ॥ ১৮৮

দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস

প্রথম পরিচ্ছেদ

সীমান্তে বিদ্রোহী শিবির

বাংলার মুসলমানরা আবার এক বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। আমাদের সীমান্তে বিদ্রোহীদের উৎপাত চলেছে বহু বছর যাবত। তারা একেক দল ধর্মান্ধকে পাঠিয়েছে, যারা আমাদের শিবির আক্রমণ করেছে, গ্রাম পুড়িয়েছে, আমাদের প্রজাদের হত্যা করেছে এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে তিন-তিনটি ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। আমাদের সীমান্তের ওপারে মাসের পর মাস ধরে গড়ে ওঠা শত্রু-বসতির লোক নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের প্রদেশসমূহের সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছে এক ষড়যন্ত্রের জাল,পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত জনহীন পর্বতরাজির সঙ্গে উষ্মমণ্ডলীয় গঙ্গা অববাহিকার জলাভূমি অঞ্চলে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে রাজদ্রোহীদের নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে। সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় তারা ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে অর্থ ও লোক সংগ্রহ করে এবং দুই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী শিবিরে তা চালান করে দেয় আমাদেরই তৈরি করা রাস্তা দিয়ে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বিপুল সম্পদের অধিকারী বহু লোক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সুকৌশলে অর্থ পাচারের এমন এক পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করেছে, যাতে রাজদ্রোহের চরম বিপদসংকুল অভিযান রূপান্তরিত হয়েছে নিরাপদ ব্যাংক ব্যবসার আদান-প্রদানে।

মুসলমানদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অধিক ধর্মান্ধ তারা এইভাবে রাজদ্রোহিতামূলক প্রকাশ্য তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। আর এই বিদ্রোহের প্রতি নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে প্রকাশ্যেই শলা-পরামর্শ করছে গোটা মুসলমান সম্প্রদায়। বিগত নয় মাস যাবত বাংলার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলোর পৃষ্ঠাসমূহ ভর্তি হয়েছে রানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের কর্তব্য সম্পর্কিত আলোচনায়। উত্তর ভারতের মুসলমানী আইনবিশারদ

ব্যক্তিগণের সমষ্টিগত অভিমত সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় একটি ফতোয়ারূপে। এর পরেই বাংলার মুসলমানরা এই বিষয়টি সম্পর্কে এক প্রচারপত্র বিতরণ করে। এমনকি ভারতের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র যে শিয়া সম্প্রদায় তারাও এই প্রচার অভিযান থেকে বিরত থাকতে পারেনি। মুসলমানদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত রাজানুগত তারা এই রাজদ্রোহ থেকে নিবৃত্ত থাকলে তাদের আখেরাত নষ্ট হবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যেভাবে গলদঘর্ম হয়ে চেষ্টা করছিল, তা দেখে ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র কয়েক মাস হাসি সম্বরণ করতে পারেনি। কিন্তু মুসলমানী আইনবিশারদ পণ্ডিতদের সার্বিক ফতোয়া জারির পর আমাদের দেশবাসী নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করেন যে, বিষয়টা একদিকে যেমন গুরুতর তেমনি অপরদিকে নিতান্তই হাস্যকর। মুসলমানদের প্রণীত ও প্রচারিত যাবতীয় প্রচার-পত্রাদি থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভারত সাম্রাজ্য এক বিপদ-সংকুল অবস্থা অতিক্রম করছে। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেকটি মানুষ বর্তমান অবস্থায় অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অধিক বেপরোয়া তারা বহু বছর যাবত প্রকাশ্য রাজদ্রোহিতায় লিপ্ত আছে। পক্ষান্তরে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা সর্বকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক প্রশ্নে আলোড়িত হচ্ছে। মুসলমানী আইনে বিদ্রোহকে আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্যভাবে একটি অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কোন-না-কোনভাবে যেন প্রত্যেকটি মুসলমানের প্রতি নির্দেশ জারি হয়েছে বিদ্রোহের প্রশ্নে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবার। স্ব-ধর্মাবলম্বীদের কাছে স্পষ্ট করে তাকে বলতে হবে, আমাদের সীমান্তের বিদ্রোহী শিবিরের প্রতি তার সমর্থন আছে কিনা, তাকে চূড়ান্তভাবে স্থির করতে হবে সে ইসলামের একাগ্র অনুসারীর ভূমিকা পালন করবে, না রানীর শান্তিকামী প্রজার ভূমিকা পালন করবে। এই প্রশ্নে মুসলমানরা যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, সেজন্যে তারা কেবলমাত্র ভারতের মুসলমানী আইনবিশারদগণের সঙ্গেই নয়, মক্কার পণ্ডিতগণের সঙ্গেও শলা-পরামর্শ করেছে। ভারতীয় মুসলমানদের বিদ্রোহে যোগদান করা-না-করার প্রশ্নটি আরবের পবিত্র নগরীর ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে মাসের পর মাস যাবত আলোচিত হয়েছে।

আমাদের মুসলমান প্রজাদের মধ্যে এই অসন্তোষের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এর তিনটি প্রবণতার বিষয় তুলে ধরতে চাই। প্রথমত যেসব ঘটনার ফলে আমাদের সীমান্তে বিদ্রোহী উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল সংক্ষেপে তার

বিবরণ দান করব এবং সেই বিদ্রোহী উপনিবেশ বৃটিশ শক্তিকে ক্রমাগতভাবে যেসব বিপদে জড়িয়ে ফেলেছিল তার কতকগুলো পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে রাজদ্রোহী সংগঠনের মাধ্যমে বিদ্রোহীরা ভারত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ এলাকাসমূহ থেকে অর্থ ও জনবলের অবিরাম সরবরাহ লাভ করত সে সম্পর্কে আলোচনা করব। তারপর এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির দরুন যেসব আইনগত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো বিবৃত করব। বিদ্রোহের প্রবক্তারা তাদের নীতি-কথার যে বিষ ছড়াতো মুসলমান জনসাধারণ কিভাবে তা সাগ্রহে পান করত, আর মুষ্টিমেয় কিছু লোক তাদের পবিত্র আইনের সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিদ্রোহে যোগদানের কর্তব্য থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য কিভাবে আকুল প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হত, এই আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু কেবলমাত্র এই আলোচনা করেই যদি বক্তব্য শেষ করি, তাহলে শুধু অর্ধেক সত্য উদঘাটিত হবে। ভারতের মুসলমানরা বহুদিন থেকেই ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতি একটা অবিরাম বিপদের উৎসরূপে বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে। কোন না কোন কারণে তারা আমাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। অপেক্ষাকৃত নমনীয় হিন্দু সম্প্রদায় যেসব পরিবর্তন সানন্দচিত্তে মেনে নিয়েছে, মুসলমানরা সেগুলোকে মনে করেছে মহা অন্যায়। সুতরাং ইংরেজ শাসনাধীনে মুসলমানদের অসন্তোষের প্রকৃত কারণ এবং এই অসন্তোষ দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে আমি আলোকপাত করব এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে।

পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী শিবিরের গোড়াপত্তন করে সৈয়দ আহমদ।[১] অর্ধ শতাব্দী আগে আমরা পিণ্ডারী শক্তিকে নির্মূল করার ফলে যে কয়জন তেজস্বী পুরুষ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, সৈয়দ আহমদ তাদের অন্যতম। কুখ্যাত এক দস্যুর[২] অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে সে জীবন আরম্ভ করে এবং বহু বছর যাবত মালওয়া অঞ্চলের আফিমসমৃদ্ধ গ্রামসমূহে লুটতরাজ চালায়। রঞ্জিত সিংহের নেতৃত্বে উদীয়মান শিখ শক্তি তাদের মুসলমান প্রতিবেশীদের উপর যে কঠোর নির্দেশ জারি করে, তার ফলে মুসলমান দস্যুদের কার্যকলাপ বিপদসংকুল হয়ে পড়ে এবং

---

[১] বৃটিশ ভারতের রায় বেরিলী জেলার বাসিন্দা। জন্ম ১২০১ হিজরী, মোহরম, খ্রীঃ ১৭৮৬।

[২] আমীর খান পিণ্ডারী, পরবর্তীকালে টংকের নওয়াব।

লাভজনক থাকে না। পক্ষান্তরে শিখদের গোঁড়া হিন্দুয়ানীর দরুন উত্তর ভারতের মুসলমানদের উৎসাহে ইন্ধন সৃষ্টি হয়। সৈয়দ আহমদ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সে দিল্লীতে চলে যায় মুসলমানী আইনের একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির[১] কাছে পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। তিন বছর সেখানে শিক্ষানবিসীর পর সে নিজেই একজন প্রচারক হিসেবে কাজ শুরু করে। ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে যেসব কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করেছিল, সাহসের সঙ্গে সেগুলোর বিরুদ্ধে সে আক্রমণ চালাবার ফলে দুর্ধর্ষ একদল ভক্ত অনুসারী তার পশ্চাতে সমবেত হয়। সর্বপ্রথম সে তার প্রচার অভিযান শুরু করে রোহিলাদের[২] বংশধরগণের মধ্যে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে এই রোহিলাদিগকে নির্মূল করার জন্য অর্থের বিনিময়ে অন্যায়ভাবে আমাদের সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। রোহিলাদের করুণ ইতিহাস ওয়ারেন হেস্টিংসের চরিত্রে এক অনপনেয় কালিমা লেপন করে রেখেছে। বিগত পঞ্চাশ বছর যাবত রোহিলাদের বংশধররা মৃত্যুপণ করে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। এখনো আমাদের সীমান্তের বিদ্রোহী উপনিবেশে নিয়োজিত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অসিচালক রোহিলা বীরেরা। ভারতে আমরা যেসব অন্যায় করেছি, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় রোহিলাদের ক্ষেত্রেও আমরা লাভ করেছি সে অন্যায়ের উপযুক্ত প্রতিদান।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মীয় নেতা ধীরে ধীরে দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। আধ্যাত্মিক মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ শিষ্যরা এই ভ্রমণকালে তার সেবাযত্ন করতে থাকে। সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্বান লোকরা পর্যন্ত সাধারণ ভৃত্যের মত নগ্নপদে তার পাল্কীর পাশে পাশে দৌড়ে অগ্রসর হয়। পাটনায় দীর্ঘ যাত্রা বিরতিকালে তার অনুগামীর সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য রীতিমত একটা সরকার গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যাত্রা পথে অবস্থিত বড় বড় শহরে ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর কর আদায়ের জন্য সে প্রতিনিধি নিয়োগ করে কাফেলার আগে তাদের পাঠিয়ে দেয়। তদুপরি সে মুসলমান সম্রাটদের প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগের অনুকরণে আনুষ্ঠানিক ফরমান জারি করে চারজন খলিফা নিয়োগ করে।[৩] এইভাবে পাটনায় একটি

---

[১] শাহ্ আবদুল আজিজ।

[২] রোহিলাখণ্ডের অন্তর্গত রামপুরার সন্নিকটে ফয়জুল্লাহ খানের জায়গীরে।

[৩] মৌলবী বেলায়েত আলী; মৌলবী এনায়েত আলী; মৌলবী মরহুম আলী ও মৌলবী ফরহাত হোসেন।

স্থায়ী আস্তানা স্থাপনের পর সে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়ার সময় সে বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে এবং পথিপার্শ্বের সকল বড় বড় শহরে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে। কলকাতায় এত অধিক সংখ্যক লোক তার চারপাশে সমবেত হয় যে, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে মুসাফাহা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে মাথার পাগড়ী খুলে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে সে ঘোষণা করে যে, পাগড়ীর যে-কোন অংশ স্পর্শ করলেই সে ব্যক্তি তার শিষ্যত্ব লাভ করবে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে সে হজ্জ করতে মক্কা গমন করে। এইভাবে হজ্জের পবিত্র আবরণে সে তার প্রাক্তন দস্যু চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে পরবর্তী বছর অক্টোবর মাসে বোম্বাই হয়ে ফিরে আসে। বোম্বাই শহরেও ধর্ম প্রচারক হিসেবে সে কলকাতার মতই বিরাট সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু ইংরেজদের একটি প্রেসিডেন্ট শহরের শান্তিপূর্ণ অধিবাসীবৃন্দ অপেক্ষাও উপযুক্ত ক্ষেত্র এই দস্যু দরবেশের সম্মুখে বিরাজমান ছিল। উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে তার নিজের জেলা বেরিলীতে সে বহুসংখ্যক অশান্ত প্রকৃতির লোককে[১] শিষ্য তালিকাভুক্ত করে নেয়। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে সে পেশোয়ার সীমান্তের অসভ্য পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে উপস্থিত হয় এবং পাঞ্জাবের শিখ অধ্যুষিত সমৃদ্ধ শহরগুলোতে পবিত্র জিহাদের বাণী প্রচার করতে থাকে।

পাঠান উপজাতীয়রা উন্মত্ত আগ্রহসহকারে তার আবেদনে সাড়া দেয়। মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্দান্ত এবং সর্বাধিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই পাঠানরা ধর্মীয় অনুমোদনক্রমে তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের লুণ্ঠন করার সুযোগ পেয়ে অতিমাত্রায় আনন্দিত হয়। তখন পাঞ্জাব ছিল আধুনিককালের হিন্দু গোত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক পরাক্রমশালী শিখদের শাসনাধীন। সীমান্তবাসী ধর্মান্ধ মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় নেতার কাছে আশ্বাস লাভ করে যে, জিহাদে যারা বেঁচে থাকবে, তারা ঘরে ফিরতে পারবে লুণ্ঠিত সম্পদের মোটা পরিমাণ বখরা নিয়ে। আর যাদের মৃত্যু হবে, তারা সেই মুহূর্তেই ঈমানদার শহীদ হিসেবে বেহেশ্‌তে স্থানলাভ করবে। কান্দাহার ও কাবুল অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার পথে সে জনসাধারণকে জাগ্রত করতে থাকে এবং সুকৌশলে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি[২] স্থাপনের মাধ্যমে তাদের উপর নিজের প্রতিপত্তি সুসংহত করে। ধনলিপ্সা চরিতার্থ করার

---

[১] শাহ মোহাম্মদ হোসেন কর্তৃক দীক্ষিত।

[২] প্রধানত ইউসুফজাই ও বাবাকজাই উপজাতি।

জন্য তাদের ব্যাপক লুঠতরাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে, শিখ থেকে আরম্ভ করে চীনবাসী পর্যন্ত দুনিয়ার সকল অবিশ্বাসীদের ধ্বংস সাধন করার জন্য সে ঐশ্বরিক আদেশ লাভ করেছে। পার্বত্য এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বৈষয়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন উপজাতীয় প্রধানদের সে প্রতিবেশী শিখ শক্তিকে দমন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশদভাবে বুঝাতে থাকে এবং এই প্রসঙ্গে হিন্দু রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে অতীতে তীব্র ঘৃণাজনিত তার তিক্ত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে। এইভাবে ধর্মীয় ইশতেহার সাফল্যমণ্ডিত করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর সে ধর্মপ্রাণ সকল মুসলমানের প্রতি জিহাদে যোগদানের জন্য আল্লাহ্‌র নামে আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান জানায়। এই বিচিত্র প্রচারপত্রে বলা হয় ঃ 'শিখ জাতি দীর্ঘকাল যাবত লাহোরে এবং অন্যান্য স্থানে প্রভুত্ব করে আসছে। তাদের নির্যাতনের পরিমাণ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার মুসলমানকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং আরো হাজার হাজার মুসলমানের উপর তারা নিক্ষেপ করেছে স্তূপীকৃত লাঞ্ছনা। মসজিদ থেকে তারা আযান দিতে দিচ্ছে না এবং গরু জবাই করা তারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। তাদের এই অবমাননাকর স্বৈরাচার অবশেষে যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন হযরত সৈয়দ আহমদ (রঃ) ঈমান রক্ষা করার একমাত্র উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে কাবুল ও পেশোয়ার অভিমুখে রওনা হন। সেখানে গিয়ে তিনি নিস্পৃহতার নিদ্রায় মগ্ন মুসলমানদিগকে জাগ্রত করেন এবং সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য তাদের সাহস উজ্জীবিত করেন। আল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহ্‌! তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মুসলমান আল্লাহ্‌র রাহে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছে। ১৮২৬[১] খ্রীস্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর বিধর্মী শিখদের বিরুদ্ধে এই জিহাদ শুরু হবে।' ইতিমধ্যে উত্তর ভারতের যেসব শহরে এই পীর বহুলোককে মুরীদ করে রেখে এসেছিল, সেসব স্থানে চর পাঠিয়ে জিহাদের আহ্বান প্রচার করা হয়। উপরে যে ইশতেহারটি উদ্ধৃত করা হল সেটা অযোধ্যা প্রদেশে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।[২]

অতঃপর শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে কে জয়লাভ করে তা সঠিক বলা যায় না। উভয় পক্ষই নির্মম হত্যাকাণ্ড

---

[১] ২০ শে জমাদিউস্‌সানি, ১২৪২ হিঃ।

[২] কনৌজের জনৈক মৌলবী প্রণীত 'তারগিব্‌-উল-জিহাদ'।

চালায়। মুসলমান মুজাহিদ এবং শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন যে তিক্ত ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল, এখনো স্থানীয় বহু আচার-আচরণে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। রঞ্জিত সিংহ সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য এমন কয়েকজন সুদক্ষ সেনাপতিকে নিয়োগ করে, যাঁরা নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী ভেঙ্গে যাওয়ার পর বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পেশোয়ারের কৃষকদের মুখে ভাগ্যবান ইতালীয় সেনাপতি জেনারেল আভিতাবিলির[১] নাম এখনো শুনতে পাওয়া যায়। মুসলমানরা সমতল এলাকায় একাদিক্রমে হামলা চালাতে থাকে এবং যেখানেই তারা হামলা করে সেখানেই হত্যা ও অগ্নি সংযোগের ধ্বংসলীলা সাধন করে। পক্ষান্তরে গ্রামবাসী বীর শিখরা সামগ্রিকভাবে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পার্বত্য ধর্মান্ধদের পরাভূত করে এবং জানোয়ারের মত তাড়া করে তাদের পার্বত্য নিবাসে ফেরত পাঠায়। সেকালের ক্রোধোন্মত্ততার ফলে যে ভয়াবহ ভূমি রাজস্ব প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। — রক্তের বিনিময়ে ভূমিস্বত্ব—তার নমুনা এখনো বিদ্যমান আছে। সীমান্তের হিন্দু অধিবাসীরা আজো গর্বের সঙ্গে প্রদর্শন করে সেকালের পত্তনি পাট্টা, যার বলে তাদের গ্রাম পত্তন দেওয়া হয়েছিল হোসেন খেল উপজাতীয়দের একশো মাথা বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে।

নিয়মিত যুদ্ধে সুশৃংখল শিখ বাহিনীর সঙ্গে কোলাহলময় মুসলমান সৈন্যদের কোন তুলনা ছিল না। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান ধর্মীয় নেতা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে শিখদের একটি পরিখাবেষ্টিত শিবির আক্রমণ করে। শিখরা বহু সংখ্যক মুসলমান হত্যা করার পর এই আক্রমণ প্রতিহত হয়। কিন্তু সমতলবাসী শিখ সেনাপতি তার এই বিজয় অব্যাহত রাখতে পারে না। ধর্মান্ধ মুসলমানরা সিন্ধু নদীর অপর পারে গিয়ে তাদের তৎপরতা চালাতে থাকে। গেরিলা যুদ্ধে সাফল্যের দরুন তাদের প্রতাপ এতটা বৃদ্ধি পায় যে, শিখ সর্দার তখন আক্রমণকারী উপজাতীয়দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। ১৮২৯ সালে সমতলবাসীরা তাদের সীমান্ত রাজধানী পেশোয়ারের নিরাপত্তা রক্ষা করার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন সেখানকার গভর্নর[২] মুসলমান নেতাকে বিষ প্রয়োগের দ্বারা যুদ্ধ অবসানের হীন অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এই গুজব ছড়িয়ে পড়ার ফলে পার্বত্য মুসলমানদের উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তারা সমতল অঞ্চলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কাফের সৈন্যবাহিনীকে নিধন করে ও তাদের সেনাপতিকে

---

[১] জাতীয়তা ও নামের বানান যেরূপ প্রচলিত আছে, সেরূপ ব্যবহার হয়েছে।

[২] গভর্নর মুসলমান হলেও রঞ্জিত সিংহের হাতের পুতুল ছিল।

মারাত্মকভাবে জখম করে। তবে রাজপুত্র শের সিংহ এবং জেনারেল ভেনতুরার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী কোন প্রকারে পেশোয়ার রক্ষা করতে সমর্থ হয়। এর ফলে মুসলমান ধর্মনেতার প্রভাব কাশ্মীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভারতের অসন্তুষ্ট রাজন্যবর্গের সৈন্যবাহিনী তার শিবিরে সমবেত হয়। শিখ রাষ্ট্রপ্রধান রঞ্জিত সিংহ তখন তার কতিপয় শ্রেষ্ঠ কুশলী সেনাপতির অধীনে দ্রুত সেখানে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে একবার পরাজিত[১] হলেও মুসলমান বাহিনী বিপুল পরাক্রমে সমতল এলাকা পদানত করে। ঐ বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই পাঞ্জাব রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজধানী পেশোয়ার শহরের পতন ঘটে।

এইখানেই শুরু হয় ধর্মীয় নেতার জীবনের শীর্ষস্থান লাভের মোড় পরিবর্তন। সে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করে এবং স্বনামে মুদ্রার প্রবর্তন করে ও তাতে এই বাণী খোদিত করে— 'ন্যায়পরায়ণ আহমদ, ঈমানের রক্ষক, যার শানিত তরবারির ঝলকানিতেই কাফের ধ্বংস হয়।' অপরদিকে পেশোয়ারের পতনের দরুন যে বিহ্বলতার সৃষ্টি হয়, তার ফলে রঞ্জিত সিংহ তার অতুলনীয় কূটনীতি সমর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, ধূর্ত শিখ প্রধান ক্ষুদ্র মুসলিম রাজন্যবর্গের কাছে তাদেরই স্বার্থ রক্ষার আবেদন জানিয়ে তাদের সৈন্যদলকে মুজাহিদ বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মুসলমান ধর্মীয় নেতা তখন মুক্তিপণের বিনিময়ে পেশোয়ারের দখল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া তার অনুগামীদের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল শুরু হয়েছিল, সেটা অনতিকাল মধ্যেই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তার নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিল হিন্দুস্তানী ধর্মান্ধ মুসলমান আর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সেই সব মুসলমানদের নিয়ে, যারা সুদিনে, দুর্দিনে, সর্বদা আপন ভাগ্য গ্রথিত করেছিল নেতার ভাগ্যের সঙ্গে এবং যাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল তাকে ত্যাগ করা। অবশ্য সীমান্তের বহু সংখ্যক পাঠান মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করার ফলে এই বাহিনীর কলেবর স্ফীত হয়। পাঠানরা একদিকে যেমন ছিল শৌর্যশালী, অপরদিকে তেমনি তাদের ছিল পার্বত্য জাতিসুলভ অহঙ্কার এবং ধনলিপ্সা। একবার যুদ্ধের প্রাক্কালে[২] সীমান্তবাসী উপজাতীয়দের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি দলত্যাগ করেছিল। পরবর্তীকালে ধর্মান্ধরা

---

[১] জেনারেল এলার্ড এবং হরিসিং নলওয়ার অধীন শিখ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ।

[২] সাইদুর নিকটবর্তী স্থানে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে যারাকজাই উপজাতীয়রা দলত্যাগ করেছিল।

তাদের উপর কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ধর্মীয় নেতা তার হিন্দুস্তানী অনুগামীদের উপর সর্বদা নির্ভর করতে পারত। ফলে সে তাদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণের প্রয়োজনবোধ করে। প্রথমে সে তার হিন্দুস্তানী অনুগামীবৃন্দের ভরণপোষণের জন্য কেবল সীমান্তবাসী অনুগামীদের উপর "তিথ" কর প্রয়োগ করে। সীমান্তবাসীরা ধর্মীয় কার্যে চাঁদা হিসেবে নির্বিবাদে এই করভার বহন করে। কিন্তু পরে এই করভারে জর্জরিত উভয় পক্ষ উত্থানিত হয়ে উঠলে ধর্মীয় নেতা বেকায়দায় পড়ে যায়। সৈয়দ আহমদের প্রতিভা ছিল ধর্মান্ধ গৃহদাহকারীর প্রতিভা, সম্মিলিত রাজ্যের নিরপেক্ষ শাসনকর্তার প্রতিভা নয়। সুতরাং সীমান্তের উপজাতীয়দের উপর তার যে আশ্চর্য প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল, অনতিকাল পরই তা বিনষ্ট হতে শুরু করে।

ক্ষমতায় যতই ভাটা পড়তে থাকে, ক্রমান্বয়ে ততই তার কঠোরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে পার্বত্য জাতির হৃদয়ের কোমলতম তন্ত্রীতে একদিন সে আঘাত করে। পার্বত্য উপজাতিদের প্রচলিত বিবাহ প্রথা অনুসারে তারা বিবাহের নামে কার্যত সর্বোচ্চ পণদানকারীর কাছে মেয়ে বিক্রি করত। সৈয়দ আহমদের দুর্বুদ্ধি হল এই বিবাহ প্রথার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করার। তার ভারতীয় অনুগামী দল নিজেদের বাড়িঘর ত্যাগ করে তার সঙ্গে চলে এসেছিল এবং স্ত্রীরাও তাদের সঙ্গে ছিল না। নেতা ফরমান জারি করল যে, সেইদিন থেকে বারোদিনের মধ্যে কোন উপজাতীয় মেয়ের বিবাহ না হলে সেই মেয়ে তার (নেতার) অনুচরদের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। এর ফলে উপজাতীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে তার হিন্দুস্তানী অনুচরবর্গকে হত্যা করে। নেতার প্রাণ রক্ষা পায় অতি অল্পের জন্য।[১] কিন্তু তার রাজত্বের অবসান ঘটে। ১৮৩১ সালে ধর্মীয় নেতা তার একজন প্রাক্তন অনুচরকে সাহায্য করার সময় রাজপুত্র শের সিংহের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর দ্বারা অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়ে নিহত হয়।[২]

উপরে বর্ণিত আন্দোলনের ধর্মীয় চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের পরবর্তী একটি অধ্যায়ে করা হয়েছে। ভারতেই হোক বা অন্য কোন দেশেই হোক কোন ধর্মীয় নেতাই জনসাধারণের হৃদয় জাগ্রত করতে পারে না, যদি তার নিজ উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও অকপটতা সম্পর্কে

---

১. পাঞ্জতার থেকে পাকলী উপত্যকায় পলায়ন।

২. বালাকোট, মে. ১৮৪১ খ্রীঃ। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দফতর থেকে তথ্য সংগৃহীত।

সে নিজেই আস্থাশীল না হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমি সৈয়দ আহমদের জীবনের অপেক্ষাকৃত মহৎ দিকগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করব। ইতিমধ্যেই আমি ধর্মান্ধ বসতি গোড়াপত্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে অর্থাৎ আমাদের আপন সীমান্তে বিদ্রোহী শিবির পর্যায়ে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বাকী ইতিহাস আমি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। ধর্মীয় নেতার প্রধান অনুচরদের মধ্যে দুই ভাই ছিল, যাদের পিতামহ ছিল কুখ্যাত এক নরহন্তা।[১] অবশেষে নিজের জীবন রক্ষার জন্য সে সিন্ধুর ওপারে পার্বত্য এলাকায় পলায়ন করে এবং তদঞ্চলে সিত্তানা নামক স্থানে দরবেশরূপে আস্তানা স্থাপন করে। এই মুহাজির দরবেশ ক্রমান্বয়ে পার্বত্য উপজাতিসমূহের শ্রদ্ধা অর্জন করতে থাকে। যেস্থানে দরবেশের আস্তানা স্থাপিত হয়েছিল পার্বত্য অধিবাসীবৃন্দ সেই স্থানটি নিরপেক্ষ আশ্রম হিসেবে দরবেশকে দান করে। এইসব উপজাতীয়রা প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের নিজেদের জন্য এরূপ একটি আশ্রমের ব্যবস্থা করা খুবই সুবিধাজনক সৎকার্য। এই দরবেশের অন্যতম পৌত্র[২] ছিল ধর্মীয় নেতার বাজ্যক্ষি। আস্তানাসহ সিত্তানা গ্রামটির উত্তরাধিকার লাভ করেছিল সে। ধর্মীয় নেতার মৃত্যুর পর তার অবশিষ্ট মুরিদানকে সে সিত্তানায় ডেকে নিয়ে আশ্রয়দান করেছিল।

প্রায় অনুরূপ সময় সোয়াত রাজ্যের ধর্মীয় প্রধান বৃটিশ শক্তির অগ্রগতি দেখে শংকিত হয়ে পড়ে এবং সেখানে একটি রাজকীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর হয়। তদনুসারে সে উপরোক্ত দরবেশের অপর পৌত্রকে[৩] সেখানে আমন্ত্রণ করে এবং তাকে সোয়াতের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। এইভাবে এই ধর্মীয় প্রধান স্বীয় রাজ্যের প্রজাদের স্বাভাবিক শৌর্যবীর্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাদের আশ্বাস দেয় যে, মুজাহিদ বাহিনীর একজন বীরকে তারা সেনানায়ক হিসেবে পেয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে ইংরেজ অথবা হিন্দু কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে যারা প্রাণ হারাবে, তারা অর্জন করবে শাহাদাতের সওয়াব। অবশ্য সোয়াত উপজাতির সে আশংকা কোনদিনই বাস্তবে পরিণত হয়নি। তাদের রাজা নির্বিঘ্নে রাজত্ব করার পর কোন উত্তরাধিকারী নির্বাচন না করেই ১৮৫৭

---

[১] বোনাইয়ের তখতবন্দ নিবাসী জামিন শাহ।

[২] সৈয়দ উমর শাহ।

[৩] সৈয়দ আকবর শাহ।

খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার পুত্র[১] বর্তমানে সেখানকার পারিবারিক প্রধান। সিত্তানার ধর্মান্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব এবং সোয়াতের টলটলায়মান তথাকথিত রাজসিংহাসনের সে দাবিদার।

এইভাবে ধর্মান্ধ সম্প্রদায় সীমান্ত প্রদেশে তাদের দ্বিমুখী প্রতিপত্তি স্থাপন করে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সীমান্ত উপজাতীয়দের মধ্যে চর নিয়োগ করে জিহাদের অঙ্গার জ্বলন্ত রাখতে থাকে। কালক্রমে এইসব মুজাহিদ নগণ্য দস্যুদলে পরিণত হলেও মাঝে মাঝেই তারা হিংস্র মুজাহিদ বাহিনীর রূপ ধারণ করত। আমরা পাঞ্জাব অধিকার করার আগে পর্যন্ত তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের উপর তারা সীমাহীন ধ্বংসলীলা আর হত্যাকান্ড চালিয়েছে। প্রতি বছর তারা বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন জেলা থেকে গোঁড়া মুসলমানদিগকে তাদের দলভুক্ত করত। বৃটিশ প্রজাবৃন্দ যাতে ধর্মান্ধ উপনিবেশে সমবেত হতে না পারে সেজন্য কোনই সতর্কতা গ্রহণ করা হয়নি। এই ধর্মান্ধরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে শিখদের উপর আক্রোশ চরিতার্থ করত। আর শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল অনিশ্চিত। তারা কখনো ছিল আমাদের বন্ধু আবার কখনো, চরম শত্রু। উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বিরাট নীল কারখানার মালিক এক ইংরেজ ভদ্রলোক আমাকে বলেছেন যে, তাঁর কারখানায় চাকরিতে নিযুক্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে একটা প্রচলিত প্রথা ছিল সিত্তানা শিবিরের চাঁদা দেয়ার জন্য তাদের আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ পৃথক করে রেখে দেওয়ার। আর এদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বেপরোয়া চরিত্রের লোক ছিল, তারা কম-বেশি কিছু না কিছু সময়ের জন্য ধর্মান্ধ নেতাদের অধীনস্থ বাহিনীতে কাজ করতে যেত। তাঁর হিন্দু কর্মচারীরা যেমন পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্রায়ই কেউ না কেউ ছুটির আবেদন করত, ১৮৩০ থেকে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মুসলমান কর্মচারীরা তেমনি ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদানের জন্য কেউ না কেউ কয়েক মাসের ছুটি প্রার্থনা করত।

আমাদের শৈথিল্যের জন্যই আমাদের মুসলমান প্রজাবৃন্দ প্রতিবেশী শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধদের দলে যোগদান করতে পারত। এই শৈথিল্যের জন্য আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। পয়গম্বর (prophet)[২] আমাদের

---

[১] সৈয়দ মুবারক শাহ।

[২] Prophet-কথাটি দ্বারা আমি অবশ্যই সৈয়দ আহমদকে বুঝিয়েছি। প্রকৃত পক্ষে সৈয়দ আহমদ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে 'ইমাম' এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে 'এনি' হযরত মোহাম্মদ (দঃ) -এর আর কেউ পয়গম্বর (Prophet) হননি।

ভূখন্ডে এবং শিখ সীমান্তে তার ধর্মীয় নেতৃত্বের উত্তরাধিকার প্রথা প্রবর্তন করেছিল। এই আন্দোলন তাদের কাছে ছিল কোন নেতা ব্যক্তির জীবন ও মৃত্যুর ন্যায় দৈব ঘটনার আওতা-বহির্ভূত । সুতরাং তার নিজের মৃত্যুকেও তার মুরিদবৃন্দ তাদের ধর্মবিশ্বাস প্রচারের সুবিধার জন্য একটি দৈব অবদান বলে মনে করত। ১৮২১ সালে পাটনায় সৈয়দ আহমদ যে দুইজন খলিফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিল তারা তীর্থ ভ্রমণের জন্য সীমান্তে এসে অবগত হয় যে, তাদের নেতার তিরোধান এক অলৌকিক ঘটনা ; প্রকৃত পক্ষে তার মৃত্যু ঘটেনি। যথাসময়ে সে মুজাহিদ বাহিনীর নায়করূপে আবার অবতীর্ণ হবে এবং ইংরেজ কাফেরদিগকে ভারত থেকে বিতাড়িত করবে। সুতরাং ১৮২০—২২ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ গঙ্গা অববাহিকার পথ অনুসরণ করে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় যেসব প্রধান প্রধান শহরে প্রচারকার্য চালিয়েছিল, তার খলিফাগণ সেই সব শহর থেকে অর্থ ও লোকজন সংগ্রহ, বিশেষ করে অর্থ সংগ্রহ অব্যাহত রেখেছিল। ফলে আমাদের ভূখন্ড থেকে অসন্তুষ্ট লোকজনের এক অবিরাম স্রোতধারা ধর্মান্ধ উপনিবেশের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আত্মগোপনকারী খাতক, পলাতক কয়েদী, ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন সমাজ থেকে বিতাড়িত অপব্যয়ী ব্যক্তিরা, আইনের চোখে অমার্জনীয় অপরাধী বিশ্বাসঘাতকরা—সকলেই বৃটিশ শাসনাধীন সমভূমি অঞ্চল থেকে পালিয়ে উত্তরাঞ্চলের এডুলান গুহায় সমবেত হয়েছে। অবশ্য এদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মুহাজিরও ছিল। খ্রীষ্টান সরকারের শাসনাধীনে নির্বিবাদে বসবাস করতে অপারগ প্রত্যেকটি অতি উৎসাহী মুসলমান বদ্ধপরিকর হয়ে সিত্তানা শিবিরে পাড়ি দেয়। তাদের আক্রোশের শিকার হয়েছিল প্রধানত শিখ অধ্যুষিত গ্রামগুলো। তবে ইংরেজ কাফেরদের উপর প্রচন্ড আঘাত হানার প্রত্যেকটি সুযোগ তারা গ্রহণ করত উল্লসিত চিত্তে। কাবুল যুদ্ধে আমাদের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করার জন্য তারা এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেছিল। তাদের মধ্যে এক সহস্র যোদ্ধা আমাদের বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ করেছে। একমাত্র গজনীর পতনের সময়ই তিনশত মুজাহিদ ইংরেজদের বেয়নেটের মুখে শাহাদাত প্রাপ্তির আনন্দ লাভ করেছিল।

পাঞ্জাব সংযুক্তির পর ধর্মান্ধদের প্রচণ্ড কোপ শিখদের উপর থেকে অপসৃত হয়ে শিখদের স্থলাভিষিক্ত ইংরেজদের উপর নিপতিত হতে লাগল। সিত্তানায় আস্তানাকারী সৈন্যদলের দৃষ্টিতে হিন্দু এবং ইংরেজ উভয়েই সমান কাফের এবং তরবারির আঘাতে তাদের নির্মূল করাই ছিল মুজাহিদ বাহিনীর কাজ। শিখদের উপর মুজাহিদ বাহিনীর হামলাজনিত যে বিশৃংখলার প্রতি

অতীতে আমরা ইন্ধন যুগিয়েছি, কিংবা অন্তত পক্ষে আমরা যা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছি, সে বিশৃংখলা এখন আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে বিস্বাদ উত্তরাধিকাররূপে।

পাটনা আদালতের নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, তথাকার খলিফাদ্বয়[১] নিজেদের ধর্মান্ধ অনলবর্ষী বক্তারূপে সুপরিচিত ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যার হেনরী লরেন্স এ মর্মে এক বিবরণী[২] লিপিবদ্ধ করেন যে, উক্ত খলিফাদ্বয় পাঞ্জাবে ধর্মযোদ্ধা[৩] হিসেবে সুপরিচিত ছিল, এবং সেই জন্য তাদের গ্রেফতার করে পুলিশের হেফাজতে পাটনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের কাছ থেকে এবং তাদের স্বধর্মীয় দু'জন উচ্চ বিত্তশীল লোকের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ সদাচরণের মুচলেকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আমি তাদের দেখেছি সমতল বঙ্গের রাজশাহী জেলায় রাজদ্রোহমূলক প্রচারকার্য চালাতে। একাধিকবার এই অপরাধ করার দরুন তারা দুইবার রাজশাহী জেলা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।[৪] পাটনায় তাদের স্বগৃহে অবস্থান করার জন্য জামিন মুচলেকা দ্বারা এই দুই খলিফাকে[৫] যতই আবদ্ধ রাখা হোক না কেন, ১৮৫১ সালেই তাদের আবার দেখা গিয়েছে পাঞ্জাব সীমান্তে রাজদ্রোহের অগ্নি উদগীরণ করতে।[৬]

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মুজাহিদরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার উপযোগী বলে বিবেচনা করে। আমাদের ভূখন্ড থেকে বহু অর্থ ও লোকজন সিত্তানা শিবিরে পাচার হয়ে যায়। আমাদের সৈন্যদলের সঙ্গে বিদ্রোহমূলক পত্রালাপের একটি ঘটনা পাঞ্জাব কর্তৃপক্ষের কাছে ধরাও পড়ে। রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থিত চতুর্থ নেটিভ পদাতিক বাহিনী ছিল ধর্মান্ধ উপনিবেশের নিকটবর্তী । মুজাহিদ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমাদের যেসব বাহিনী প্রেরণ করা হত, তাদের অন্যতম ছিল এই পদাতিক বাহিনী। ধর্মান্ধ নেতৃবৃন্দ সুকৌশলে এই বাহিনীতে ভাঙ্গানী দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যে সব চিঠি ধরা পড়েছিল, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলা থেকে লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র বিদ্রোহী শিবিরে চালান দেওয়ার জন্য তারা একটি

---

১. ইনায়েত ও বিলায়েত আলী।

২. ১৮৪৭ খ্রীষটাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যবিবরণী।

৩. গোজাৎ বা মাজাহিদীন , পরবর্তীকালে যারা ওয়াহাবী নামে আখ্যায়িত হয়।

৪. ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যবিবরণী।

৫. ইনায়েত ও বিলায়েত আলী।

৬. ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে বোর্ড অব রেভিনিউ-এর কার্যবিবরণী।

নিয়মিত সংগঠন স্থাপন করেছিল। একই সময় পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট[১] দিয়েছিলেন যে, শহরে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বৃটিশ ভারতের এই প্রাদেশিক রাজধানী শহরের নেতৃস্থানীয় অধিবাসীরা প্রকাশ্য রাজদ্রোহ প্রচার করছিল। ধর্মান্ধদের সাথে পুলিশের গোপন আঁতাত স্থাপিত হয়েছিল। একজন বিদ্রোহী নেতার[২] গৃহে সাতশ লোকের এক সমাবেশে সেই নেতা অস্ত্রবল প্রয়োগের দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত অনুষ্ঠান প্রতিরোধ করার সংকল্প ঘোষণা করেন।

সীমান্তের ধর্মান্ধ শিবিরে অর্থ ও লোকজন সরবরাহ করার জন্য নিজ এলাকার অভ্যন্তরে এতবড় একটি রাজদ্রোহী সংগঠনের অস্তিত্বের প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকা বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে লর্ড ডালহৌসী এ সম্পর্কে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। তার প্রথমটিতে তিনি অভ্যন্তরীণ সংগঠনটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দান করেন। আর দ্বিতীয়টিতে সীমান্তের উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে একটি সীমান্ত যুদ্ধের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। কারণ হিন্দুস্তানী ধর্মান্ধরা উপজাতীয়দের মনে কাফেরদের প্রতি বদ্ধমূল ঘৃণার আগুনে ইন্ধন যুগিয়ে তাকে আরেকবার উত্তপ্ত করে তুলেছিল। ঐ বছরই উপজাতীয়রা আমাদের মিত্র আম্বরাজ্য আক্রমণ করলে আম্বাধিপতির সাহায্যে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। ১৮৫৩ সালে বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে পত্র আদান-প্রদানের দায়ে আমাদের বাহিনীর কতিপয় দেশীয় সৈনিককে দন্ডিত করা হয়।

যেসব অপমান, আক্রমণ ও হত্যার পরিণতি হিসেবে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সীমান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই না। ধর্মান্ধরা সে সময় সীমান্তের উপজাতীয়দের সদাসর্বদা বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বৈরী-ভাবাপন্ন করে রাখত। একটিমাত্র ঘটনা থেকে এ সম্পর্কে অনেক কথা জানা যাবে। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমরা ষোলটি অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং তাতে মোট ৩৩,০০০ নিয়মিত সৈন্য প্রেরণ করতে হয়েছিল। ১৮৫০ থেকে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা উঠেছিল কুড়িতে এবং তাতে নিয়োজিত নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৬০,০০০। তাছাড়া ছিল আরো বহুসংখ্যক অনিয়মিত

---

[১] ১৯শে আগস্ট, ১৮৫২।

[২] মৌলবী আহমদুল্লাহ।

– অতিরিক্ত সৈন্য ও পুলিশ । এ সময় সিত্তানা উপনিবেশ থেকে ক্রমাগতভাবে সীমান্ত এলাকায় ধর্মীয় গোঁড়ামীর উসকানী দিতে থাকা হলেও তারা আমাদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেছে। যেসব উপজাতীয়দের তারা আমাদের বিরুদ্ধে উসকানী দিয়েছে তাদের হয়ত গোপনে সাহায্য করেছে তারা। কিন্তু তারা নিজে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আঁতাত[১] গঠন করেছে, এমনকি তাদের অসাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সাহায্য দাবি করার দুঃসাহস পর্যন্ত দেখিয়েছে। আমাদের অস্বীকৃতিতে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা সদর্পে আমাদের ভূখন্ড আক্রমণ করেছে এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার লেফ্‌ট্‌ন্যানট হর্নের শিবিরে রাত্রিকালে হামলা করলে তিনি কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এই হামলার প্রতিশোধ গ্রহণে বিলম্ব করা আর সম্ভব ছিল না। জেনারেল স্যার সিড্‌নী কটন অবিলম্বে ৫,০০০ সৈন্য[২] নিয়ে পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন। ধর্মান্ধ শিবির আমাদের সীমান্তে যে কতিপয় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, এটাই ছিল তার প্রথম। এ সম্পর্ক সংক্ষেপে এটুকু উল্লেখ করে আমি এ ধরনের যুদ্ধের নিদর্শনস্বরূপ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় যুদ্ধটি সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রাথমিক কিছু অসুবিধা অতিক্রম করার পর আমাদের সৈন্যরা বিদ্রোহ সমর্থনকারীদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ভস্মীভূত করে অথবা উড়িয়ে দেয় এবং সিত্তানায় অবস্থিত বিশ্বাসঘাতকদের বসতি ধ্বংস করে ফেলে। ধর্মান্ধরা অবশ্য পশ্চাদপসরণ করে মহাবন পর্বতের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ যুদ্ধে তাদের শক্তি কিছুমাত্র খর্ব হয় না এবং পার্শ্ববর্তী উপজাতীয়রা[৩] অনতিকাল মধ্যেই মুল্কা নামক স্থানে বিদ্রোহীদের নতুন বসতি স্থাপন করতে দেয়।

অবশ্য বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ছাড়াও ধর্মান্ধ শিবিরের অন্য শত্রু ছিল। অতিমাত্রায় ধর্মীয় আত্মবিশ্বাসের দরুন তারা পার্শ্ববর্তী উচ্চভূমি এলাকার অধিবাসী বিভিন্ন গোত্রের কাছ থেকে ঘন ঘন "টিথ্" বা দশমাংশ কর আদায় করত। যে ব্যক্তি প্রচারক এবং কর আদায়কারী হিসেবে কাজ করত তার ব্যক্তিগত প্রভাব অনুসারে ঐসব অধিবাসীর কেউ কেউ জুলুমের কাছে নতি স্বীকার করে কর প্রদান করত, কেউ ফাঁকি দিত, আবার কেউবা

---

[১] বিশেষ করে ইউসুফজাই ও পাঞ্জতার উপজাতীয়দের।

[২] গোলান্দাজ ২১৯; অশ্বারোহী ৫৫১ পদাতিক ৪১০৭ . মোট ৪৮৮৭ নিয়মিত সৈন্য।

[৩] আমাজাই উপজাতি।

কর দিতে অস্বীকার করত । এই ভাবে পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে সর্বদা একটা উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকত। এর ফলে এইসব পার্বত্য অধিবাসী স্বয়ং ধর্মীয় নেতা সৈয়দ আহমদের কাছ থেকে আস্তে আস্তে কিভাবে দূরে সরে গিয়েছিল, এবং অবশেষে কিভাবে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে নেতার মৃত্যু হয়েছিল, সে বিষয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। পার্বত্য অধিবাসীদের কোন গোত্র দশমাংশ কর দিতে অস্বীকার করলে ধর্মান্ধ শিবির থেকে বিপুল সংখ্যক লোক দল বেঁধে এসে অবাধ্য গোত্রের জমি থেকে ফসল কেটে নিয়ে চলে যেত। এই ধর্মীয় কর আদায়ের বিরুদ্ধে উপজাতীয়দের প্রতিরোধের ফলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিত্তানা আক্রান্ত হয় এবং ধর্মান্ধ নেতা[১] নিহত হয়। এইভাবে একদিকে স্যার সিড্নী কটনের অভিযান এবং অন্যদিকে পরম মিত্রদের দল ত্যাগের ফলে বিদ্রোহী ঘাঁটি খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ায় দুই বছর তারা চুপচাপ থাকে। যে উপজাতি[২] দশমাংশ কর আদায়কারীদিগকে প্রতিহত করে এবং ধর্মান্ধ নেতাকে হত্যা করে— আমরা সিত্তানার সকল জমি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিই। এই উপজাতি এবং আরেক প্রভাবশালী উপজাতির[৩] কাছ থেকে আমরা এরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিই যে, তারা আর কখনো তাদের ভূখণ্ডে ধর্মান্ধদের প্রবেশ করতে দিবে না এবং অন্য কোন উপজাতি ধর্মান্ধদের ডেকে আনার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তাছাড়া তারা আরও অঙ্গীকার করে যে, ধর্মান্ধরা অথবা কোন দুষ্কৃতিকারী দল বৃটিশ সীমান্তে লুণ্ঠন অভিযানে যেতে চাইলে তাদের এলাকা অতিক্রম করে যেতে দিবে না।

কিন্তু দুই বছর যেতে না যেতেই বিদ্রোহীরা আবার কুসংস্কারাচ্ছন্ন পার্বত্য উপজাতীয়দের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। স্যার সিড্নী কটন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের তাড়া করলে মহাবনের অভ্যন্তরে মুল্কা নামক যে স্থানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, ১৮৬১ সালে সেখান থেকে তারা অগ্রসর হয় এবং তাদের পুরাতন ঘাঁটি সিত্তানা থেকে কিছু উর্ধ্বে তাদের অবস্থান[৪] সুদৃঢ় করে। এই ঘাঁটি থেকে তারা নিম্নাঞ্চলে আমাদের গ্রামসমূহের উপর হামলা চালাতে থাকে । যেসব উপজাতি বিদ্রোহীদের বাধা দিবে বলে ইতিপূর্বে অঙ্গীকার করেছিল, তাদের এলাকার ভিতর দিয়েই বিদ্রোহীরা

---

১. উৎমনজাই উপজাতি কর্তৃক সৈয়দ উমর শাহ নিহত হয়।

২. উৎমনজাই উপজাতি।

৩. জাদুন উপজাতি।

৪. সিরি নামক স্থানে।

তাদের হামলা পরিচালনাকালে অবাধ চলাচলের সুবিধা লাভ করে। আবার আগের অবস্থা ফিরে এসেছে, সদর্পে একথা ঘোষণা করার জন্যেই যেন ধর্মান্ধরা আমাদের রাওয়ালপিন্ডি জেলায় নেমে আসে এবং শক্তিশালী একটি থানার নজরের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বসাধারণের চলাচলের রাস্তায় দুইজন পথচারীকে হত্যা করে।[১] এর তিন সপ্তাহ পর তারা আরেকবার আমাদের এলাকায় নেমে আসে এবং তিনজন ধনী ব্যবসায়ীকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর এই বন্দীদের মুক্তিদানের শর্ত হিসেবে ১,৫৫০ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে আমাদের অফিসারদের কাছে পত্র পাঠায় ঠান্ডা মেজাজে। এই অর্থের অর্ধেক প্রাপ্য ছিল ধর্মান্ধ নেতার। এর অব্যবহিত পরেই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে লোক অপহরণের আরেকটি ঘটনা ঘটে। সীমান্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে রিপোর্ট দেয় যে, সেখানকার পরিস্থিতি আবার (১৮৫৮ খ্রীঃ) লজ্জাকর অশান্তিপূর্ণ পর্যায়ে ফিরে গেছে। বৃটিশ অফিসারগণ আমাদের মিত্র উপজাতীয়দের প্রতি ধর্মের ও ভীতির দোহাই দিয়ে যে আবেদন-নিবেদন জানায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উপজাতীয়দের বেশ কয়েকটা গ্রামের ভাগ্য আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করছিল । কিন্তু তা সত্ত্বেও তথাকার অধিবাসীরা তাদের স্ব-ধর্মীয়দের সঙ্গেই নিজেদের ভাগ্য জড়িত করে এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর থাকে না। এমতাবস্থায় আমরা শত্রু উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে কড়া অবরোধ ব্যবস্থা আরোপ করি, যার ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেউ সীমানা লংঘন করা মাত্রও তাকে আমরা বন্দী করে রাখি । এর ফলে তাদের কিছুটা সুবুদ্ধির উদয় হয়। আবার তারা আমাদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় এবং বিদ্রোহীদের তারা সিত্তানা অঞ্চল ছেড়ে অভ্যন্তরবর্তী আস্তানা মুলকায় ফিরে যেতে বাধ্য করে।

কিন্তু তথাপি আমাদের অবাধ্য হিন্দুস্তানী প্রজারা বিশ্বাসঘাতকদের শিবিরে ক্রমাগত সমবেত হতে থাকে । ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পায় যে, পাঞ্জাব সরকার আরেকটি সীমান্ত যুদ্ধ সংঘটনের পরামর্শ না দিয়ে পারে না। বস্তুতঃ পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করে যাতে ভারত সচিব দৃঢ় অভিমত[২] প্রকাশ করেন যে আজ হোক কাল হোক, বিদ্রোহীদের অস্ত্রবলে বিতাড়িত করতেই হবে। কেননা, যতদিন তারা আমাদের সীমান্তে অবস্থান করবে, ততদিনই তারা আমাদের জন্যে বিপদের স্থায়ী উৎস

---

১. ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ।

২. ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিলের পত্র।

হিসেবেই বিদ্যমান থাকবে। যাহোক, তৎক্ষণাৎ কোন অভিযান আরম্ভ করা অসম্ভব ছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের প্রথম দিকে বিদ্রোহীরা আবার আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে হত্যা ও লুটতরাজ চালাতে থাকে। ঐ বছর জুলাই মাসে তারা সাহসের সঙ্গে সিত্তানা ঘাঁটি পুনর্দখল করে নেয় এবং আমাদের মিত্র রাজ্য আম্বের শাসনকর্তার কাছে ভীতিপ্রদর্শনমূলক পত্র প্রেরণ করে। পার্শ্ববর্তী এলাকার উপজাতীয়রা আবার ধর্মান্ধতার বেদীমূলে তাদের আনুগত্যকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের সঙ্গে সম্পাদিত তাদের অঙ্গীকার পত্র হাওয়ায় নিক্ষেপ করে। সীমান্তে বিদ্রোহীরা আরেক দফা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ধর্মান্ধ বাহিনী বৃটিশ এলাকায় প্রবেশ করে এবং আমাদের গাইড-কোরের উপর নৈশ হামলার মাধ্যমে প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভের ইঙ্গিত দান করে। এর এক সপ্তাহ পরেই তারা আমাদের মিত্ররাজ্য আম্বের উপর আক্রমণ চালিয়ে কৃষ্ণপর্বতের গায়ে অবস্থিত গ্রামসমূহ ধ্বংস করে এবং ফাঁড়ি রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। একই মাসে তারা তানাওয়ালে অবস্থিত আমাদের মিত্র বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং একজন দেশীয় অফিসারকে সসৈন্যে হত্যা করে । কিন্তু কেবল আমাদের মিত্রদের উপর আক্রমণ করেই তারা ক্ষান্ত হয় না, সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত[১] আমাদের প্রহরী বাহিনীর উপরও তারা গুলী চালায়। অবশেষে প্রকাশ্য ঘোষণা পত্র দিয়ে তারা ইংরেজ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সকল নিষ্ঠাবান মুসলমানের প্রতি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদানের আহবান জানায়।

সুতরাং যে পরিস্থিতিতে ১৮২৭—৩০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মান্ধ মুজাহিদ বাহিনী পাঞ্জাব দখল করেছিল এবং তাদের কাছে সীমান্ত রাজধানীর পতন ঘটেছিল পুনরায় সেই পরিস্থিতির উদ্ভব হল। এমতাবস্থায় যুদ্ধ এড়াবার সম্ভাবনা আর একেবারেই থাকল না। তবে এসব সীমান্ত সংঘর্ষের সামরিক গুরুত্ব ছিল খুবই নগণ্য । অধিকতর শক্তিশালী পক্ষের গৌরব এতে সামান্যই প্রতীয়মান হত । বৃটিশ ভারতের ন্যায় একটি বিশাল সামরিক শক্তিসম্পন্ন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কতিপয় অসভ্য উপজাতীয় ঐক্যজোটের সংঘাত ঘটলে সে উপজাতীয়রা যতই সাহসী এবং ধর্মীয় প্রেরণায় যতই উদ্বুদ্ধ হোক না কেন, সে সংঘাতের পরিণতি সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না । তদুপরি এ ধরনের সংঘর্ষে একটা বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে অবধারিতরূপে.

---

[১] নওয়াগিরানে অবস্থিত।

সেটা হচ্ছে আক্রমণের পর প্রচন্ড পাল্টা আক্রমণ। প্রতিশোধমূলক এই পাল্টা আক্রমণের সমাপ্তি ত্বরান্বিতই হোক, আর বিলম্বিতই হোক, এর যে পরিণতি হয়, সেটা একজন খ্রীস্টানের পক্ষে নিতান্ত পীড়াদায়ক। সুতরাং আমি ধর্মান্ধ উপনিবেশের বিরুদ্ধে আমাদের একটিমাত্র অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করব। তা থেকে দেখা যাবে যে, শান্তিকালেও বিশ্বাসঘাতক শিবির বছরের পর বছর ধরে আমাদের সীমান্তে অবমাননার কারণ হিসেবে বিরাজ করেছে। আর যুদ্ধকালে এই শিবির আমাদের সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে। যখন আমরা তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেছি, তখন তারা ক্রমাগতভাবে দুর্বৃত্ত দল পাঠিয়েছে আমাদের প্রজাবৃন্দ ও মিত্রদের অপহরণ ও হত্যা করার জন্য । যখন আমরা অস্ত্রবলে তাদের নির্মূল করতে চেষ্টা করেছি, তখন তারা আমাদের নেতাদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে এবং কিছুকাল যাবত বৃটিশ ভারতের সীমান্ত বাহিনীকে উপেক্ষা করে চলেছে। বিশ্বাসঘাতক এবং মুহাজিরদের একটি উপনিবেশ আমাদের সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরের ধর্মান্ধ রাজদ্রোহীদের সহায়তায় অতিশয় গোঁড়ামিপ্রসূত ঘৃণার বশবর্তী হয়ে লৌহ-বর্মকেও উপেক্ষা করতে পারে কিরূপে সেটা বোধগম্য । কিন্তু একটা সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সংঘবদ্ধ আক্রমণের ধাক্কা তারা কিরূপে সামলাতে পারত মুহূর্তের জন্যও তা কল্পনা করতে পারা দুঃসাধ্য। এর ব্যাখ্যা করতে হলে বিদ্রোহীদের নেতা দেশের যে অংশে তার যুদ্ধংদেহী অনুসারীদের সদর দফতর স্থাপন করেছিল, তথাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করা প্রয়োজন।

সিন্ধু উপত্যকার সর্বোত্তরে, বৃটিশ রাজমুকুটের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন সর্বশেষ উপজাতির আবাসভূমির সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুদের পবিত্র পর্বতশৃংঙ্গ। সুপ্রাচীনকালে আর্য অভিযাত্রীরা তাঁদের দক্ষিণাভিমুখী অভিযাত্রা পথে যেসব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্যে অভিভূত হত, তার সর্বোত্তম ছিল মহাবন, যার আক্ষরিক অর্থ বিশাল বনানী । পবিত্র পর্বতকেই তারা এই নামে আখ্যায়িত করেছিল । সিন্ধুর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ৭,৪০০ ফুট উচ্চ এই পর্বতমালা ও শৃঙ্গরাজি আজও মহাবন বা বিশাল বনানী নামে পরিচিত। ইহুদীদের কাছে সিনাই-এর যে গুরুত্ব, বিদ্রোহীদের কাছে এই শৃঙ্গরাজির গুরুত্ব ছিল সেই রকম। সংস্কৃত কাব্য বিধৃত হয়েছে উক্ত শৃঙ্গরাজির প্রতি প্রাচীন যুগের হিন্দু সম্প্রদায়ের অগাধ ভক্তি ; ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হয়েছে এই মহাবন যুগের পর যুগ। পবিত্র এই শৃঙ্গমালায় একাকী

অর্জুন যুদ্ধ করেছে দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধে পরাজিত হলেও দেবীর বরে অক্ষয়-তূণ লাভ করেছে অর্জুন। কথিত আছে যে, ছোট ছোট দেবতারাও উপবাস ও নির্জনবাসের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির পবিত্রতা অর্জনের কৃচ্ছ্রসাধনা করত এই মহাবনে। সুতরাং মহাবনের শীতল ছায়াতলে অস্থি সমাহিত করতে পারা ছিল কোন প্রাচীন মুনিঋষির জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়।[১]

প্রাচীন হিন্দুদের এই তীর্থভূমিতে এখন বসবাস করে উগ্র এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন কতিপয় মুসলমান উপজাতি। সিন্ধুর পূর্বতীরে কৃষ্ণপর্বত এখন যাদের দখলে, সেই ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গও দুর্ধর্ষতা এবং ধর্মান্ধতার দিক থেকে কোন অংশে কম নয়। এবটাবাদের অগ্রগামী বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সদাসতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হচ্ছে এদের প্রতি। অবশ্য দশমাংশ কর এবং অনুরূপ ধর্মীয় জুলুমের ফলে ধর্মান্ধ ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে এদের কোন স্থায়ী ঐক্য স্থাপিত হতে পারে না। কিন্তু ধর্মীয় উত্তেজনায় ফেটে পড়া এইসব উপজাতীয়দের পক্ষে স্বাভাবিক। আর আমাদের সীমান্তের অভ্যন্তরে সমৃদ্ধিশালী হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামসমূহে লুটতরাজের সুযোগ পেলেই তারা উল্লসিত হয়ে পড়ে। মুসলমান অধ্যুষিত সোয়াত রাজ্যের অপর নাম ধর্মীয় রাজ্য। সেখানকার অধিবাসী সংখ্যা ৯৬,০০০। এই জনসংখ্যার প্রতিটি মানুষ আবাল্য লালিত হয় বৃটিশ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার এক বংশানুক্রমিক আশংকার মধ্যে। তাদের মনে সৃষ্টি হয় এক বদ্ধমূল বিশ্বাস — কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ; যে ইমামের পতাকা-তলে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারালে শাহাদাত লাভ করা যায়, তার নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে চরম ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে আমাদের এই শিক্ষা হয়েছিল যে, ধর্মান্ধ শিবিরের বিরুদ্ধে কোন অভিযান পরিচালনার অর্থ হবে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সাহসী গোত্রসমূহের ঐক্যবদ্ধ ৫৩,০০০ যোদ্ধার[২] সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। দেশের দুর্গম পরিবেশের দরুন উপজাতীয়দের মেজাজ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় সীমান্তের অফিসারদের পক্ষে সঠিকভাবে

---

[১] সাত বছর আগে Calcutta review-এ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ এখানে এবং দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যবহার করেছি।

[২] প্রত্যেক উপজাতি থেকে সহজেই যত সংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হতে পারে তার হিসাব নিয়েছি পররাষ্ট্র দফতরের নথিপত্র থেকে। সিমান্ত গেজেটিয়ারের ভারপ্রাপ্ত কর্ণেল ম্যাক গ্রেগরের হিসাবের সঙ্গে এই হিসাব মিলিয়ে নিয়েছি। এ হিসাব মতে ১২টি উপজাতি থেকে মোট ৫৩.০০০ সৈন্য সংগৃহীত হতে পারে।

নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। আর বিদ্রোহীরা কোন যুদ্ধে পরাজিত হওয়া মাত্রই পশ্চাদপসরণ করে মহাবনের গভীর নিভৃত অঞ্চলে আত্মগোপন করলেই রক্ষা পেত।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর জেনারেল স্যার নেভিল চেম্বারলিনের অধীনে ৭,০০০ সৈন্যসমৃদ্ধ[১] এক বৃটিশ বাহিনী যুদ্ধযাত্রা করে। এই বাহিনীর সঙ্গে ছিল বিরাট সাঁজোয়া বহর, আর রসদ বহনের জন্য ছিল ৪০০০ খচ্চর এবং অন্যান্য ভারবাহী পশু, সারা পাঞ্জাব তছনছ করে সেই রসদ সংগ্রহ করা হয়েছিল। পরের দিন সন্ধ্যায় এই সৈন্যবাহিনীর একটি ব্যূহ জংগলাকীর্ণ বৃক্ষ আচ্ছাদিত বিপদসংকুল এক গিরিপথে উপস্থিত হয়। এই গিরিপথ আম্বেলা পাস নামে অভিহিত। আমাদের আক্রমণ ঘাঁটি সুরক্ষিত করা হয়েছিল শক্তিশালী সৈন্যবেষ্টনী[২] দ্বারা। এই বেষ্টনীর পশ্চাতে ছিল অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্য পরিপূর্ণ সীমান্ত ঘাঁটিসমূহ।[৩] আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে উপরোক্ত সামরিক ঘাঁটিসমূহের সমর্থন ছিল। এটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ ২০শে অক্টোবর জেনারেল চেম্বারলিন লক্ষ্য করলেন যে, যেসব উপজাতিকে তিনি মিত্র বলে মনে করেছিলেন, তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। দুদিন পর তিনি সরকারের কাছে এই মর্মে তারবার্তা প্রেরণ করেন যে, গিরিপথ থেকে বের হওয়ার আগে তাঁর সৈন্যবাহিনীর বিশ্রাম প্রয়োজন। ২৩শে অক্টোবর উপজাতীয়রা প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করে। বোনাইর উপজাতীয়রা এই দিন একটি বৃটিশ পরিদর্শক বাহিনীকে আক্রমণ করে। এর অল্প কয়েক দিন পরেই সোয়াত রাজ্যের ধর্মীয় প্রধান[৪] শত্রুপক্ষে যোগদান করে। ইতিমধ্যে সীমান্তে আরো সৈন্য প্রেরণের আবেদন সম্বলিত তারবার্তার পর তারবার্তা সরকারের হস্তগত হতে থাকে। আমাদের সৈন্যবাহিনী বিপদসংকুল গিরিপথে আটকা পড়ে থাকে। ফিরোজপুর রেজিমেন্টের একটি অংশকে

---

[১] নিয়মিত পদাতিক ৫,১৫০ ; নিয়মিত অশ্বারোহী ২০০ ; গোলন্দাজ ২৮০ এবং সিভিল কমিশনারের অধীনে ১,০০০ এরও উর্ধ্বে।

[২] দারবান্দ, তরবেলা, টোপী, রুস্তম বাজার, এবং মর্দানে ইউরোপীয় ও দেশীয় পদাতিক, অশ্বারোহী, পার্বত্য উপজাতীয় গুর্খা ও পাঞ্জাবী পদাতিক সৈন্য সমাবিষ্ট ছিল।

[৩] পেশোয়ার, রাওয়ালপিন্ডি, কোহাট, বানু, ডেরা ইসমাইল খাঁ প্রভৃতি সীমান্ত ঘাঁটিতে বহু সুসজ্জিত গোলন্দাজ, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সমাবিষ্ট ছিল।

[৪] আবদুল গফুর নামক জনৈক দরবেশ। ইউসুফজাই গোত্রের উপর তার বিশেষ প্রভাব ছিল এবং সাধারণভাবে সকল পাঠান উপজাতি তাকে শ্রদ্ধা করত।

সীমান্তে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। পেশোয়ার থেকে আরো এক রেজিমেন্ট পদাতিক বাহিনীকে দ্রুত পশ্চিম দিকে প্রেরণ করা হয়। শিয়ালকোট থেকে ৯৩তম হাইল্যান্ডার বাহিনী ও লাহোর থেকে ২৩শ ও ২৪শ দেশীয় পদাতিক বাহিনীও দ্রুত অগ্রসর হয় । তিন সপ্তাহের মধ্যেই পাঞ্জাবের সেনানিবাসসমূহ এমনভাবে সৈন্যহীন হয়ে পড়ে যে লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে গার্ড দেওয়ার জন্য মাত্র চব্বিশজন বেয়নেটধারী সৈন্য যোগাড় করা মিয়াঁমিরের সেনাপতির পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে উপজাতীয়রা চারদিক থেকে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে ঘেরাও করে ফেলতে থাকে। অগ্রসর হওয়া আমাদের বাহিনীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর পশ্চাদপসরণ করা পরাজয়বরণ অপেক্ষাও খারাপ বলে প্রতীয়মান হয়। বাল্যকাল থেকেই পার্বত্য যুদ্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত উপজাতীয়দের জন্য আমাদের এই অবস্থা হয় খুবই সুবিধাজনক। আমাদের সৈন্যবাহিনী যে সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েছিল সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে জনৈক অফিসারের রোজনামচার নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে ঃ

'২০ তারিখ। মূলবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে ফিরিয়ে নেওয়ার পর ক্লান্ত সৈন্যদল যুদ্ধ করতে করতে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতে থাকে। অনেক রাত হয়ে যায় তাদের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতে। শত্রু পক্ষও যথেষ্ট শক্তিশালী। তারা আমাদের ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের সৈন্যরা প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে শত্রুর মোকাবেলা করতে। এন্‌ফিল্ড রাইফেল এবং মাউন্টেন ট্রেন-গানের প্রচন্ড গুলী বর্ষণের সম্মুখীন হয় শত্রুরা। রাত্রের এই আক্রমণকালে এক অদ্ভুত এবং চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা হয়। সম্মুখে অন্ধকার জঙ্গল। ডানে ও বামে সারিবদ্ধ মাউন্টেন ট্রেন-গানগুলো মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। আর মাঝখানে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল পদাতিক বাহিনী ছড়িয়ে আছে সমগ্র উপত্যকায়। আচমকা প্রচন্ড হুংকার— আল্লাহু আকবর। গাছের আড়াল থেকে সশব্দে ঝল্‌কে ওঠে অনেকগুলো দেশী বন্দুক। চক্‌চক্ করতে থাকে ঘূর্ণায়মান শাণিত তরবারিগুলো। একদল কালো মানুষ এগিয়ে আসে খোলা জায়গাটা ছাড়িয়ে। বেয়নেটের প্রায় কাছাকাছি এসে আক্রমণ করে তারা। তারপর আলোর ঝলকানি আর সোরগোল। পাথরের উপর টিনের বাক্সপেটরা গড়াগড়ির শব্দ। কানের কাছে গাছের পাতার সরসরানি, দুর্বোধ্য সংলাপ। মাঝে মাঝে সমগ্র ছাউনিতে জ্বলে উঠছে গোলাগুলির তীব্র অগ্নিশিখা। তারপর ধোঁয়ার আচ্ছাদন অপসৃত হলে দেখা যাচ্ছে শত্রুরা একজনও নেই

কোথাও । সম্মুখ দিক থেকে কিছু ক্ষীণ কণ্ঠের গোঙানী আর পাঠানসুলভ ভঙ্গীতে পানির জন্য চিৎকার শুনে বুঝা যায় যে, গোলাগুলী ফলদায়ক হয়েছে। এই মুহূর্তে আবার অন্য কোন দিক থেকে দু'একটি গুলীর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পাহাড় থেকে কয়েকটি পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে উৎকর্ণ দেশীয় সৈন্যরা বুঝতে পারে যে শত্রুরা আমাদের এক পাশ থেকে আক্রমণের চেষ্টা করছে। সুতরাং এই আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের দেশীয় সৈন্যরা মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গুলীবর্ষণ শুরু হয় আবার আমাদের রাইফেল থেকে। অন্ধকার পর্বতগাত্র সচকিত হয়ে ওঠে গোলাগুলীর শব্দে। সে শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে হাজার গুণে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উপত্যকায় একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। তারপর আরেকটি চিৎকার এবং আক্রমণ, রাইফেলের গুরু গর্জন। আবার আগের মত স্তব্ধতা। এবার একদল কালো মানুষ আস্তে আস্তে কতকগুলো ভারী বোঝা বহন করে নিয়ে গেল, আমাদের তাঁবুশ্রেণীর ভেতর দিয়ে। বুঝা গেল এবারের গুলীবর্ষণও বৃথা যায়নি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাউনীর মধ্যভাগ থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠস্বর, একটি আদেশ। সবাই স্তব্ধ হল সে আদেশ শুনতে, সবাই প্রস্তুত সে আদেশ পালন করতে। আদেশ হল, "গুলীবর্ষণ বন্ধ কর। শত্রুরা এগিয়ে আসুক আমাদের বেয়নেট পর্যন্ত, এবং তারপর —।" বাকী কথাগুলো শোনা গেল না। কিন্তু বুঝতে কারোই বাকী রইল না, শেষ কথাগুলো কি। প্রত্যেকেই থেমে রইল, অপেক্ষা করতে থাকল গভীর নীরবতায়। পূর্ব মুহূর্তের সোরগোলের সঙ্গে কি আশ্চর্য তফাৎ এই নীরবতার। সম্মুখে ছোট্ট টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘকায় জেনারেল। তার আজ্ঞাধীন সেনাবাহিনীর মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাকে। তার একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে সম্মুখের ঘনান্ধকারের দিকে। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় অনেক । মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ দু-একটি গোলাগুলীর শব্দ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছিল সম্মুখের জঙ্গলে শত্রুবাহিনী তখনও উপস্থিত । কিন্তু তাদের সংখ্যা সম্পর্কে কোন ধারণা করতে পারছিলাম না আমরা । অল্পক্ষণের মধ্যেই সে বিক্ষিপ্ত গুলীবর্ষণও স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর আমরা ওদের পায়ের শব্দ আর পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। ওরা ফিরে যাচ্ছে । আহত আর নিহত সৈনিকদের ওরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল নিশ্চয়ই । তা না হলে আরো সন্তর্পণে চলাফেরা করত ওরা।[১]

---

1. Calcutta Review, vol. 1 xxix p. 201.

প্রতিদিনের বিলম্বের ফলে শত্রুপক্ষের সাফল্যের আশা এবং ধর্মান্ধসুলভ প্রেরণা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নতুন সৈন্য এসে শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও আমাদের জেনারেল অগ্রসর হওয়া অসম্ভব মনে করছিলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী গিরিপথের মধ্যে সর্বোতভাবে নাজেহাল অবস্থায় আটকা পড়ে থাকতে লাগল। চুমলা উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ারও সাহস ছিল না তাদের। ইতিমধ্যে বাজুর উপজাতীয়রা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয়ায় তাদের শক্তিবৃদ্ধির ফলে শত্রুরা একযোগে আমাদের সম্মুখভাগে, বাম পার্শ্বে ও পশ্চাতের যোগাযোগ রক্ষাকারী দলের উপর আক্রমণের হুমকি দিতে লাগল। ৮ই নভেম্বর তারিখে পাঞ্জাব সরকার উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইলেন যে, নতুন ১৬০০ পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হলে জেনারেল মুলকায় অবস্থিত ধর্মান্ধদের উপনিবেশ বিধ্বস্ত করার জন্য অগ্রসর হতে পারবেন কিনা। ১২ তারিখে সরকার উত্তর পেলেন যে, আরো ২০০০ পদাতিক এবং কিছুসংখ্যক বন্দুক পাওয়া না গেলে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে জেনারেল হতাশাব্যঞ্জকভাবে আরো জানালেন যে, মধ্যবর্তী এলাকার উপজাতীয়দিগকে বশে আনতে না পারা পর্যন্ত মুলকা আক্রমণ করা সমুচিত হবে না।

সমগ্র সীমান্তে তখন আগুন জ্বলছে। ৪ঠা নভেম্বর পাঞ্জাব সরকার দেখতে পেলেন ছাউনিতে সৈন্যসংখ্যা সাংঘাতিকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে ভাইস্‌রয়ের অনুগামী বাহিনী থেকে কিছু সৈন্য ধার নিয়ে তাড়াহুড়া করে বন্দুকধারী ৭ম বাহিনী সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হল। জেনারেলের পশ্চাৎবর্তী যোগাযোগ রক্ষাকারী দলের উপর শত্রু আক্রমণের ভয় ছিল। সুতরাং এই দলকে রক্ষা করার জন্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সামরিক পুলিশের একটি শক্তিশালী দল পাঠিয়ে দেওয়া হল।[১] যানবাহন সরঞ্জাম হিসেবে পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে বিপুল অর্থব্যয়ে ৪২০০ উট এবং ২১০০ খচ্চর সংগ্রহ করে অতি দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১৪ই নভেম্বর নাগাদ পরিস্থিতি আরো গুরুতর আকার ধারণ করল। ভারতে অবস্থিত বৃটিশ বাহিনীসমূহের প্রধান সেনাপতি দ্রুত লাহোরে উপস্থিত হয়ে পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

আসল কথা, আমাদের আক্রমণ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। মূল পরিকল্পনা ছিল, গিরিপথের মধ্য দিয়ে আকস্মিক অভিযান চালিয়ে গিরিপথের পরবর্তী উন্মুক্ত উপত্যকা দখল করে নেওয়া[২] ভারত সরকারের

---

[১] পাঞ্জাব সরকারের চিঠি, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৫।

[২] পাঞ্জাব সরকারের চিঠি , ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৪।

হুকুম ছিল, ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে সমগ্র অভিযান সমাপ্ত করা। কিন্তু ১৪ই নভেম্বরেও দেখা গেল যে, আমাদের সেনাবাহিনীর পক্ষে গিরিপথ অতিক্রম করা অসম্ভব। উন্মুক্ত উপত্যকায় উপনীত হওয়া গেলে আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারা যেত এবং তাহলে সেখানে একাদিক্রমে অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করা যেত। কিন্তু তার পরিবর্তে বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে হল। উক্ত তারিখেই পাঞ্জাব সরকার আবেদন জানালেন যে, ১৫০০ সৈন্যের একটি অতিরিক্ত ব্রিগেড সীমান্তে পাঠাতে হবে। ১৯ তারিখে জেনারেল চেম্বারলেনের তারবার্তা থেকে এইরূপ আশংকার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, সীমান্তে আরো সৈন্য পাঠাতে বিলম্ব হলে হয়ত সব হারাতে হবে। ১৮ তারিখে শত্রুরা প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে আমাদের একটি ঘাঁটি দখল করে নেয়। কয়েকজন অফিসার ছাড়াও আমাদের ১১৪ জন সৈন্য হতাহত হয় এবং আমরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হই। পরের দিন শত্রুরা আমাদের আরো একটি ঘাঁটি দখল করে নেয়। পরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের এই ঘাঁটি পুনর্দখল করতে হয়। এই যুদ্ধে জেনারেল স্বয়ং মারাত্মকভাবে আহত হন। তাছাড়া ১২৮ জন সৈন্য ও কতিপয় অফিসার হতাহত হয়। আহত ও অসুস্থ অবস্থায় আমাদের যেসব সৈন্যকে ফেরত পাঠান অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, ২০ তারিখে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২৫ জনে। জেনারেল কর্তৃক প্রেরিত ১৯ তারিখের তারবার্তার উপসংহার ছিল এই রকম ঃ 'এক মাস যাবত আমাদের সৈন্যরা দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত। এই অবস্থায় শত্রুপক্ষের নতুন আক্রমণের মোকাবেলা করতে গিয়ে আমাদের সৈন্য ক্ষয় হচ্ছে খুব বেশি রকম। শত্রু আক্রমণের মোকাবেলা করা এবং রসদ সরবরাহ ও আহতদের পশ্চাৎভাগে পাঠাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের সম্মুখভাগের ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত সৈন্যদের সাহায্যের জন্য যদি আরো কিছুসংখ্যক নতুন সৈন্য প্রেরণ করতে পারেন, তাহলে সম্মুখের ক্লান্ত সৈন্যদের বিশ্রামের জন্য সমতল এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া যাবে এবং পশ্চাৎ থেকে সমর্থন যোগাবার জন্য তাদের ব্যবহার করা যাবে। অত্যন্ত জরুরী।

আমাদের সম্মুখে তখন এক বিরাট রাজনৈতিক বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিয়েছে। উপর্যুপরি আক্রান্ত হওয়ার দরুন আমাদের সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় যেকোন মুহূর্তে তারা আতংকগ্রস্ত হতে পারে এবং তাহলে বহু সৈন্যের প্রাণহানি ও অবশেষে ঐ গিরিপথের মধ্য

দিয়েই বিতাড়িত হতে পারে। এরকম একটি ব্যর্থ অভিযানে প্রাণহানির সংখ্যা কোন একটিমাত্র বড় যুদ্ধের তুলনায় কম হলেও সীমান্তে আমাদের মর্যাদা হানি করেছে এবং এমন রাজনৈতিক বিপর্যয়ের আশংকা সৃষ্টি করেছে, যার পরিণতি সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। এমতাবস্থায় পাঞ্জাব সরকার স্থির করলেন যে, জেনারেল চেম্বারলেন যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তবে গোটা সৈন্যবাহিনীই পারমেটলিতে পশ্চাদপসরণ করবে। কিন্তু পাঞ্জাব সরকারের এই হুঁশিয়ারীর মধ্যে বৃটিশ সৈন্যদের অনমনীয় সংকল্পকে ছোট করে দেখা হয়েছিল। ২২ তারিখে প্রাপ্ত তারবার্তায় জানা গেল যে, সৈন্যবাহিনী তাদের ঘাঁটি রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর এবং যতই কষ্টসাধ্য হোক না কেন চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে জেনারেল নিশ্চিত।

পরের দিন ২৩শ দেশীয় পদাতিক বাহিনীর একটি অংশ কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকসহ শিবিরে উপস্থিত হল। শত্রুপক্ষ ইতিমধ্যেই আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। আমাদের শিবিরে আরো নতুন সৈন্যের উপস্থিতি উপজাতীয়দের মধ্যে এক অবর্ণনীয় ভীতির সঞ্চার করল। সামরিক শক্তিসম্পন্ন এবং অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী বিশাল সাম্রাজ্যের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে শুরু করল তারা। পরের শুক্রবার (সপ্তাহের এই দিনটিতেই ধর্মান্ধরা সাধারণত যুদ্ধ আরম্ভ করত) কোন আক্রমণ হল না। কিন্তু আমরা অগ্রসর হতে পারলাম না তা সত্ত্বেও । ২৮শে নভেম্বর পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক প্রণীত কার্যবিবরণীতে সৈন্যবাহিনীর নিশ্চল অবস্থার নিন্দা করা হল এবং অগ্রসর হওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়া হল। আমাদের শিবিরে নতুন সৈন্যদল উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য এলাকাসমূহ থেকে বহু সংখ্যক উপজাতীয় দলে দলে শত্রুশিবিরে সমবেত হতে লাগল । তন্মধ্যে একজন উপজাতীয় সর্দারই[১] ৩০০০ সৈন্য নিয়ে এল । আর একজন দরবেশ ৫০০ ধর্মান্ধ যোদ্ধা প্রেরণ করে, যারা যুদ্ধে যোগদান করে শহীদ অথবা গাজী হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে।

আমাদের সকল নতুন সৈন্যদল ৫ই ডিসেম্বর এসে উপস্থিত হয় এবং আবার আমাদের অগ্রাভিযান শুরু করার জন্য জরুরী তাগিদ আসে। এখন আমাদের নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা ৯০০০। ৯৩তম পার্বত্যবাহিনী এবং অনুরূপ আরো কয়েকটি রেজিমেন্ট-এর অন্তর্ভুক্ত শক্তিশালী একটি বৃটিশ সৈন্যবাহিনী শত্রুর আক্রমণে বিব্রত অবস্থায় পাল্টা আক্রমণে অপারগ হয়ে

---

১. বাজৌরের ফয়জুল্লাহ্ খান।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ গিরিপথের খাচায় আবদ্ধ হয়ে থাকবে এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু পার্বত্য উপজাতীয়দের উপর ধর্মান্ধ শিবিরের বিরাট প্রভাবের যথার্থ গুরুত্ব আমরা দিই নাই। ধর্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে যেসব লোক ধর্মান্ধ শিবিরে যোগদান করেছিল, তাদের অন্তরে ছিল লুঠতরাজ করে ধনসম্পদ লাভের আশা অথবা শাহাদত লাভের আশা। ধর্মান্ধতা যাদের অপেক্ষাকৃত কম তাদের মনে ভয় ছিল, যদি তাদের ভূখন্ড বৃটিশ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, বা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। উপজাতীয়রা উৎসাহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে একটি সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সকল প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সীমান্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছিল এই রকম ঃ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল দূর থেকে দূরান্তরে। পেশোয়ার সীমান্তের মুসলমানরা শবৃকদর নামক স্থানে আক্রমণাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছিল আবার। ১৮৫২ সালে পরলোকগত লর্ড ক্লাইভের কাছে পরাজয়বরণের পর এই প্রথম তারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। কোহাট থেকেও গুজব শুনতে পাচ্ছিলাম যে, ওয়াজীরী এবং উৎমনখেল উপজাতীয়রা সেখানে প্রত্যাশিতভাবেই হামলা চালাচ্ছিল। কাবুল ও জালালাবাদ থেকে আগত গুপ্তচরেরা সোয়াত উপজাতীয়দের ধর্মীয় নেতা আখুন্দের সঙ্গে ছিল। তার সঙ্গে ৬০০০ সৈন্যসহ যোগদান করেছিল ধের সর্দার গাজান খাঁ। ৫ই ডিসেম্বর শবৃকদরের নিকটবর্তী স্থানে শত্রুরা আমাদের এলাকায় হামলা করেছিল।[১]

কিন্তু পার্বত্য উপজাতীয়দের মধ্যে ঐক্য সাধারণত খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং অস্ত্রবলে আমরা যে সাফল্য লাভ করতে পারিনি কূটনীতির মাধ্যমে ঐক্যজোটে ভাঙ্গন ধরিয়ে আমাদের সে উদ্দেশ্য সফল হতে লাগল। পেশোয়ারের কমিশনার ২৫শে নভেম্বর তারিখেই বোনাইর উপজাতির কিছু অংশকে সপক্ষে টেনে নিতে সমর্থ হয়েছিল। তারপর ২০০০ লোকের আরেকটি দলকে তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে যেতে প্রবৃত্ত করেন এবং সোয়াতের নেতাকেও তিনি সম্মত করেছিলেন তার অনুসারীবৃন্দকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে। এই ভাঙ্গনের আভাস পেয়ে ছোট-খাটো আরো কয়েকজন উপজাতীয় সর্দার তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। অবশিষ্ট যারা থাকে, তাদের মধ্যে সংক্রমিত হয় পারস্পরিক অনাস্থার বীজ। এই অনাস্থা ফলপ্রসূ হওয়ার উপযোগী বলে মনে হয় ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যেই। বোনাইর উপজাতীয়দের

---

[১] পেশোয়ার বিভাগের কমিশনার মেজর জেমস।

প্রতিনিধি কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, কিন্তু কোন সমঝোতায় উপনীত হতে পারে না। ১৫ তারিখে লুলুতে আমাদের সৈন্য আক্রমণের ফলে তাদের আলোচনা ত্বরান্বিত হয়েছিল। এই আক্রমণে শত্রুদের ৪০০ সৈন্য নিহত হয়। ১৬ই তারিখে আমরা আম্বেলা গ্রামটি জ্বালিয়ে দেই এবং সেখানে উপজাতীয়দের ২০০ লোক হতাহত হয়। সেই রাত্রেই বোনাইর উপজাতি তাদের মনস্থির করে ফেলে এবং কমিশনার সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে তার নির্দেশ প্রার্থনা করে। বোনাইরদের এই দলত্যাগ ধর্মান্ধদের আদর্শের প্রতি মরণ আঘাত হানে। এরপর প্রতি মুহূর্তেই কোন না কোন উপজাতি ধর্মান্ধ শিবির ত্যাগ করতে থাকে। বাজৌর ও ধের থেকে আগত উপজাতীয়রা পালিয়ে যায়। সোয়াতের সৈন্যরা সকলেই শিবির ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। এইভাবে পর্বত গাত্রের কুয়াশার মতই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় উপজাতীয়দের ঐক্যজোট। বিদ্রোহী ঘাঁটির প্রধান সম্বল বোনাইর উপজাতি ধর্মান্ধদের আস্তানার মধ্যেই পুড়িয়ে মারার জন্য আমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অতঃপর এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যেই বোনাইর উপজাতির সমর্থন ও পরিচালনায় একটি শক্তিশালী বৃটিশ ব্রিগেড পার্বত্য পথে নিরাপদে অগ্রসর হয়ে মুলকায় অবস্থিত বিদ্রোহী উপনিবেশ আক্রমণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করে। অতঃপর ২৩শে ডিসেম্বরের এই বাহিনী দুর্ভাগ্যকবলিত আম্বেলা গিরিপথে প্রত্যাবর্তন করে। ২৫শে ডিসেম্বর গোটা সৈন্যবাহিনী পুনর্বার সমতলভূমি অঞ্চলে ফিরে আসে। ফেরার সময় তাদের একটি বন্দুকের গুলীও খরচ করতে হয়নি।

বৃটিশ সৈনিকদের অসংখ্য সমাধিতে পরিপূর্ণ মারাত্মক সেই গিরিপথ ইতিমধ্যেই ছেড়ে এসেছি আমরা। কমপক্ষে আমাদের ৮৪৭ জন সৈন্য হতাহত হয়েছে। যুদ্ধ আরম্ভের সময় নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ছিল ৯০০০। সুতরাং হতাহত হয়েছিল মোট সৈন্য সংখ্যার প্রায় দশমাংশ। কেবলমাত্র গিরিপথেই উপরোক্ত সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়েছিল। তদুপরি ঠাণ্ডা লেগে যারা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল এবং রোগাক্রান্ত হয়ে যারা মারা গিয়েছিল তাদের সংখ্যা উপরোক্ত অংকের মধ্যে ধরা হয়নি। অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দান প্রসঙ্গে পাঞ্জাব সরকার বলেছিলেন যে, 'পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধ ইতিপূর্বে আর কখনো এতোটা প্রচণ্ড আকার ও প্রকৃতি ধারণ করেনি।' ধর্মান্ধরা বিভিন্ন উপজাতির এক শক্তিশালী ঐক্যজোট গঠনে সমর্থ হয়েছিল এবং এই ঐক্যজোটের উপর তাদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন ছিল। একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছিল যে, এই সব ধর্মান্ধরা মোটেই নিরীহ এবং

দুর্বল ধর্মপ্রচারক মাত্র ছিল না। ভারতে আমাদের শাসন কায়েম রাখার ব্যাপারে এরা ছিল স্থায়ী বিপদের উৎস। এরা যে ধর্মযুদ্ধের কথা ক্রমাগত প্রচার করছিল, সীমান্তের সকল উপজাতি সম্ভবত তাতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এই সংকটাবস্থা আরো তীব্র আকার ধারণ করেছিল এই কারণে যে, ঠিক ঐ সময় ভারতীয় সাম্রাজ্যের কোন দায়িত্বশীল শাসন প্রধান ছিল না। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড এলগিন মরণাপন্ন অবস্থায় নিভৃত পর্বতাঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। তার-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তিনি কোনই কাজকর্ম করতে পারছিলেন না।

এই যুদ্ধে আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তবে এর ফলে পরবর্তী চার বছর সীমান্তে নির্বিঘ্নে শান্তি বিরাজ করে। এই যুদ্ধে ধর্মান্ধ শিবিরের অর্ধেকের পতন ঘটেছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর অন্যান্য উপজাতীয়রা বিদ্রোহী উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষকে ভাল চোখে দেখছিল না। কারণ বিদ্রোহীরা তাদের পার্বত্য উপত্যকা অঞ্চলে যুদ্ধের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতক সর্দাররা নিজেদের এতটা বিপন্ন বলে মনে করেছিল যে, তাদের দুইজন[১] ১৮৬৬ খ্রীঃ সীমান্তস্থিত আমাদের অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আরেকজন নেতা[২] এই প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয় এবং বিদ্রোহীদের উদ্দীপনাকে পুনর্বার জাগ্রত করতে আরম্ভ করে। কিন্তু ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত তারা আমাদের ভূখণ্ডে ধ্বংস অভিযান চালাবার প্রশ্নে আত্মকলহে লিপ্ত ছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ৭০০ যোদ্ধা নিয়ে গঠিত বিদ্রোহী বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং উপজাতীয়দের ঐক্যজোটের ভিত্তি স্থাপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীঃ আমরা বিদ্রোহীদের যে শাস্তি দিয়েছিলাম সেকথা স্মরণ করে তাদের পক্ষেও এ ধরনের যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তবু ক্রমে ক্রমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধতা উপজাতীয়দের শুভবুদ্ধি হরণ করতে থাকে। তারা আগরর উপত্যকায় আমাদের একটি ফাঁড়ি আক্রমণ করে। সরকারীভাবে লিপিবদ্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে, অনুরূপ আক্রমণের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা না করা হলে আবার উপজাতীয়দের এক বিরাট ঐক্যজোটের মোকাবেলা করতে হত আমাদের। এবার অবশ্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ একটি মুহূর্ত নষ্ট না করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। উপজাতীয়দের শায়েস্তা করার জন্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সৈন্য প্রেরণের অনুমোদন দান করেন

---

১. মোহাম্মদ ইসহাক ও মোহাম্মদ ইয়াকুব।

২. মৌলভী আবদুল্লাহ।

৮ই সেপ্টেম্বর। ভারতের প্রধান সেনাপতির তত্ত্বাবধানে এবং জেনারেল ওয়াইল্ড, সি-বি-এর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আমাদের সৈন্যবাহিনী ৩০শে অক্টোবর তারিখে রওনা হয়। একই সময় আমরা উপজাতীয়দের মধ্যে একটি ঘোষণা জারি করলাম। তাতে বলা হল, যেসব উপজাতির উপর কোন রকম অত্যাচার বা নির্যাতন করা হয়নি, তাদেরও কেউ কেউ বৃটিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করেছে এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও পতাকা নিয়ে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। এইরূপ অন্যায় আচরণের প্রতিবিধান করা অবশ্য কর্তব্য। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বহুদিন যাবত তোমাদের এই অন্যায় আচরণ সহ্য করেছেন। কিন্তু আর সহ্য করা সম্ভব নয়। অতএব উপরোক্ত অন্যায় আচরণের জন্য এতদ্বারা তোমাদের কৈফিয়ত তলব করা হচ্ছে।'

এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দিতে চাই না। জুলাই মাসে পাঞ্জাব সরকারের কাছ থেকে কতকগুলো জরুরী তারবার্তা পাওয়া যায়। এসব তারবার্তায় পাঞ্জাব সরকার ঝড়ের হুঁশিয়ারী জ্ঞাপন করেন। সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল লিখেছিলেন[1]—'উপরোক্ত হুঁশিয়ারী এতই জরুরী এবং সাহায্যের আবেদন এতই অনিবার্য ছিল যে, সরকার বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করা সমীচীন মনে করেন নি। কেননা, বিদ্রোহীরা কার্যত আমাদের সেনাবাহিনীর কিছু অংশকে অবরুদ্ধ করেছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে প্রধান সেনাপতি এবার পাঞ্জাবের সামরিক ঘাটিগুলো দুর্বল করলেন না অথবা সীমান্তবর্তী ফাঁড়িগুলো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করালেন না। বরং তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে কয়েক রেজিমেন্ট সৈন্য নিয়ে আসলেন। আক্রমণকারী দলটি গঠিত হয় ৬০০০ থেকে ৭০০০ নিয়মিত সৈন্য নিয়ে। তাছাড়াও সীমান্ত এলাকায় অবস্থানকারী মোট সৈন্য সংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ করা হল । বলতে গেলে ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ অংশকেই ধর্মান্ধ পার্বত্য উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে সমাবেশ করা হল।[2] আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসের শ্বাসরোধকর গরমেও

---

১. সামরিক বিভাগের সেক্রেটারীর কাছে লিখিত পত্র, তাং ৫ই নভেম্বর, ১৮৬৮।

২. রাওয়ালপিণ্ডি থেকে গোলন্দাজ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী এবোটাবাদে প্রেরিত হল; লাহোর থেকে পদাতিক বাহিনী এবোটাবাদে প্রেরিত হল; শিয়ালকোট থেকে পদাতিক বাহিনী দারবাদে প্রেরিত হল; দূরবর্তী পার্বত্য ঘাঁটি বাকলোহ এবং ধর্মশালা থেকে গুর্খা বাহিনী নিয়ে আসা হল; কানপুর, আলিগড়, অমৃতসর, লাহোর ক্যাম্বেলপুর থেকে অশ্বারোহী ও হুসার বাহিনী রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেরণ করে রিজার্ভ গঠন করা হল; পেশোয়ার এবং নওশেরাতেও সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রাখা হল।

আমাদের সৈন্যদল এমন দ্রুত মার্চ করে অগ্রসর হতে লাগল, যা স্বাস্থ্যকর নাতিশীতোষ্ণ এলাকাতেও সচরাচর দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাইন স্থাপনকারী বাহিনী এবং সেতু ও সড়ক নির্মাণকারী বাহিনী উনত্রিশ দিনে ছয়শ' মাইল পথ অতিক্রম করে। অভ্যন্তরীণ প্রদেশসমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনী উত্তরদিকে অগ্রসর হতে দেখে উপজাতীয়রা সম্পূর্ণরূপে দমে যায় এবং ঐক্যজোট গঠনের জন্য তাদের সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। প্রভূত অর্থ ব্যয় করে আমরা আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত একটি পূর্ণাঙ্গ সৈন্যবাহিনী কৃষ্ণ পর্বতে সমাবিষ্ট করে ফেলি। সীমান্ত এলাকার বিদ্রোহীরা আমাদের এই সৈন্যসমাবেশের মোকাবেলা করতে সাহস পায় না। এ সম্পর্কে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল লিখেছিলেন, ১০,০০০ ফুট উচ্চ পর্বতে যুদ্ধরত ইউরোপীয় এবং দেশীয় সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত বৃটিশ সেনাবাহিনীর পরিচালক সেনাপতির নিজের জন্যেও কোন তাঁবু ছিল না।[১] যাই হোক, আমরা এই অশান্তির যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছি; এই অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ও আশু কারণ ধর্ম না অন্য কিছু ছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে পাঞ্জাব সরকার এই অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দান প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, এই অভিযানের মাধ্যমে হিন্দুস্থানী ধর্মান্ধদের বিতাড়িত করতেও পারিনি, অথবা আত্মসমর্পণ করে হিন্দুস্থানে তাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করতেও পারিনি।[২]

আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী শিবির গঠন থেকে শুরু করে ১৮৬৮ খ্রীঃ তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশেষ অভিযান পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করলাম। ওয়াহাবীদের যুদ্ধাত্মক তৎপরতা ভারতের সর্বত্র যে বিস্তার লাভ করেছিল তার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের কলেবর বিরাট আকার ধারণ করবে। তবে একথা সত্য যে, তাদের কার্যকলাপ কেবলমাত্র পাঞ্জাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রায় ৩০ বছর আগে দক্ষিণ ভারতের কেন্দ্রস্থলে ধর্মান্ধদের একটি সংগঠন যেন বেশ পাকাপোক্তভাবে খুঁটি গেড়ে বসেছিল। স্যার বার্টল্ ফ্রিয়ারের কাছ থেকে জানা যায় যে, হায়দারাবাদের নিজামের যে ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, সেও

---

[১] সামরিক দফতরের সেক্রেটারীর কাছে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের পত্র ৫ই নভেম্বর, ১৮৬৮

[২] পাঞ্জাব সরকারের পত্র, ৬ই নভেম্বর, ১৮৬৮।

তৎকালীন ওয়াহাবী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল। পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে না গেলে নবনির্মিত কামান বন্দুকসহ সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের এক বিপুল ভাণ্ডার উক্ত সংগঠনের নেতাদের হস্তগত হত এবং আধা-স্বাধীন দেশীয় রাজন্যবর্গ আর দক্ষিণ ভারতের সামরিক প্রধানদের মধ্যে অনেকেই ওয়াহাবীদের দলে ভিড়ে তাদের শক্তিশালী করত। এর ফলে শিখ শাসনাধীন সীমান্ত এলাকার উপর ক্রমাগতভাবে দুর্যোগ ঘটেছে এবং তারই তিক্ত উত্তরাধিকার বর্তেছে আমাদের উপর। ধর্মান্ধদের দ্বারা সীমান্তে বিরামহীন অশান্তি বিরাজমান রাখা ছাড়াও তিনবার উপজাতীয়দের বৃহদাকার ঐক্যজোট সংগঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই বৃটিশ ভারতকে একেকটি যুদ্ধের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করতে হয়েছে। একের পর এক বৃটিশ গভর্ণমেন্ট সীমান্তের এই ধর্মান্ধদেরকে ভারতে বৃটিশ শাসনের জন্য এক স্থায়ী বিপদ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এদের নির্মূল করার জন্য আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এই ধর্মান্ধ শিবির এখন পর্যন্ত আমাদের অবাধ্য প্রজাদের এবং সীমান্তের ওপারে অবস্থিত আমাদের শত্রুদের আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল হয়ে বিরাজ করছে। মধ্য এশিয়ার রাজন্যবর্গের মধ্যে সর্বদাই যে আত্মকলহ লেগে আছে, যেকোন মুহূর্তে আমরা তাতে জড়িত হয়ে পড়ব কিনা জানি না। কিন্তু এই বছর শেষ হওয়ার আগেই আরেকটি আফগান যুদ্ধে আমাদের জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। এই যুদ্ধ যখন শুরু হবে—শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, তা শুরু হবেই—তখন আমাদের সীমান্তে অবস্থিত বিদ্রোহী উপনিবেশ আমাদের শত্রুপক্ষে বহু সহস্র সৈন্যের যোগান দিবে। আমাদের ভয় কেবলমাত্র বিশ্বাসঘাতকদের জন্যেই নয়। আমাদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রাজদ্রোহী জনতা এবং সীমান্তে অবস্থিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপজাতীয়দের জন্যেও আমাদের ভয়। কেননা এরা উভয়েই বারে বারে জোটবদ্ধ হয়ে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। বিগত নয় শতাব্দী যাবত উত্তর দিক থেকে আক্রমণে অভ্যস্ত হয়েছে ভারতের জনসাধারণ। এশিয়ার বিভিন্ন জাতিকে একটি ধর্মযুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম কোন নেতার অধীনে পশ্চিমা মুসলমান যাযাবরদের সমর্থনপুষ্ট বিদ্রোহী শিবির কি পরিমাণ শক্তিশালী হবে, কেউ বলতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অবিরাম ষড়যন্ত্র

সীমান্তের বিদ্রোহীদের এই অসাধারণ শক্তির উৎস দীর্ঘকাল যাবত আমাদের কাছে রহস্যাবৃতই থেকেছে। পাঞ্জাবে আমাদের পূর্ববর্তী দেশীয় শাসক শক্তির কাছে তিনবার এরা পরাজিত হয়েছে। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর পদতলে এরা পর্যুদস্ত হয়েছে তিনবার। কিন্তু তথাপি এই বিদ্রোহী শিবির এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এই অবিনশ্বরতা এক অলৌকিক ঘটনারই সামিল। ভক্ত মুসলমানরা এর মধ্যেই তাদের চূড়ান্ত বিজয়ের আভাস দেখতে পায়। এর পশ্চাতে যে সত্য নিহিত রয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা যখন সীমান্তের বিদ্রোহী উপনিবেশকে সামরিক শক্তিবলে পদানত করার চেষ্টা করেছি, তখন আমাদের মুসলমান প্রজাবৃন্দের ধর্মান্ধ অংশটি তাদের যুগিয়েছে অফুরন্ত অর্থ ও লোকবল। যে অঙ্গার নির্বাপিত মনে করে আমরা ফেলে দিয়েছি, তাকেই তৈল ঢেলে সযত্ন পরিচর্যায় ওরা আবার প্রজ্বলিত করে তুলেছে।

সৈয়দ আমহদ ১৮২০—২২ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রচারকার্য চালিয়েছিল, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সেদিকে কর্ণপাত করেননি। বৃটিশ ভারতের সর্বত্র সে ছড়িয়ে দিয়েছে তার ভক্ত অনুচরবৃন্দকে। জনসাধারণের মধ্যে হাজার হাজার লোককে সে তার মুরীদে পরিণত করেছে। সে নিয়মিতভাবে ধর্মীয় শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা, বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের উত্তরাধিকার প্রথা কায়েম করেছে। একই সময় আমাদের অফিসারবৃন্দ রাজস্ব আদায় করেছে, বিচারকার্য পরিচালনা করেছে, সৈন্য পরিচালনাও করেছে। কিন্তু তাদের চারপাশে যে বিরাট এক ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে উঠছিল, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিল তারা। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে এই নির্বিকার অচৈতন্য থেকে জেগে ওঠে তারা। এই সময় কলকাতায় ধর্মগুরুর যেসব শিষ্য—সাগরেদ ছিল, তাদের মধ্যে পেশাদার কুস্তিগীর ও গুণ্ডা প্রকৃতির একটা লোক ছিল তিতু মিয়া[1] নামে। এই ব্যক্তি এক সম্ভ্রান্ত কৃষকের পুত্র হিসেবে জীবন আরম্ভ করলেও জমিদারের ঘরে বিয়ে করে নিজের অবস্থার উন্নতি

---

[1] ওরফে নিছার আলী। জন্মস্থান চাঁদপুরঃ গ্রাম. বাসস্থান বারাসত।

করেছিল। কিন্তু উগ্র ও দুর্দান্ত চরিত্রের দরুন তার সে অবস্থা বহাল থাকেনি। কিছুদিন কলকাতায় মুষ্টিযোদ্ধার অসম্মানজনক জীবনযাপন করতে হয়েছিল তাকে। সে যুগে বাংলার গ্রামাঞ্চলের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাদের জমিজমা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য পারিবারিক কলহ নিষ্পত্তি করার জন্য লাঠিয়ালদের সাহায্য গ্রহণ করত। এমনি এক লাঠিয়াল বাহিনীতেও সে যোগদান করেছিল। এই জীবিকার দরুন অবশেষে কারাগারে যেতে হয়েছিল তাকে। সেখান থেকে মুক্তিলাভের পর সে হজ্জ করতে মক্কায় গমন করেছিল। সেই পবিত্র নগরীতেই তার সাক্ষাৎ হয়েছিল সৈয়দ আহমদের সাথে। মক্কা থেকে সে ভারতে ফিরে এসেছিল শক্তিশালী একজন ধর্মপ্রচারক হয়ে। তারপর কলকাতার উত্তর ও পূর্ব দিকের জেলাগুলোতে সে ব্যাপকভাবে সফর করে এবং অসংখ্য লোককে তার শিষ্য করে নেয়। তারপর আল্লাহর তরফ থেকে কাফেরদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে গোপন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সীমান্তের ধর্মান্ধ বাহিনী পেশোয়ার দখল করার ফলে তার সাহস বৃদ্ধি পায় এবং ছদ্মবেশ ফেলে দিয়ে সে আপন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। সে সময় তার সাগরেদদের উপর হিন্দু জমিদারগণের সামান্যতম জুলুমের[১] ফলেই তার নেতৃত্বে এক প্রচন্ড কৃষক বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। এর পর একাদিক্রমে অনেকগুলো কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। সুরক্ষিত শিবির থেকে বিদ্রোহীরা ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করে এবং কিছু লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করে। কলকাতার উত্তর ও পূর্বে অবস্থিত তিনটি জেলা[২] সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহীদের পদানত হয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহী বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল তিন থেকে চার হাজার। একটি গ্রামের একজন অধিবাসী বিদ্রোহীদের দৈব অনুশাসন মেনে নিতে অস্বীকার করার ফলে সেই গ্রাম[৩] থেকেই তাদের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়। আরেকটি জেলাতেও একটি গ্রামে[৪] তারা লুঠতরাজ করে এবং একটি মসজিদ ভস্মীভূত করে। পক্ষান্তরে ঈমানদার লোকদের কাছ থেকে তারা নগদ অর্থ ও ধান-চাউল আদায় করে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে একটি সুরক্ষিত

---

[১] ইছামতী নদীর তীরবর্তী জমিদার কৃষ্ণরায় তার প্রজাদের কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তার উপর কর আরোপ করত উচ্চ হারে। আরেকজন জমিদার মোহররমের সময় মন্দির ধ্বংস করার অপরাধে এক কৃষক প্রজাকে জেলে পাঠিয়েছিল।

[২] ২৪-পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর।

[৩] ফরিদপুর জেলার।

[৪] নদীয়া জেলার শরফরাজপুর।

গ্রামে বিদ্রোহীরা তাদের সদর দফতর স্থাপন করে এবং সেখানে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে। ৬ই নভেম্বর তারিখে সেখান থেকে ৫০০ বিদ্রোহী যোদ্ধা একটি ক্ষুদ্র শহর আক্রমণ করে এবং সেখানকার পুরোহিতকে হত্যা করে। তারপর তারা সেখানে দুইটি গরু (হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতুল্য প্রাণী) হত্যা করে, তার রক্ত দিয়ে মন্দির অপবিত্র করে এবং নিহত গরুর দেহ খণ্ডসমূহ দেব প্রতিমার সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখে। অতঃপর তারা ঘোষণা করে যে, সেখান থেকে ইংরেজ শাসন উৎখাত হয়েছে এবং মুসলমান রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর তাদের অবিরাম উৎপাত চলতে থাকে। সাধারণত তারা যে কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে সেটা হচ্ছে প্রথমে একটি হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে গরু জবাই, গ্রামবাসীরা তাতে বাধা দিলে তাদের হত্যা অথবা বিতাড়িত করে তাদের ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করা এবং অবশেষে জ্বালিয়ে দেওয়া। মুসলমানদের মধ্যে যারা তাদের দলে যোগদান না করত তাদের প্রতিও বিদ্রোহীরা একই রকম বৈরী আচরণ করত। একজন বিত্তশালী মুসলমান তাদের আনুগত্য অস্বীকার করলে তারা তার বাড়ি লুট করে এবং তার কন্যাকে জোরপূর্বক তাদের দলের সর্দারের সঙ্গে বিবাহ দেয়।

কিছুদিন যাবত জেলা কর্তৃপক্ষের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর অবশেষে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে কলকাতা থেকে একদল অনিয়মিত সৈন্য প্রেরিত হয় বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য। ধর্মান্ধরা কোন প্রকার আপোস আলোচনায় বসতে অস্বীকার করে। যাতে অনর্থক রক্তপাত না ঘটে সেজন্য উক্ত সৈন্যদলের সেনাপতি তার সৈন্যদের আদেশ দেন বন্দুকে ফাঁকাগুলী করতে। দলে দলে বিদ্রোহীরা আমাদের সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকলে ফাঁকাগুলী করা হয় তাদের উপর। কিন্তু তারা আমাদের সৈন্যদের কেটে টুকরা টুকরা করতে থাকে। কলকাতা থেকে অশ্বারোহণে মাত্র কয়েক ঘন্টার পথের দূরত্বে এসব ঘটনা ঘটছিল। ১৭ই তারিখে তথাকার ম্যাজিস্ট্রেট আরো কিছু সৈন্য যোগাড় করে পাঠালেন। তন্মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্যদের পাঠান হল হস্তীপৃষ্ঠে। এক হাজার বিদ্রোহীর একটি দল তাদের ধাওয়া করে নদীর তীর পর্যন্ত বিতাড়িত করল। যারা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে পারল না, তারা বিদ্রোহীদের তরবারিতে কাটা পড়ল। অবশিষ্টরা নৌকাযোগে পশ্চাদপসরণ করল। এবার বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য নিয়মিত সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। কলকাতা থেকে একদল দেশীয় পদাতিক, কিছু অশ্বারোহী গোলন্দাজ এবং দেহরক্ষী বাহিনীর একটি দল দ্রুত রওনা হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা তাদের কেল্লার

নিরাপত্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আমাদের সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করতে অবতীর্ণ হল। আগের দিন নিহত একজন ইউরোপীয় সৈনিকের বিকৃত মৃতদেহ সম্মুখে ঝুলিয়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হল তারা। প্রচণ্ড যুদ্ধে পর্যুদস্ত হল বিদ্রোহীরা। পরাজিত হয়ে পরিখায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হল তারা। ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাদের বাঁশের কেল্লা, নিহত হল তাদের অধিনায়ক তিতু মিয়া। ৩৫০ জন বিদ্রোহীকে বন্দী করা হল। বিচারে তাদের ১৪০ জনকে দেওয়া হল বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড। আর তিতু মিয়ার ঘনিষ্ঠ সহচর একজনকে দণ্ডিত করা হল মৃত্যুদণ্ডে।

সংস্কারপন্থীদের দিন ফুরিয়ে এসেছে বলে মনে হল। পাঞ্জাব সীমান্তে তাদের অধিনায়ক নিহত ও সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়েছে। দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্রোহীদের অবস্থাও একই রকম। ধর্মীয় নেতা পাটনায় তার যে কয়জন খলিফা বা ধর্মীয় উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে গিয়েছিল, তারা এবার এগিয়ে এল। এমন সব প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী তারা হাজির করল, যারা ঘোষণা করল যে তাদের ধর্মীয় গুরুকে মানব চক্ষুর অন্তরালে ধূলিরাশির দ্বারা সৃষ্ট মেঘের মধ্যে লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। তারা তাদের অনুসারীদের বুঝাতে লাগল যে, ধর্মীয় গুরু স্বয়ং তার এই অন্তর্ধান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। গুরু নিজেই প্রার্থনা করেছিল যেন প্রাচীন যুগের মূসা নবীর মত তার কবরও তার শিষ্যদের চোখের আড়ালে লুক্কায়িত রাখা হয়, যাতে তার অস্থি উপাসনার মত ধর্ম বিরোধী ব্যাপার না ঘটাতে পারে। খলিফারা আরো প্রচার করতে লাগল যে, বর্তমান যুগের দুর্বলচেতা মানুষের কাছ থেকে সর্বশক্তিমান তাদের গুরুকে তুলে নিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংরেজ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হতে পারবে, সেদিন আবার নেতা অবতীর্ণ হবে এবং তারই নেতৃত্বে জিহাদে জয়লাভ হবে অবশ্যম্ভাবী। মুসলমানের জন্য এতে অসম্মানের কিছু নেই। পূর্বেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। ইউনুস নবী কিছুদিনের জন্যে অন্তর্ধান হয়ে এক বিরাটকায় মাছের পেটে লুকিয়েছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত। মূসা পয়গম্বরও 'ওহি' (ঐশীবাণী) গ্রহণের জন্য সিনাই পর্বতে আরোহণ করে অদৃশ্য হয়েছিলেন। বিধর্মী 'গগ্' ও 'ম্যাগগ'কে বন্দী করেছিলেন যে মহান নেতা জুলকারনাইন, তিনিও অনুরূপভাবেই অন্তর্ধান হয়েছিলেন। ঈসা পয়গম্বরকে মৃত্যু স্পর্শও করতে পারেনি।[১] সুতরাং ঈমানদারগণের জন্য নতুন উদ্যমে জিহাদে যোগদান করা অবশ্য কর্তব্য। পাটনার খলিফাগণ মুজাহিদ বাহিনীর একজন

---

[১] ক্যালকাটা রিভিউ

নতুন সেনাপতি[১] নিযুক্ত করল। তলোয়ারধারী ধর্মান্ধদের ক্রমবর্ধমান এক বাহিনী সহকারে এই সেনাপতি উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

ধর্মীয় নেতারা অপার্থিব শক্তির অলৌকিকত্ব সম্পর্কে এমন দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, কিছুকাল পর্যন্ত সে রহস্য মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং সবকিছু চলছিল নির্বিঘ্নেই। দক্ষিণ বাংলার ভক্ত প্রচারকদের মধ্যে একজন ঢাকা ও সিলেটসহ পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় প্রচারকার্য চালাবার পর এক হাজার অনুচর সঙ্গে নিয়ে উত্তর দিকে সীমান্ত পর্যন্ত ১৮০০ মাইল অগ্রসর হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবত গুরুর অনুপস্থিতির দরুন তার মনে তীব্র উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় এবং স্বল্পস্থায়ী এক অভিযান চালাবার পরই সে স্থির করে যে, আল্লাহ্ তার গুরুকে যে সুদূর পর্বত গুহায় লুকিয়ে রেখেছে, সেই গুহায় সে প্রবেশ করবে। তার এই সত্যনিষ্ঠা তার দলের অন্যান্য আগ্রহী নেতাদের সন্দিহান দৃষ্টিকে অতিক্রম করে যায় এবং সে সেই পার্বত্য তীর্থে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেখানে সে দেখতে পায় খড় দিয়ে তৈরি তিনটি মূর্তি। এতে তার মোহভঙ্গ হয়। অভিশপ্ত গুহা থেকে সে পালিয়ে আসে এবং তার অনুচরবৃন্দকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের হুকুম দেয়। তারপর কলকাতার যেসব মুরীদ তার কাছে অর্থ ও লোকজন প্রেরণ করছিল, তাদের কাছে ঘৃণাপরবশ হয়ে সে এক দীর্ঘ পত্রে তার মনোভাব ব্যক্ত করে।

পত্রে সে লিখেছিল, "সালাম আলায়কুম—আল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। মোল্লা কাদির ধর্মীয় নেতার মূর্তি নির্মাণ করেছিল। কিন্তু সে মূর্তি কাউকে দেখাবার আগে সে সকলকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল যে, তারা কখনো নেতার সঙ্গে করমর্দনের বা কথা বলার চেষ্টা করবে না। কারণ তা'হলে চৌদ্দ বছরের জন্য নেতা অন্তর্ধান করবে। গভীর শ্রদ্ধাভরে জনতা দূর থেকে প্রাণহীন সেই মূর্তি অবলোকন করেছিল এবং তার প্রতি অভিবাদন জানিয়েছিল। কিন্তু জনতা তাদের আকুল আবেদনের কোন জওয়াব না পেয়ে তাদের ধর্মীয় গুরুর সঙ্গে করমর্দন করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। জনতার সন্দেহ উপশম করার চেষ্টা করেছিল মোল্লা কাদির এবং সে বলেছিল যে, পূর্বাহ্নে না জানিয়ে যদি কেউ গুরুর সঙ্গে করমর্দনের চেষ্টা করে, তবে গুরুর খাদেম পিস্তল দিয়ে তাকে গুলী করবে।" অতঃপর চিঠিতে ধূর্ত মোল্লা কাদির কিভাবে জনসাধারণকে তাদের বে-ঈমানীর জন্য ভর্ৎসনা করে, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। সর্বশেষে চিঠিতে লেখা হয়েছিল, "অনেক

---

[১] মৌলবী নসরুদ্দীন।

অনুনয় বিনয়ের পর জনতা সেই মূর্তি পরিদর্শনের অনুমতি পেয়েছিল। মূর্তি পরীক্ষা করে তারা দেখতে পেয়েছিল যে, একটি ছাগলের চামড়ার মধ্যে শুকনো ঘাস পাতা ঠেসে দিয়ে কয়েকটি কাঠের টুকরো এবং কিছু চুলের সাহায্যে সেটাকে মানবাকৃতি দেওয়া হয়েছিল। পীর সাহেবকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তদুত্তরে সে এর সত্যতা স্বীকার করে বলেছিল যে, অলৌকিক শক্তিবলে তার গুরু ঐ মূর্তি ধারণ করেছিল। এসব ভণ্ডদের ভ্রান্তি এবং মিথ্যাচার এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। আমি এ পাপ থেকে আমার আত্মাকে রক্ষা করেছি।"

ধর্মান্ধরা পর্যুদস্ত বলে আরেকবার অনুমিত হয়েছিল। কিন্তু পাটনার খলিফাগণ তাদের অদম্য উৎসাহ এবং অফুরন্ত অর্থবলে তাদের ভূলুণ্ঠিত পবিত্র পতাকা পুনরায় উত্তোলিত করল। সারা ভারতে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইতিহাসের এক বৃহত্তম ধর্মীয় পুনরুত্থান সাধিত করল তারা। দুই খলিফা[১] স্বয়ং বাংলা ও দক্ষিণ ভারত সফর করেছিল। এছাড়া তাদের অসংখ্য ছোট ছোট মিশনারী দল ছিল। দক্ষ সংগঠনের মাধ্যমে তারা মুরীদগণের তাগিদে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই আস্তানা স্থাপন করতে পারত। এইভাবে ধর্মান্ধ অধ্যুষিত প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই একজন করে প্রচারক নিযুক্ত হয়। ভ্রাম্যমাণ মিশনারীরা মাঝে মাঝে এই সকল জেলা সফর করে সেখানকার স্থায়ী প্রচারকদের উদ্যমকে জাগ্রত রাখতে থাকে। আর পাটনায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রচার সংস্থা এই সকল প্রচারকদের প্রভাবকে স্থায়ী ও সুসংহত করতে থাকে। বাংলায় এইসব প্রচারকদের অশুভ প্রভাব কিরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করব। দক্ষিণ ভারতেও এরা এমন প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল যে, স্ত্রীলোকেরা তাদের গহনাপত্র স্বেচ্ছায় ধর্মান্ধদের তহবিলে দান করছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলো থেকে দলের পর দল লোক সংগ্রহ করে ধর্মান্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। দেশের সর্বত্র মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তারা গভীর আলোড়ন

---

[১] বিলায়েত আলী ও ইনায়েত আলী। প্রথমোক্ত জন বাংলায় মিশনারী সফর শেষ করে বোম্বাই, নিজাম রাজ্য ও মধ্য ভারতকে তার বিশেষ কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে ইন্যায়েত নিম্নাঞ্চলের মালদা, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলায় তার কর্মতৎপরতা নিবদ্ধ রেখেছিল। জৌনপুরী নিবাসী কেরামত আলী ফরিদপুর থেকে এই আন্দোলনকে পূর্ব দিকে ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও বরিশালে সম্প্রসারিত করে। বিলায়েত আলীর দক্ষিণ ভারতীয় মুরীদ জয়নুল আবেদীনের কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তর-পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা ও সিলেট জেলা।

সৃষ্টি করেছিল, যদিও বাংগালীদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ফলেই ধর্মান্ধদের আন্দোলন এরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, তথাপি এক সময় ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই পুনর্জাগরণের আন্দোলন সমান উত্তাপেই ফেটে পড়েছিল। পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছিলেন, 'সরকারী কর্তৃপক্ষের আশ্রয় পুষ্ট হয়ে তাদেরই নাকের ডগায় এরা আমাদের জনবহুল জেলাসমূহের জনসাধারণের মধ্যে রাজদ্রোহমূলক প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিল এবং মুসলমান জনসাধারণের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এক অসাধারণ অথচ নিশ্চিত কুপ্রভাব বিস্তার করছিল।'[১]

এই বিস্ময়কর প্রভাবের উৎপত্তি কেবলমাত্র অশুভ ভিত্তির উপরেই ঘটেনি, সৈয়দ আহমদ ধর্মীয় নেতা হিসেবে তার জীবন আরম্ভ করেছিল দুইটি মহান নীতির প্রবক্তারূপে। নীতি দুইটি হচ্ছে, ঈশ্বরের একত্ব এবং মানুষের সাম্য। সত্যিকার ধর্ম প্রচারকরা সকলেই এই দুই নীতি অনুসরণ করে থাকে। দেশবাসীর অন্তরে যে ধর্মভাব দীর্ঘকাল যাবত সুপ্ত অবস্থায় ছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত হিন্দু ধর্মের সাহচর্যের দরুন সৃষ্ট কুসংস্কার অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমানদের মনকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, এবং ইসলাম ধর্মকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছিল, সৈয়দ আহমদ এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নাড়া দিয়েছিল মুসলমানদের সেই ধর্মনিষ্ঠ মনের দুয়ারে। সে দেখতে পেয়েছিল যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রতিমা পূজার আনুষ্ঠানিকতায় সমাহিত হয়েছে। সৈয়দ আহমদ একজন দুর্বৃত্ত ছিল। সে এবং তার ঘনিষ্ঠ শিষ্যবর্গ ভণ্ডের দলে পরিণত হয়েছিল একথা সত্য হওয়া সত্ত্বেও আমি একথা বিশ্বাস না করে পারি না যে, সৈয়দ আহমদের জীবনে অন্তর্বর্তী এমন একটা সময় ছিল, যখন সর্বান্তঃকরণে বেদনাকুল হৃদয়ে সে তা দেশবাসীর মুক্তি কামনা করেছিল এবং তার অন্তর নিবদ্ধ হয়েছিল একমাত্র আল্লাহর প্রতি। উত্তেজিত স্বভাবের লোক হলেও সে তার এই চরিত্র লুকিয়ে রাখত বাহ্যিক শান্ত অবয়বের মধ্যে। ধর্মীয় ধ্যানে সে এমন মগ্ন থাকত যে, সেটাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে মৃগীরোগ বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু এশিয়াবাসীর প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এটা হচ্ছে সর্বশক্তিমানের সাথে সরাসরি যোগাযোগের লক্ষণ। অপার্থিব ধ্যান মগ্নতায় সে প্রাচীনকালের পয়গম্বরগণকে তার অন্তর্দৃষ্টিতে অবলোকন করত এবং ভারতের দুইটি প্রধান ধর্মীয় মতের যে দু'জন প্রবক্তা দীর্ঘকাল পূর্বেই পরলোকগমন করেছিলেন,

---

[১] সরকারী কার্যবিবরণী : ১৮৬৫।

তাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে যখন সে তার মিশন শুরু করে, তখন তার বয়স ছিল চৌত্রিশ বছর। মধ্যম অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক দীর্ঘকায় ছিল সে। আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রুমণ্ডিত ছিল তার মুখমণ্ডল। স্বল্পভাষী ও বিনম্র স্বভাবের এই লোকটি আইন-কানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কেই মতামত প্রচার করত সে, তত্ত্বগত কোন আলোচনা করত না। শত্রুরা বলত যে, তত্ত্বগত আলোচনা করার মত যোগ্যতা ছিল না তার। পক্ষান্তরে তার শিষ্যরা বলত যে, ধর্মীয় চিন্তার যে উচ্চমার্গে সে আরোহণ করেছিল, তাতে তত্ত্বগত আলোচনা ছিল তার পক্ষে অতি তুচ্ছ বিষয়। সর্বাগ্রে যারা তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে এমন দুই বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি ছিল, যারা লালিত হয়েছিল দিল্লীর সেই প্রখ্যাত দরবেশ সম্পর্কিত আলোচনার পরিবেশে, যিনি 'ভারত সূর্য' নামে অভিহিত ছিলেন এবং আলোচ্য ধর্মীয় নেতাও সে দরবেশের কাছে প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণ করেছিল।

উপরোক্ত দুই ব্যক্তি[১] ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠতম মুসলমান পণ্ডিতের পরিবারভুক্ত। ইসলামী ভাষা এবং ইসলামী আইন সম্পর্কে তিনি সযত্নে এই দুইজনকে শিক্ষাদান করেছিলেন। তারা উভয়েই তাদের দেশবাসীর ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণের সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তারা উভয়েই তাদের মূর্খ পীর ভাই ও প্রাক্তন দস্যুকে এই সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বলে গ্রহণ করেছিল। এই দুই বিজ্ঞ ও বিনয়ী আইনশাস্ত্রবিদ প্রকাশ্যে যেভাবে সামান্য আরবী জ্ঞানসম্পন্ন অশিক্ষিত প্রাক্তন অশ্বারোহী সৈন্যকে সম্মান করে, তাতে ভবিষ্যৎ ধর্মীয় নেতার প্রতি জনগণের দৃষ্টি সর্বপ্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিল। দেশাত্মবোধমূলক ইসলামী সাহিত্যে তাদের গভীর জ্ঞানের দরুন সৈয়দ আহমদের ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি তারা প্রকাশ্য সমর্থন দান করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তারা নিজেরাও তার নেতৃত্ব স্বীকার করেছিল। জনগণের মধ্যে সাধারণভাবে এরূপ ধারণা প্রচলিত থাকে যে, আল্লাহ তার বান্দাগণকে ধর্মীয় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং পারলৌকিক মুক্তির পথে তাদের পরিচালিত করার জন্য মাঝে মাঝে ইমাম বা নেতা প্রেরণ করে থাকেন। এই ধারণা থেকেই সাধারণ মানুষের কাছে সৈয়দ আহমদ আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধির যাবতীয় লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি-রূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। প্রথমত, গোঁড়া মতবাদী বংশ তালিকা অনুসারে

---

[১] শাহ্ আবদুল আজিজের ভ্রাতুষ্পুত্র মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল এবং জামাতা মৌলবী আবদুল হাই।

সৈয়দ আহমদ ছিল স্বয়ং মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধর। আল্লাহ-রাসূলের সাথে যোগসূত্র স্থাপনকালীন তার ধ্যান-আরাধনা, তার গম্ভীর মৌনতা ও বিনয়ী স্বভাব এবং তার দৈহিক আকৃতি, সব কিছুতেই মহানবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে তার সাদৃশ্যের কথা বলা হত। যে বারোজন খলিফা সমগ্র পৃথিবীতে সত্য ধর্ম কায়েম করবে, তন্মধ্যে ছয়জনের আবির্ভাব ও তিরোভাব ইতিমধ্যেই ঘটেছে বলে ভারতীয় মুসলমানদের কোন কোন মহল[১] মনে করে। পক্ষান্তরে অন্যরা মনে করে যে চারজনের আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটেছে । তাদের মতে সৈয়দ আহমদই হচ্ছে পরবর্তী খলিফা। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রিয় কন্যা ও তাঁর স্বামী (সৈয়দ আহমদের পূর্বপুরুষ) স্বপ্নে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের পুত্র হিসেবে তাকে অভিবাদন জানিয়েছে, সুগন্ধি আতর সহযোগে তাকে গোসল করিয়েছে এবং রাজকীয় লেবাসে তাকে ভূষিত করেছে,—এরপর জনসাধারণ এমনকি সৈয়দ আহমদ নিজেই বা আর কি প্রমাণ দাবি করতে পারে ? তার দুইজন সুবিজ্ঞ শিষ্যের যুক্তিতর্কের কাছে নিজেই হার মেনেছিল সৈয়দ আহমদ, এবং অবশেষে নিজের খেতাব সম্পর্কে তার এমন দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল যে, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সে সার্বভৌমত্বের যাবতীয় কর্তব্যভার গ্রহণ করেছিল, দশমিক কর আরোপ করেছিল, ধর্মীয় নেতৃত্বের উত্তরাধিকার বজায় রাখার জন্য খলিফা নিয়োগ করেছিল এবং পেশোয়ারে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে বিশ্বাসীদের ইমাম বলে ঘোষণা করেছিল।

অবশ্য মক্কায় হজ্জ করতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ তার মতবাদ সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছিল বলে মনে হয় না। ধর্মীয় সংস্কার সাধন সম্পর্কিত তার চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবভিত্তিক। শ্রোতাদের সে বলত যে, আল্লাহ্‌র ক্রোধ থেকে রেহাই পেতে হলে অবশ্যই সুন্দর জীবনযাপন করতে হবে। তার অন্যতম শিষ্য তার বক্তব্যসমূহ সংকলিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছে।[২] তার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা এই গ্রন্থটি কোরআনের মত অনুসরণ করে। লেখক এই গ্রন্থে তার গুরুর সংক্ষিপ্ত বাণীসমূহকে নিজের ভক্তি-মিশ্রণে সম্প্রসারিত করে লিখেছে বলে মনে করা হয়। এই সম্প্রসারণ সত্ত্বেও সৈয়দ আহমদের অনুশাসনসমূহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারিক নৈতিকতা

---

[১] সুন্নী সম্প্রদায়। শিয়া সম্প্রদায়ের মতে ১১ জনের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে গিয়েছে এবং দ্বাদশজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে কোন স্থানে লুকায়িত আছে। ভারতীয় মুসলমানদের শতকরা ৯৫ জনই সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত।

[২] মুহম্মদ ইসমাইল প্রণীত 'সিরাতুল মুস্তাকিম'।

ভিত্তিক বলে প্রতীয়মান হয়। যে সকল সনদবলে সে পাটনায় তার খলিফাদিগকে নিয়োগ করেছিল, সেগুলোতেও দৈনন্দিন জীবন-ধর্মের মূলভাব সুস্পষ্ট। তার মতবাদের একমাত্র বিষয় ছিল এক ঈশ্বরের উপাসনা, এবং মানুষের প্রবর্তিত আচার ও আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করে সরাসরি উপাসনা।

'করুণাময় আল্লাহর নামে। যারা আল্লাহর পথ অনুসন্ধান করে, সাধারণভাবে তাদের অবগতির জন্য এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত যারা সৈয়দ আহমদের বন্ধু, বিশেষভাবে তাদের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, হস্তধারণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পীরের মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পথ নিশ্চিত করা, এবং সেটা নির্ভর করে রাসূলের বিধান পালন করার উপর।'

'রাসূলুল্লাহর বিধান দুইটি ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ; এক, আল্লাহের সৃষ্ট কোন জীবকে আল্লাহর মর্যাদা দান[1] না করা ; দ্বিতীয়, রাসূলুল্লাহ ও তার উত্তরাধিকারী বা খলিফাগণের আমলে উদ্ভাবিত হয়নি, এমন কোন রীতি বা প্রথার উদ্ভব[2] না করা। প্রথমোক্ত বিধানের অর্থ হচ্ছে—ফেরেস্তা, আত্মা, আধ্যাত্মিক নেতা, শিষ্য, ওস্তাদ, ছাত্র, ধর্মপ্রচারক বা দরবেশ মানুষের বিপদ অবসান করতে পারে একথা অবিশ্বাস করা। সুতরাং কোন আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য উপরোক্ত জীবদের উপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কোন কল্যাণ সাধন করা বা অকল্যাণ নিবারণ করার ক্ষমতা তাদের আছে, একথা অস্বীকার করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে যেকোন মানুষের মত ওরাও সমান অসহায় ও অজ্ঞ। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কখনো কোন ধর্মপ্রচারক, দরবেশ, পীর বা ফেরেস্তার কাছে প্রার্থনা করা হবে না, তাদের কেবলমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দা বলে বিবেচনা করতে হবে। জীবনের দুর্ঘটনাসমূহ তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং আল্লাহর পবিত্র জ্ঞান সম্পর্কে তারা অবহিত আছে, একথা বিশ্বাস করাই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি চরম অবিশ্বাস।'[3]

দ্বিতীয় বিধান সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, রাসূলের আমলে দৈনন্দিন জীবনের যেসব ভক্তিমূলক ও অন্যান্য প্রাত্যহিক আচার-আচরণ প্রচলিত ছিল নিষ্ঠার সঙ্গে সেইগুলো পালন করাই হচ্ছে যথার্থ ও নির্ভেজাল ধর্মকর্ম। বিবাহ উৎসব, শোক-অনুষ্ঠান, কবর সজ্জিত করা, কবরের উপর বিশাল সৌধাদি

---

[1] শিরক্।

[2] বিদ্ আৎ।

[3] কুফর্।

নির্মাণ করা এবং মৃতব্যক্তির স্মৃতি বার্ষিকী পালন উপলক্ষে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করা, রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করা ইত্যাদি বর্জন করতে হবে এবং এসব ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে।[১]

ধর্মীয় নেতার ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা সফরের পর অনাড়ম্বর নিষ্ঠাবান জীবনযাপনের নীতিমালা নিরূপিত ও প্রচারিত হয়। সফরকালে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, পবিত্র নগরীতে মরুভূমির জনৈক বেদুঈনের প্রচেষ্টায় ব্যাপক সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে। তার নিজের চিন্তাধারার সঙ্গে এ সংস্কার নীতির মিল ছিল। এ সংস্কারের প্রবর্তক পশ্চিম এশিয়ায় এক বিশাল ধর্মীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভারতে সৈয়দ আহমদ ঠিক একই রকম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করত। সুতরাং তার ধর্মমত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে আরবে ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের উত্থান ও অগ্রগতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রায় দেড়শ বছর পূর্বেকার কথা। ক্ষুদ্র রাজ্য নেজদ্ অধিপতির পুত্র আবদুল ওয়াহাব[২] নামে এক আরব তরুণ গিয়েছিল হজ্জ করতে। সেখানে তার সমসাময়িক হজ্জযাত্রীদের চরিত্রহীনতা এবং পবিত্র নগরীসমূহে প্রচলিত অসংখ্য অনাচার দর্শনে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিল আবদুল ওয়াহাব। দামেস্ক নগরের ইসলাম ধর্মের দুর্নীতি সম্পর্কে সে দীর্ঘ তিন বছর যাবত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং তারপর সে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তুরস্কের ধর্মীয় পন্ডিতদের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ করে যে, তারা ঐতিহ্য বা সুন্নতের আতিশয্যের দ্বারা কোরআনের বাণীকে অকার্যকরী করেছে। তুর্কী জাতি তাদের পাপাচারের দরুন কাফের অপেক্ষাও অধম হয়ে পড়েছে। এর ফলে সে কনস্ট্যান্টিনোপলের রাজপুরুষদের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। নগর থেকে নগরে বিতাড়িত হতে হতে সে অবশেষে দেরাইয়াহ অধিপতি মোহাম্মদ ইবনে সউদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। মোহাম্মদ ইবনে সউদকে নিজ ধর্মমতে দীক্ষিত করে তার কৃতকার্যসমূহ সম্পর্কে তার মনে পাপবোধ জাগ্রত করে আবদুল ওয়াহাব। যথাশীঘ্র এ সকল অন্যায়ের প্রতিকার করতে সে বদ্ধপরিকর হয়। নব দীক্ষিত ইবনে সউদের সহায়তায় সে ক্ষুদ্র এক আরব লীগ গঠন করে, কনস্ট্যান্টিনোপল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা এবং অনাচারদুষ্ট ধর্মমতের বিরুদ্ধে

---

[১] ক্যালকাটা রিভিউ।

[২] নামটির অর্থ মহান দাতার দাস।

প্রতিবাদের পতাকা উত্তোলন করে। একের পর এক বিজয় লাভ করতে থাকে সে। যে বেদুঈনরা মহাম্মদ (সঃ)-কে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বলে কখনো স্বীকার করেনি অথবা কোরআনকে যারা আসমানী কেতাব বলে গ্রহণ করেনি, তারাও দলে দলে এসে এ সংস্কারক বাহিনীতে যোগদান করতে থাকে। নেজ্‌দের বৃহত্তর অংশ অধিকার করে আবদুল ওয়াহাব তথাকার আধ্যাত্মিক প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত হয় এবং তার জামাতা মোহাম্মদ ইবনে সউদ তথাকার রাজা হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করে। অধিকৃত প্রদেশসমূহে তারা গভর্নর নিযুক্ত করে এবং তাদের পদানত করে রাখে। শান্তিপূর্ণ সময় আইন-কানুন ও ধর্মবিষয়ক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য উপজাতীয় পরিষদ কর্তৃক একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং যুদ্ধকালে সমর পরিষদ গঠিত হয়।

অনতিকাল পরেই এই নতুন রাজ্য সাহসের সঙ্গে তুর্কী শক্তিকে আক্রমণ করে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগ্‌দাদের পাশা (পূর্বে প্রধান উজির বলা হত) সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনের নেতারাই তুরস্কের শাসনব্যবস্থা থেকে খলিফাগণের অকর্মণ্য বংশধরদিগকে বিতাড়িত করে নতুন এক মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করে। সংস্কার আন্দোলনকারীরা যুদ্ধে যেরূপ কৃতিত্বের মাধ্যমে জয়লাভ করেছিল, বেসামরিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রেও তার তুলনায় কোন অংশে কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেনি। তাদের শক্তির প্রধান উৎস ছিল যাযাবর আরব সম্প্রদায়। এই যাযাবরদিগকে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল তারা। নিয়মিতভাবে তারা ধর্মীয় কর আদায়ের ব্যবস্থা করেছিল। যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে জমা হত, আর বাকী চার-পঞ্চমাংশ ভাগ করে দেওয়া হত সৈন্যদের মধ্যে। কোরআনে যাকাত নামে অভিহিত ভূমি রাজস্ব কড়াকড়িভাবে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেসব জমিতে বৃষ্টি বা নদীর দ্বারা প্রাকৃতিক উপায়ে পানি সিঞ্চন হত, তার বাৎসরিক উৎপাদনের দশভাগের এক ভাগ, আর যেসব জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সিঞ্চন হত, তার ক্ষেত্রে উৎপাদনের কুড়ি ভাগের এক ভাগ ভূমি রাজস্ব আদায় করা হত। সকল রকমের ব্যবসায়ীর কাছে থেকে তাদের মূলধনের শতকরা দেড় ভাগ শুল্ক আদায় করা হত। বিদ্রোহী অথবা বিরুদ্ধাচারী নগর ও প্রদেশসমূহ থেকেও নিয়মিতভাবে মোটা পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হত। কোন নগর বা প্রদেশ প্রথম বিরুদ্ধাচরণ করলে, তার শাস্তি ছিল সাধারণ লুণ্ঠন। এই লুণ্ঠিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে জমা হত। দ্বিতীয়বারের রাজদ্রোহ বা ধর্মদ্রোহের শাস্তি হিসেবে

সংশ্লিষ্ট নগর ও তৎসংলগ্ন ভূখন্ড ওয়াহাবী নেতার সম্পত্তিতে পরিণত হত। প্রকৃতপক্ষে সংস্কার আন্দোলনকারীরা ছিল একটা যোদ্ধা সম্প্রদায়। তরবারির সাহায্যে ধর্মান্তরিত করার নীতি তারা সাহসের সঙ্গেই ঘোষণা করত। প্রতি বছর দু'তিনটি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে তারা এ নীতি বাস্তবায়িত করত এবং এটা ছিল তাদের আয়ের একটি মূল্যবান উৎস।

রক্তের অক্ষরে তারা যে নীতিমালা লিপিবদ্ধ করেছিল, সেগুলো ছিল মহান। সর্বপ্রথম তারা যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করত, সেটা হচ্ছে তুর্কীরা তাদের ইন্দ্রিয়সেবাপরায়ণতার দ্বারা পবিত্র নগরীকে কলুষিত করেছিল। বহুবিবাহেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি তারা। তীর্থে আগমনকালে তারা জঘন্যতম চরিত্রের স্ত্রীলোক সাথে নিয়ে আসত এবং এমন ধরনের কুকার্যে তারা লিপ্ত হত যে, যেগুলো ছিল কোরআনে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পবিত্র নগরীর রাজপথে প্রকাশ্যে তারা মদ ও গাঁজা সেবন করত। মক্কার পথে তুর্কী তীর্থযাত্রীদল ঘৃণ্যতম অমিতাচারী দৃশ্যের অবতারণা করত। আবদুল ওয়াহাব সর্বপ্রথম এইসব জঘন্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ক্রমান্বয়ে তার মতাবলী একটি ধর্মীয় মতবাদের রূপ ধারণ করে এবং ওয়াহাবী মতবাদ[১] নামে বিস্তার লাভ করে। ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই এখন এ মতাবলম্বী। এ মতবাদ অনুসারে মহাম্মদ (সঃ)-এর প্রবর্তিত ধর্মকে বিশুদ্ধ আস্তিকতায় পরিণত করা হয়েছিল এবং সাতটি প্রধান নীতির উপর তাকে স্থাপন করা হয়েছিল। প্রথম হচ্ছে, এক ঈশ্বরে অবিচল আস্থা ; দ্বিতীয়, মানুষ ও তার স্রষ্টার মাঝখানে কোন মধ্যস্থতাকারীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার, সাধু-দরবেশগণের প্রার্থনা, এবং এমনকি, স্বয়ং মুহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান ; তৃতীয়, মুসলমানী ধর্মগ্রন্থের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার অধিকার এবং পবিত্র গ্রন্থের সকল প্রকার যাজকীয় ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান ; চতুর্থ, মধ্য ও আধুনিক যুগের মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মে যেসব বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা ও উৎসবাদির প্রবর্তন করেছে তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান ; পঞ্চম, যে ইমামের নেতৃত্বে প্রকৃত ঈমানদারগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করবে, নিরন্তর সেই ইমামের প্রতীক্ষা ; ষষ্ঠ, সকল কাফেরের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ করা যে অবশ্য কর্তব্য তা তত্ত্বগত ও বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বদা স্বীকার করা এবং সপ্তম হচ্ছে, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য। কার্যত ওয়াহাবীরা হচ্ছে, সুন্নী সম্প্রদায়ের একটি অগ্রগামী অংশ এবং ইসলামের

---

[১] মূল আরবীতে ওয়াহাবী শব্দটির বানান হচ্ছে ওয়াহ্‌হাবী। তবে 'ওয়াহাবী' একটি ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ হিসেবে প্রচলিত হয়েছে।

শুদ্ধাচার পন্থী অংশ। বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রায় সকল মুসলমান সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।[১]

আবদুল ওয়াহাবের মৃত্যু হয় ১৭৮৭ সনে। তার বিজিত রাজ্য সে অর্পণ করে যায় একজন যোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতে। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবীরা মক্কার শেখের বিরুদ্ধে সাফল্যমন্ডিত এক অভিযান পরিচালনা করে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তারা বাগদাদের পাশাকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করে। এ যুদ্ধে বহু লোক নিহত হয় এবং ওয়াহাবীরা এশীয় তুরস্কের সর্বাপেক্ষা উর্বর প্রদেশসমূহ পদানত করে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তারা লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে আরেকবার মক্কা আক্রমণ করে এবং অবশেষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা এ পবিত্র নগরী দখল করে। পরের বছর তারা মদিনা দখল করে। ইসলামের এ দুটি প্রধান আস্তানায় সংস্কারকদের ধর্মমত মেনে নিতে যারা অস্বীকার করে, তাদের হত্যা করা হয়। মুসলমান সাধু-দরবেশগণের মাজারে তারা লুঠতরাজ করে ও সেগুলোর অবমাননা করে। এমনকি পবিত্র মসজিদও তাদের হাত থেকে রেহাই পায় না। এগার শতাব্দী যাবত ধর্মপ্রাণ প্রত্যেক মুসলমান রাজা বাদশাহ্ তাদের সাধ্যমত যেসব নজরানা পাঠিয়েছিল, বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দানের সম্পদ যা কিছু সেখানে সঞ্চিত হয়েছিল, সবই মরুভূমির এই বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়।

দস্যু বুর্বনের আক্রমণে ভ্যাটিকান বিধ্বস্ত হওয়ার এবং এঞ্জেলোয় অবস্থিত স্যান্ট নামক স্থানে যীশুর প্রতিনিধি বন্দী হওয়ার সংবাদে খ্রীস্টান জগতে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, কেবলমাত্র তারই সঙ্গে তুলনা করা যায় মুসলিম জাহানের এই আতঙ্কময় অবস্থার। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠতম উপাসনালয় যে কেবল লুণ্ঠিতই হয়েছিল তা নয়, উপরন্তু সশস্ত্র ধর্মদ্রোহীরা সেটাকে চরম-

---

১. এদের অধিকাংশই হানাফী শাখাভুক্ত সুন্নী। তবে অল্প সংখ্যক শাফি শাখাভুক্ত। হানাফীরা তাদের মহান ইমাম আবু হানিফার মতবাদ অনুসরণ করে। ইমাম আবু হানিফার জন্ম ৮০ হিজরী (৬৯৯ খ্রীঃ) এবং মৃত্যু ১১৫ হিজরী (৭৩৩ খ্রীঃ)। হানাফীরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে এবং নামাযের সময় দুই হাত নাভির উপর আড়াআড়িভাবে আবদ্ধ রাখে। তারা নামাযে দাঁড়ায় সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে, কিন্তু মাথার উপর হাত উঠায় না। 'আমিন' শব্দটি তারা নিঃশব্দে উচ্চারণ করে। ইমাম আবু আবদুল্লাহ শাফীর নামানুসারে তার অনুসারী জামাতের নাম হয়েছে শাফী। ইমাম শাফীর জন্ম ১৫০ হিঃ (৭৬৭ খ্রীঃ) এবং মৃত্যু ২০৪ হিঃ (৮১৯ খ্রীঃ)। শাফীরা নামাযের সময় হাত বাঁধে বুকের উপর। সিজ্‌দার সময় মাথার উপর হাত উঠায় এবং উচ্চস্বরে 'আমিন' উচ্চারণ করে।

ভাবে কলুষিত করেছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহর সমাধিও তারা বিকৃত করে ফেলেছিল। মুসলমানদের পারলৌকিক পরিত্রাণের অন্যতম পন্থা হজ্জ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কনস্ট্যান্টিনোপল শহরের সেন্ট সোফিয়ায় অবস্থিত মর্মর নির্মিত মসজিদ থেকে শুরু করে চীনের সীমান্তে অবস্থিত পথিপার্শ্বের পলেস্তারা দেওয়া মসজিদ পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিটি উপাসনাগৃহ ক্রন্দন রোলে পরিপূর্ণ হয়েছিল। শিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক ঘোষণা করেছিল যে, দ্বাদশ ইমামের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু গোঁড়া ঈমানদার মুসলমানরা মনে করছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে, দজ্জালের কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন, দুনিয়ায় তারই আবির্ভাব ঘটেছে এবং দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার দিন সমাগত হয়েছে।

যথারীতি রোযা-নামায সত্ত্বেও ১৮০৩ থেকে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বড় রকমের কোন হজ্জ যাত্রীদল মরুভূমি অতিক্রম করেনি ; ওয়াহাবীরা এ সময় সিরিয়া দখল করে, পারস্য উপসাগরে বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণের হুমকি দেয়। অবশেষে মিসরের মোহাম্মদ আলী পাশা সংস্কার আন্দোলন দমন করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে টমাস্ কিথ্ নামক একজন স্কটল্যান্ডদেশীয় সেনাপতি পাশার পুত্রের নেতৃত্বে অতর্কিতে মদিনার উপর প্রচন্ড আক্রমণ পরিচালনা করে মদিনা দখল করে। মক্কার পতন হয় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই বিশাল শক্তির আবির্ভাব যেমন বিস্ময়করভাবে ঘটেছিল, তেমনিভাবেই পাঁচ বছর পর মরুভূমির অপসৃয়মান বালুকা পর্বতের মত এই শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এবার ওয়াহাবীরা একটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং গৃহহীন সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তারা যে মতবাদ প্রচার করে, বিত্তশালী মুসলমানদের প্রতি তার ঘৃণা-ব্যঞ্জক। আনুষ্ঠানিক ধর্মতত্ত্ব অনুসারে ওয়াহাবীরা হচ্ছে যথার্থ একেশ্বরবাদী মুসলমান। তারা মুহাম্মদ (সঃ)-কেও আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বলে স্বীকার করে না, এবং তাঁর নামে নামায পড়তে নিষেধ করে। পরলোকগত সাধুপুরুষদের নামে দোয়া দরূদ পাঠ করতেও বারণ করে তারা। তবে ব্যবহারিক জীবনে তাদের ঐকান্তিক নৈতিকতাই তাদের শক্তির গোপন উৎস হিসেবে কাজ করে। সাহসের সঙ্গে তারা সনাতন মোহাম্মদীয় ধর্মপথে প্রত্যাবর্তন করার দাবি করে। মোহাম্মদীয় ধর্মে সহজ, সরল ও পবিত্র জীবনযাত্রা, সত্য প্রচারের জন্য কাফেরদের রক্ত এবং নিজেদের সর্ব স্বার্থের বিনিময়েও সংগ্রামের আহ্বান জানায়। তাদের দু'টি প্রধান নীতি হচ্ছে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং আত্মস্বার্থ পরিহার করা। তারা সেই সমঝোতার

নীতি অনুসরণ করে যার দ্বারা মুহাম্মদ (সঃ)-এর চরম ধর্মান্ধতাকে দক্ষতার সাথে একটি বেসামরিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে কার্যকরী করা হয়েছে এবং একইভাবে সেটাকে মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক সম্পর্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। তারা প্রত্যেক নবদীক্ষিত মুসলমানের কাছে যা দাবি করে তা হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ (ইসলাম) এবং এটাই ছিল মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাফল্যের চাবিকাঠি। কিন্তু অন্যান্য সংস্কারবাদী সম্প্রদায়ের মত তারাও এই মৌলিক নীতির উপর যত বেশি জোর দিতে থাকে ততই একক ধর্মতত্ত্ব মতবাদের দরুন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাদের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয় এবং প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রাচীন আচারানুষ্ঠানের প্রতি চরম বৈরীতার দরুন সাধারণ জনসমাজের মধ্যে তাদের মতবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। এশিয়ার অধিকাংশ স্থানে ওয়াহাবী মতবাদে দীক্ষিত প্রত্যেককে বিশ্বের অন্যান্য সকল প্রচলিত ধর্মমত থেকে নিজেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তাকে তার সর্বাধিক প্রিয় রূপকথা, তার সবচেয়ে পবিত্র অনুষ্ঠানাদি এবং পবিত্রতম বিশ্বাসের সাথে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এমনকি পিতার মাজারে প্রার্থনা করার মত অত্যন্ত সান্ত্বনাদায়ক অভ্যাসও তাকে বর্জন করতে হবে।[১]

অবশ্য, ভারতীয় ওয়াহাবীরা মুসলমানদের হৃদয়ে অবস্থিত এমন একটা নীতির কাছে আবেদন জানায় যার তীব্রতা অন্যান্য অসুবিধাগুলোকে হাল্কা করে ফেলে। মক্কায় অবস্থানকালে সৈয়দ আহমদ বেদুইনদের কাছে যেরূপ সরল ভাষায় প্রচার চালান অনুরূপ সারল্য প্রদর্শন করে সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে এ পবিত্র নগরী বেদুইনদের হামলার শিকার হয়। মুফতি প্রকাশ্যভাবে সৈয়দ আহমদের পদাবনতি ঘটান এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করেন। এ নিগ্রহের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ; কিন্তু শুধুমাত্র মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রচারক হিসেবে নয়। আবদুল ওয়াহাবের ধর্মান্ধ সাগরেদ হিসেবেই তিনি ভারতে ফিরে আসেন। তাঁর হৃদয়কন্দরে যেসব স্বপ্ন জমাট ছিল তা এখন বহিঃপ্রকাশের বিপজ্জনক পথ খুঁজে পায়। সে পথটি হচ্ছে, ভারতের প্রতিটি জেলায় অর্ধচন্দ্রের উদয় ঘটানো এবং বিধর্মী ইংরেজদের মৃতদেহের নিচে ক্রসকে প্রোথিত করা। তাঁর শিক্ষায় এতদিন যা কিছু অস্পষ্ট ছিল এখন

---

[১] এখানে এবং অন্যত্র যে প্রবন্ধটি অবলম্বন করে আমি লিখেছি সেটা ১৮৬৪ সালে ইন্ডিয়ান ডেইলী নিউজ পত্রিকার ছাপাতে দেওয়া হয়।

তা আবদুল ওয়াহাবের মত ধর্মীয় উগ্রনীতিতে স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করে। এই ধর্মীয় উগ্রতা কাজে লাগিয়ে আবদুল ওয়াহাব আরবে একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সৈয়দ আহমদ আশা করেন যে, ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতে তিনি বৃহত্তম ও অধিকতর স্থায়ী একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। পয়গম্বরের মনের ভেতরে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তা শুধু তিনি এবং আল্লাহ জানেন, কিন্তু এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তাঁর সকল বাহ্যিক আচরণে পরিবর্তন ঘটে। কেবল ধর্মান্তকরণকেই আর তিনি জীবনের একমাত্র কাজ হিসেবে গণ্য করতে পারছেন না, কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যই তিনি ওটা করছেন। বোম্বাইতে যখন তিনি প্রথম অবতরণ করেন তখন তাঁর উপদেশ ও ধর্মীয় নির্দেশ শ্রবণের জন্য জমায়েত বিপুল সংখ্যক লোক তাঁকে বেশি সময় আটকে রাখতে পারেনি। তিনি যেখানে গমন করছেন সেখানেই তিনি মক্কায় যাওয়ার আগের তুলনায় অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেন। তবে মনে হয়, এবার তিনি নির্দিষ্ট জেলাসমূহে উদ্ধত অসহিষ্ণুতার সাথে প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং দূরবর্তী সীমান্ত প্রদেশের যোদ্ধা জাতির উপরই তাঁর দৃষ্টি সারাক্ষণ নিবদ্ধ ছিল। তাঁর পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলী আগের পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে তাঁর মতবাদ ও শিক্ষা সম্পর্কে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন, যার ভিত্তির উপর তাঁর অনুসারীরা একটা আদর্শগত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, এবং সেটা এমনই একটা ব্যবস্থা যার দ্বারা তারা ভারতীয় ইতিহাসের এক অদৃষ্টপূর্ব ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানের সূচনা করে গত পঞ্চাশ বছর যাবত জনগণের মধ্যে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব জিইয়ে রেখেছে।

ভারতীয় ওয়াহাবীরা প্রথম যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় সেটা হচ্ছে, তাদের নেতার অন্তর্ধান। তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্বে মুসলমানরা সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে বিজয়ের লক্ষ্যে উপনীত হবে এই আশা তাঁর মৃত্যুর পর বিলীন হয়ে যায়। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, যুদ্ধ ও বিদ্রোহ, বিরাট সামাজিক অভ্যুত্থান, নিম্নশ্রেণীর লোকদের উচ্চস্থান অধিকার, ভূমিকম্প, মহামারী এবং দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়েই দুনিয়ার বিলুপ্তি সাধিত হবে। শেষের দিকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধর ইমাম মেহেদী মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামে আবির্ভূত হবেন। পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে জন্মগ্রহণ করে জীবনের কতক অংশ তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হবেন আরবের শাসনকর্তা এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের বিজেতা, যার আগে কনস্ট্যান্টিনোপল

পুনরায় একজন খ্রীস্টান রাজার করতলগত হবে। তারপর এ্যান্টিক্রাইস্ট আবির্ভূত হয়ে ইমামের বিরুদ্ধে প্রচন্ড সংগ্রামে লিপ্ত হবেন। সবশেষে দামেশকের পূর্বদিকের একটি শ্বেতশৃংগের উপর ঈসা আবির্ভূত হয়ে অনিষ্টকারী জাতিগুলোকে ধ্বংস করবেন এবং সমগ্র বিশ্বকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর সত্যধর্মে দীক্ষিত করবেন।

ভারতীয় ওয়াহাবীরা দাবি করেন যে, সৈয়দ আহমদই সেই মহান ইমাম এবং তিনিই ঈসার চূড়ান্ত আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। কিন্তু যে ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন সমাপ্ত হয় তাতে করে ভাল ও মন্দের মধ্যে শেষ সংঘর্ষের এই জনপ্রিয় কাহিনী সঙ্গতিহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং তারা এই জনপ্রিয় কাহিনীর উপর জোরালো আঘাত হেনে বলতে থাকে যে, প্রকৃত ইমাম মেহেদী দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার সময় আসবেন না, বরং মুহাম্মদ (সঃ)-এর মৃত্যু ও কেয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি আবির্ভূত হবেন। ইমামের পরিচয় সম্পর্কে খ্রীস্টান ইতিহাসে যেসব বিবরণ আছে তার সব নিদর্শনই তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া গেছে বলে তারা দাবি করে। বহু সংখ্যক পন্ডিত ব্যক্তিকে হাজির করে তারা প্রমাণ করতে চায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই (১৭৮৬—১৮৮৬ খ্রীঃ) ইমাম মেহেদীর আগমনের কথা। আহমদ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এমনকি ধর্মীয় বিধির পরিবর্তনকারী হিসেবে ঘৃণিত শিয়াদের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোকেও এ কাজে ব্যবহার করা হয়। সুন্নীদের তুলনায় শিয়াদের হিসেব অধিকতর নির্ভুল। শিয়াদের হিসেব অনুসারে হিজরী ১২৬০ সালে অর্থাৎ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইমামের আবির্ভূত হওয়ার কথা। মুহাম্মদ (সঃ) কি নিজেই বলে যাননি যে, "তোমরা যখন দেখবে খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাধারীদের কাফেলা আসছে তখন এগিয়ে যাবে কারণ তাদের সাথে একজন খলিফা থাকবেন যিনি আল্লাহর দূত ?" ভারতের উপর খ্রীস্টান রাজশক্তির আধিপত্য এবং আরো শত শত ঘটনা ইমামের আবির্ভাবের সময়কালকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে। এই ধারণাকে আরো বদ্ধমূল করে তোলার জন্য নানা কল্পিত ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্রয় নেয়া হয়। সেসব কল্পিত কাহিনীর উপর রচিত কবিতা আজও উত্তর-ভারতে শুনতে পাওয়া যায় এবং তারই কিয়দংশ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

'আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ্‌র শক্তি— দেখতে পাচ্ছি দুনিয়ার দুঃখ ;
বড় বড় সেনাবাহিনী লড়ছে আর লুঠ করছে সম্পদ ;
নীচ বংশের লোক যত আজেবাজে শিখে ধর্মগুরুর নামাবলী গায় দিচ্ছে।
আমি দেখতে পাচ্ছি সৎস্বভাব আর গৌরব লুপ্ত হচ্ছে ;

তুর্কী আর পার্সীদের মাঝে বিরোধ
আর যুদ্ধবিগ্রহ আমি দেখতে পাচ্ছি।
দেখতে পাচ্ছি পুণ্যবানদের অন্তর্ধানে ভাল ভাল দেশ
পাপীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হল।
এসব দেখেও আমি হইনি হতাশ, কারণ এমন এক
ব্যক্তিকে আমি দেখছি যিনি দুঃখকে করবেন পরাভূত।
আমি দেখছি ১২০০ বছর[১] অন্তে বিস্ময়কর ঘটনারাজি ঘটতে শুরু করবে;
আমি দেখতে পাচ্ছি দুনিয়ার রাজারা সব একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়ছে,
আমি দেখতে পাচ্ছি হিন্দুদের অধঃপতন ; দেখতে পাচ্ছি তুর্কীদের উপর নির্যাতন ;
তারপরেই আবির্ভূত হবেন ইমাম, বিশ্বকে করবেন তিনি শাসন ;
'আহমদ'[২] শব্দ আমি দেখছি এবং পড়ছি ; আর তিনিই যে সেই বাঞ্ছিত
শাসক তাও আমি বুঝতে পারছি।"

আরেকটি পছন্দ মাফিক ভবিষ্যদ্বাণী

নিয়ামত উল্লাহ্‌র গান[৩]

(তাঁর মাজারকে পবিত্র মনে করা হোক)

"এ সত্য আমি বলে যাচ্ছি যে একজন রাজা আসবেন,
তাঁর নাম তৈমুর, তিনি শাসন করবেন ত্রিশ বছর।"

(এর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের একটা তালিকা দেওয়া হয় এবং শাহজাহানের শেষ বংশধর পর্যন্ত তালিকাটি দীর্ঘ)

তারপর আর একজন রাজা আসবেন।
নাদির ভারত অভিযান করবেন, এবং
তাঁর তরবারি দিল্লীকে ক্ষত বিক্ষত করবে।
তারপর শুরু হবে আহমদ শাহ্-এর অভিযান, এবং

---

[১] মূল কবিতায় ৭৫০ বছর লেখা হয়, কিন্তু আহমদের মৃত্যুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য পরে তা পরিবর্তন করা হয়। ক্যালকাটা রিভিউ, গ খন্ড, পৃঃ ১০০ থেকে এই কবিতাগুলো আমি সংগ্রহ করেছি।

[২] মূল কবিতায় 'মহম্মদ' শব্দ লিখিত ছিল।

[৩] গীতিকাব্যটি থেকে মাত্র কয়েকটা পংক্তি আমি উল্লেখ করলাম। ১৮৬৫ সালের ওয়াহাবী মামলার সরকারী রেকর্ড থেকে গীতিকাব্যটি পাওয়া গেছে।

তিনি আগের রাজবংশ ধ্বংস করবেন।
এই রাজার মৃত্যুর পর পূর্ববর্তী রাজবংশ
আবার ক্ষমতা পাবেন।
এই সময় শিখরা প্রবল হয়ে উঠবে, এবং তারা
নানা নিষ্ঠুর কাজে মেতে উঠবে।
শিখদের এ অনাচার চল্লিশ বছর চলবে ;
তারপর হিন্দুস্থান চলে যাবে ন্যাজারেথ নগরবাসীদের দখলে
আর তারা শাসন করবে একশ' বছর।
তাদের শাসনে বিশ্ব অত্যন্ত নির্যাতিত হবে ;
এবং তাদের ধ্বংসের জন্য পাশ্চাত্যে আরেক রাজা আসবেন।
ন্যাজারেথ শাসকের বিরুদ্ধে এই রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করবেন ;
আর এ যুদ্ধে অগুনতি লোক মারা যাবে।
এক বিরাট ধর্মযুদ্ধে পাশ্চাত্যের রাজা অস্ত্রবলে জয়ী হবেন
এবং যীশুর অনুসারীরা হবেন পরাভূত।
ইসলাম জারি থাকবে চল্লিশ বছর ;
তারপর ইস্পাহান থেকে উদ্ভূত হবে
এক অবিশ্বাসী উপজাতি বংশ।
এই সব উৎপীড়কদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে
ধরায় আবির্ভূত হবেন ঈসা। এবং
আকাংখিত মেহেদী আসবেন। আর
এ সবই ঘটবে বিশ্বের শেষ সময়।
এই কবিতার রচনাকাল ৫৭০[১] হিজরীতে।
পাশ্চাত্যের রাজার আবির্ভাব হবে ১২৭০[২] হিজরীতে;
আল্লাহর রহস্য সব নিয়ামতউল্লাহ জানতো ;
তার এ ভবিষ্যৎদ্বাণী লোকে বাস্তব প্রত্যক্ষ করবে।"

ভারতীয় ওয়াহাবীরা তাদের নেতার ঐশ্বরিক মিশন প্রতিষ্ঠিত করার পর ছোটখাটো প্রশ্ন থেকে সরাসরি ধর্মযুদ্ধের মতবাদের প্রশ্নে সরে যায়। তাদের সকল প্রচার-পুস্তিকায় ধর্মযুদ্ধকে খাঁটি মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে দেখানো হয়। তাদের প্রথম দিকের পুস্তকে এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধানের

---

১. ১১৭৪-১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।
২. ১৮৫৩-১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ।

নিম্নরূপ বর্ণনা দেওয়া হয় ঃ "মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ। বৃষ্টি যেমন মানুষ, পশু ও গাছপালার জন্য উপকারী, তেমনি কাফেরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মানুষও উপকৃত হয়। এই উপকার দুই প্রকারের ঃ সাধারণ— এতে সব মানুষ, এমনকি পৌত্তলিক ও বিধর্মীদের এবং জন্তু-জানোয়ার ও লতাগুল্মকে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ—এতে কেবল বিশেষ শ্রেণীর লোকে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। সাধারণ সুবিধার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর রহমত অর্থাৎ মৌসুমী বৃষ্টি ; জনসাধারণ দুর্যোগ দুর্বিপাক থেকে মুক্তি পাবে এবং তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়বে বিচারকরা ন্যায়বিচার করবেন; মামলাকারীরা বিবেকের দ্বারা চালিত হবে ; ধনীদের উদারতা বৃদ্ধি পাবে। —মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্ম যখন সবাই মেনে নেবে, সারা দুনিয়ায় যখন মুসলমানী শাসন জারি হবে এবং মুসলমান রাজার শাসনে ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে, কেবল তখনই আল্লাহর রহমতস্বরূপ উপরোক্ত সুযোগ-সুবিধা মানুষ লাভ করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহর রহমতের প্রেক্ষিতে তুরস্ক অথবা তুর্কীস্তানের তুলনায় এদেশের (ভারত) অবস্থাটা একবার খতিয়ে দেখ। বর্তমানে, ১২৩৩ হিজরীতে (১৮১৮ খ্রীঃ) ভারতের অবস্থাটা ঠিক কোন পর্যায়ে এসেছে, তাও একবার পরখ করে দেখ। এর বৃহত্তর অংশ শত্রু দেশে (দারুল-হার্ব) পরিণত হয়েছে ; অথচ দুই বা তিনশ' বছর আগে ভারতের অবস্থা অন্য রকম ছিল। ফলে সেই সময়ের তুলনায় আল্লাহর রহমত এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বর্তমানে নিদারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে।"

তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় সঙ্গীতে একই ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আমাদের সীমান্তে অবস্থিত বিদ্রোহী প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় এই সঙ্গীতের তালে তালে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারতের কেন্দ্রস্থল থেকে নতুন সংগৃহীত যেসব বিদ্রোহীরা বৃটিশদের নির্মিত রাজ-পথ দিয়ে সীমান্ত শিবিরের দিকে যাচ্ছে তাদেরও মুখে মুখে ধ্বনিত হচ্ছে এই সঙ্গীত ঃ

"প্রথমে, আমি আল্লাহর মহত্ত্ব কীর্তন করছি
যাঁর প্রশংসার কোন সীমা নেই ;
তারপর আল্লাহর নবীর গুণকীর্তন করে আমি
ধর্মযুদ্ধের উপর এই গানটা লিখছি ঃ
ধর্মের জন্যই ধর্মযুদ্ধ চালাতে হবে এবং সেখানে

ক্ষমতার লালসা থাকবে না।
পবিত্র ধর্মগ্রন্থে এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে
তার কিছুটা এখানে উল্লেখ করছি।
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সকল মুসলমানের
জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।
অন্য সব কাজের আগে এই কাজে শরিক হও।
যে কেউ এ কাজে ঈমানের সাথে এক পয়সা দান করবে
সে তার সাত শ' গুণ সওয়াব পাবে।
এবং যে কেউ অর্থ সাহায্য দিয়ে নিজেই যুদ্ধে যোগ দেবে
আল্লাহ্ তাকে সাত হাজার গুণ সওয়াব দান করবেন।
আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করতে যে কেউ একজন
মোজাহিদকে সুসজ্জিত করবে
সে শহীদ পুণ্যের অধিকারী হবে ;
তার ছেলেমেয়েদের গোর-আজাব হবে না ;
রোজ হাশরের কষ্টও তাদেরকে স্পর্শ করবে না।
অতএব, কাপুরুষতা বর্জন করে ঈশ্বরিক
ঈমামের অনুসারী হও, এবং কাফেরদের
উপর ঝাঁপিয়ে পড়।
আল্লাহ্র অশেষ প্রশংসা, কারণ
হিজরী তেরশ' সনে[১] তিনি একজন মহান
ইমাম পাঠিয়েছেন।
হে বন্ধু, তোমাকে মরতে যখন হবেই, তখন আল্লাহ্র রাহে
জীবন উৎসর্গ করাই কি শ্রেয়ঃ নয় ?
হাজার হাজার লোক যুদ্ধে যোগ দিয়ে
অক্ষত দেহে ফিরে আসে।
আবার হাজার হাজার লোক ঘরে বসে
মৃত্যুবরণ করে।
দুনিয়ার স্বার্থ চিন্তায় তুমি বিভোর,
তাই আল্লাহকে ভুলে গিয়ে শুধু
স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভাল-মন্দ নিয়েই তুমি ব্যতিব্যস্ত থাক।

---

[১] ১৭৮৬— ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

কিন্তু কতদিন থাকতে পারবে
স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মাঝে ?
মৃত্যুকে এড়িয়ে চলবে কতদিন ?
আল্লাহ্‌র রাহে যদি এ দুনিয়ার মায়া ছাড়তে পার,
তবে তো অনন্তকাল ভোগ করবে বেহেশতের সুখ।
ভারতের ইসলাম জারির সংগ্রামে শরিক হও ,
যাতে এদেশে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ' ছাড়া
আর কোন নাম, ধ্বনিত না হয়।"[১]

বৃটিশদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে ওয়াহাবীদের রচিত গদ্য বা পদ্য সম্পর্কে যত সংক্ষিপ্তাকারেই সাজানো হোক না কেন, তাতেই একখণ্ডের বই হয়ে যাবে। বৃটিশ শক্তির পতন এবং ধর্মযুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কে নানা রকমের ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ বহু পুস্তকপুস্তিকা তারা রচনা করেছে। এইসব পুস্তকের শিরোনাম থেকেই বুঝা যাবে যে, সেইগুলো কতটা রাজদ্রোহমূলক। আমি নিচের[২] তেরটা বইয়ের নামোল্লেখ করছি। এর অনেকগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ ভাগ করে লেখা, যাতে করে তা গোপনে হাতে হাতে প্রচার করা সম্ভব হয়।

---

[১] 'রিসালা-জিহাদ' বা ওয়াহাবী যুদ্ধ 'সঙ্গীত'। ক্যালকাটা রিভিউ, ৭ম খণ্ড, ৩৯৬ পৃঃ দ্রঃ।

[২] (১) সিরাতুল মুস্তাকিম বা সোজাপথ। আমীরুল মুমেনীন বা বিশ্বাসীদের নেতা ইমাম সৈয়দ আহমদের বাণী থেকে সংগৃহীত। দিল্লীর মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল ফার্সী ভাষায় এ বইটি লেখেন এবং কানপুরের মৌলবী আবদুল জব্বার হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করেন। (২) কাসিদা বা কাব্যগ্রন্থ। কাফেরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে দায়িত্ব বিশ্লেষণ এবং যারা সে দায়িত্ব পালন করবে তাদের সওয়াব বা উপকারের বর্ণনা দিয়ে এ পুস্তকটি লিখেছেন কানপুরের মৌলবী করম আলী।

(৩) শির-ই ওয়াকেয়া : কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংক্রান্ত রচনা। যুদ্ধে কারা অংশ নেবে এবং কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা এতে রয়েছে। অবশ্য, এই পুস্তকটিতে বলা হয়েছে যে, কাফেররা যখন মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালাবে কেবল তখনই ধর্মযুদ্ধ করা প্রয়োজন।

(৪) মৌলবী নেয়ামতউল্লাহ রচিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাব্যগ্রন্থ। এতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, বৃটিশ শক্তি ধ্বংস হবে এবং পশ্চিম থেকে আগত একজন রাজা ইংরেজদের দাসত্ব থেকে ভারতীয় মুসলমানদের উদ্ধার করবেন।

(৫) তাওয়ারিখ কাইসার রুম অথবা নিসবাহ-উস-সারি। নতুন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল ওয়াহাবের জীবনেতিহাস। এতে তুর্কী বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ ও নির্যাতনের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

অন্যান্য পুস্তিকাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। শুধু পুস্তিকার পাঠকরাই তার বিষের শিকার হয় তা নয়, দলে দলে প্রচারকরা বাংলার জেলায় জেলায় গিয়ে জনমত বিষিয়ে তোলে এবং লোকদেরকে রাজদ্রোহমূলক কাজের দীক্ষা প্রদান করে।

বৃটিশ ভারতের শহরগুলোতে এসব বই প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে এবং এর মধ্যে সেগুলো যত বেশি উগ্র ও রাজদ্রোহমূলক সেইগুলো কেনারদিকেই লোকের বেশি ঝোঁক। কিন্তু ওয়াহাবী দলপতি বিদ্রোহের আগুন ছড়াবার জন্য চার স্তরবিশিষ্ট যে সংগঠনকে কাজে লাগাচ্ছেন, উত্তেজক বই-পুস্তক হচ্ছে তার একটা দিক মাত্র। এ ছাড়াও প্রথমত পাটনায় তাদের কেন্দ্রীয় প্রচার কেন্দ্র রয়েছে। এখান থেকে একবার বৃটিশ কর্তৃত্ব অস্বীকার করা হয় এবং পরপর অনেকগুলো ফৌজদারী মামলার মাধ্যমে এ চক্রটিকে ভেঙ্গে দেয়া সম্ভব হলেও আজও তারা সমগ্র বাংলায় বিরাট প্রভাব বিস্তার করে চলেছে । ১৮২১ সালে ইমাম পাটনায় তাঁর কতিপয় খলিফা নিয়োগ করেন এবং এভাবে তিনি অদম্য মনোবল ও অসীম সাহসী ব্যক্তিদের বেছে নিয়ে তাদের উপর

---

(৬) মৌলবী মোহাম্মদ আলী প্রণীত 'আসার মাহসার' বা রোজ কেয়ামতের আলামত। বইটি হিজরী ১২৬৫ সালে (১৮৪৯ খ্রীঃ) মুদ্রিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এতে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলা হয়েছে যে, পাঞ্জাব সীমান্তের অদূরে খাইবার পার্বত্য এলাকায় একটা যুদ্ধ হবে এবং এতে ইংরেজরা প্রথমে মুসলমানদের পরাভূত করবে এবং তারপর মুসলমানরা তাদের প্রকৃত ইমাম খুঁজে নেবে। তারপর চারদিনের এক যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবে এবং সরকারের নাম নিশানা বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর ইমাম মেহদী আবির্ভূত হবেন এবং ভারতের শাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারকারী মুসলমানরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য দলে দলে মক্কায় ছুটে যাবে। এই ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটবে রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের একত্র অদৃশ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে।

(৭) তাকিয়াতুল ইমান অথবা বিশ্বাস দৃঢ়ীকরণ। দিল্লীর মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল এই বইটির রচয়িতা।

(৮) একই লেখকের তাজকিরুল এখওয়াই, অথবা ভ্রাতৃত্বমূলক আলাপ-আলোচনা।

(৯) কানপুরের মৌলবী করম আলী প্রণীত নিসহাত-উল-মুসলেমীন বা মুসলমানদেব প্রতি উপদেশ।

(১০) আওলাদ হোসেন প্রণীত হেদায়েত উল-মোমেনীন বা বিশ্বাসীদের প্রতি উপদেশ।

(১১) তানবির উল -আয়নাইন বা দৃষ্টি পরিস্কন্নকরণ : আরবী গ্রন্থ।

(১২) তাম্বি-উল-গাফেলী বা কর্তব্যে অনীহার বিরুদ্ধে তিরস্কার ; উর্দু গ্রন্থ।

(১৩) চিহিল-হাদিস অথবা ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে মুহাম্মদ (সঃ)-এর চল্লিশটি উপদেশবাণী।

সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে তাদের উদ্দেশ্য যখন প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে তখনও তারা অদম্য মনোবলের সাথে ভস্মস্তূপের মধ্য থেকে বার বার ধর্মযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ বের করে আনতে সক্ষম হয়েছেন। মিশনারীদের মত অক্লান্ত, নিজের সম্পর্কে নির্লিপ্ত, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, ইংরেজ বিধর্মীদের বিতাড়নের চরম লক্ষ্যে অবিচল, অর্থ ও লোক সংগ্রহে সক্ষম একটি সুষ্ঠু সংগঠন গড়ে তোলার কাজে সুদক্ষ পাটনার খলিফারা সমগ্র ওয়াহাবী জামাতের কাছে আদর্শ-দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁরা যে শিক্ষা পেয়েছেন তার বেশির ভাগই ত্রুটিমুক্ত। এবং এ শিক্ষার বলে বলীয়ান হয়ে স্বদেশের হাজার হাজার লোককে তাঁরা পবিত্র জীবনযাপনের এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার দীক্ষায় দীক্ষিত করতে পেরেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে একটা বিরাট সম্প্রদায়কে দীর্ঘদিন একতাবদ্ধ করে রাখা যায় না। পুনরুজ্জীবনের ধর্মীয় মতবাদে শীঘ্রই চিড় ধরতে শুরু করে। এমনকি প্রথম দিকের নেতাদের আমলেও আন্দোলনে ভাটা পড়ার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্যে খলিফাদের ক্রমাগত কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্বেষকে কাজে লাগাতে হয় ।

পরিস্থিতি বাস্তবতা পাটনার নেতাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য তাদের প্রচারের ধরনও কিছুটা বদলে নেন। জাগ্রত বিবেকের বিভীষিকার উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে তারা এখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের চিরাচরিত বিদ্বেষের উপর নির্ভর করাকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। সুতরাং মুসলমানদের মহৎ চিত্তবৃত্তির পরিবর্তে তাদের ধর্মান্ধতাকে কাজে লাগাবার দিকেই তারা ঝুঁকে পড়েন। সময় যত এগিয়ে যেতে থাকে ততই তারা রাজদ্রোহমূলক প্রচারণার তীব্রতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। পাটনার প্রচার কেন্দ্রকে তারা বিদ্রোহী আদান-প্রদানের ঘাঁটিতে পরিণত করেন। সশস্ত্র এলাকাটাকে দেয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় এবং বহির্বাটিসহ অভ্যন্তর-ভাগে অনেকগুলো কামরা সংযুক্ত করা হয় যার এক কক্ষের সাথে অন্য কক্ষের সংযোগ হিসেবে একটা করে ছোট দরজা রাখা হয়। এছাড়া প্রাচীরাভ্যন্তরে গোপন আদালতও বসানো হয়। প্রথম দিকের খলিফারা অস্ত্রের সাহায্যে ম্যাজিস্ট্রেটের গ্রেফতারী পরোয়ানার মোকাবিলা করার হুমকি দেন, কিন্তু পরবর্তীরা অনেকগুলো ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ এবং সংকীর্ণ বহির্গমন পথকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে বেছে নেন। সরকার যখন বিদ্রোহীদের এই আড্ডাখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন তখন অট্টালিকাটির

পরিকল্পনার নকশা সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়—ঠিক যেন একটা সুরক্ষিত নগরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাওয়া হচ্ছে। জেলার প্রচারকরা উক্ত শিবিরে দলে দলে ধর্মান্ধ লোকদের পাঠাতে থাকে। পাটনার নেতাদের শিক্ষা ও বক্তৃতার জোরে এদের উৎসাহের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার পর এদের অধিকাংশকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে সীমান্ত শিবিরে পাঠানো হতে থাকে। অধিকতর প্রতিশ্রুতিশীল যুবকদের আরো দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা করে পাটনায় রেখে দেয়া হয় ; এবং রাজদ্রোহের বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের পর তাদেরকে নিজ নিজ প্রদেশে প্রচার কার্যে পাঠানো হয়।

পাটনার খলিফাদের যা কিছু উত্তম গুণাবলী ছিল তার যথার্থ চিত্র তুলে ধরতে আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম। এক প্রশংসনীয় নৈতিক চরিত্র গঠন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করে ক্রমান্বয়ে তাঁরা তাঁদের শিক্ষার আধ্যাত্মিক দিকগুলো বর্জন করেন এবং দ্রুত বিলীয়মান উদ্দেশ্যকে সঞ্জীবিত করার উপায় হিসেবে মানব মনে জঘন্য প্রবণতার উপর আবেদন সৃষ্টি করতে থাকেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রচারকরা কি ধরনের প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করে তার কিছু বিবরণ আমি পরে দেব। তবে প্রচারকরা কি জাতীয় প্রশিক্ষণ লাভ করেন তার কিছু নমুনা এখানে পেশ করছি। প্রচারকরা নিরবচ্ছিন্ন গুরুত্বের সাথে বলতে থাকেন যে, ভারতীয় মুসলমানরা যদি দোজখের হাত থেকে রেহাই পেতে চায় তবে তাদের সামনে একটিমাত্র পথই খোলা আছে—কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অথবা বিধর্মী শাসিত দেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়া।[১] কোন সত্যিকার মুসলমান আত্মার অপমৃত্যু না ঘটিয়ে আমাদের সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে না। "সবাই জেনে রাখুক, যারা অন্যকে ধর্মযুদ্ধ থেকে বিরত করবে অথবা দেশত্যাগ করে পালাবে তারা মুনাফেক। যে দেশে অমুসলমানরা শাসন চালায় সেখানে মোহাম্মদী ধর্মের বিধি-বিধান কার্যকরী হতে পারে না। সেখানে সকল মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো। যুদ্ধে অংশগ্রহণের সক্ষমতা যাদের নেই তাদের উচিত দেশত্যাগ করে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে চলে যাওয়া। বর্তমান সময়ে ভারতের মুসলমানদের পক্ষে দেশত্যাগ করে যাওয়া একটা গুরুতর কর্তব্য। যে তা করতে অস্বীকার করবে সে রিপুর দাস ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ যদি হিজরত করে আবার ফিরে

---

[১] জিহাদ অথবা হিজরত।

আসে তবে জেনে রাখা উচিত যে, তার অতীতের সৎকাজ কোন কাজে আসবে না। তার মৃত্যু যদি ভারতে হয় তবে সে তো নাজাত পাবে না।

"ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য ক্রন্দন করা উচিত, কারণ বিধর্মীদের শাসনে বাস করার জন্য আল্লাহর রাসূল আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আল্লাহর রাসূলই যখন আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন তখন আশ্রয়ের জন্য আমরা আর কার দিকে তাকাব ? আল্লাহ্ যাদেরকে সঙ্গতি দিয়েছেন তাদের অবিলম্বে দেশত্যাগ করা উচিত, কারণ এখানে আগুন জ্বলে উঠছে। সত্য কথা বললে আমাদের ফাঁসিতে লটকানো হবে, আর মুখ বুঝে থাকলে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষুণ্ন হবে।"[১]

রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য এবং পাটনার কেন্দ্রীয় প্রচার কেন্দ্র ছাড়াও সকল জেলার পল্লী এলাকায় মত প্রচারের জন্য ওয়াহাবীদের একটি স্থায়ী সংগঠন সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। স্থানীয় প্রচারকরা কখনও কখনও নিজেদেরকে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ হিসেবে প্রমাণিত করেছে, কিন্তু তাদের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন ব্যতিরেকে তাদের সম্পর্কে কিছু বলা আমি সঙ্গত মনে করতে পারছি না। "তাদের অধিকাংশই অত্যুৎসাহী যুবক হিসেবে জীবন শুরু করেছে; অনেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা অটুট রেখেছে। পাটনার নেতাদের কাছ থেকে লব্ধ প্রশিক্ষণের গুণেই তাদের এই অদম্য ধর্মপ্রীতির সৃষ্টি হয়েছে। শহরের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে জীবনযাপনে অভ্যস্ত সভ্য মানুষের পক্ষে উন্মুক্ত পল্লী অঞ্চলে কষ্টদায়ক জীবনের অভিযাত্রায় নিয়োজিত ওয়াহাবী প্রচারকদের কঠোর ব্রত সম্যক উপলব্ধি করা কদাচিত সম্ভব। আমরা সবাই মনে করি যে, নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের মাধ্যমেই আত্মার পবিত্রতা অর্জিত হয়, এবং সম্ভবত খালি পায়ে বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বত অতিক্রমকারী তীর্থযাত্রী গৃহাভ্যন্তরে কর্মব্যস্ত মানুষের চেয়ে নিজেকে অনেক বেশি পবিত্র ও বিশুদ্ধ আত্মার বলে মনে করতে পারে।" আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, ওয়াহাবী প্রচারকরা নিশ্চিতভাবেই স্বজাতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক আধ্যাত্মিক গুণাবলীর অধিকার এবং ন্যূনতম স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করেছেন। ইংরেজরা বিশ্বাস করে আনন্দিত বোধ করে যে, বর্তমানের তুলনায় তাদের পূর্বপুরুষরা মেরী ইংলণ্ডের উন্মুক্ত

---

[১] ১৮৬৭ সালে দিল্লীতে মুদ্রিত 'জায়া তাফাসের' ক্যালকাটা। রিভিউ, ৭ম খণ্ড, ৩৯১ পৃঃ। ৩৯৩ পৃষ্ঠার মর্ম অবলম্বনে প্রথম অনুচ্ছেদটি রচিত হয়েছে।

পরিবেশে অনেক বেশি জীবনযাপন করেছে ; এবং বর্তমান যুগের জীবন যুদ্ধে ব্যাপৃত ইংরেজ কেবলমাত্র ছেলেবেলাকার স্মৃতি রোমন্থন করে উপলব্ধি করতে পারে যে, বিরাট খ্রীস্টান রূপক কাহিনীর তীর্থযাত্রীরা কিভাবে দলে দলে ধ্বংসনগরী থেকে বহির্গত হয়ে বন-উপবন ও গিরিপথ লংঘন করে পবিত্র নগরীতে অভিযাত্রা করেছিল।

পরমাত্মার সন্ধানে নিয়োজিত সাধকের বনাঞ্চলে বসবাসের চরম অভিব্যক্তি দেখা গেছে প্রাচীন ভারতে। শীতপ্রধান দেশের মানুষের গৃহাভ্যন্তরে জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন, এদেশের সুসম প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনযাপনকারী মানুষের জন্য তার প্রয়োজন করে না। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রমতে উচ্চকুলশীল ব্যক্তিরা সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনের দায়িত্ব শেষ করার পর পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বনবাসে গমন করবে। তাদের প্রতিটি জনপ্রিয় প্রাচীন কাহিনী সেই সব দৃশ্য মানসপটে অঙ্কিত করে যেখানে লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন বনাঞ্চলে স্রোতস্বিনী নদীতীরে অবস্থিত পর্ণকুটিরে বাস করছে এক বনবাসী, আর এ সব কাহিনীর শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় মনোরম বনানী-পরিবৃত পশুপালনরতা কুমারী শকুন্তলার জীবন কাহিনীতে। নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি ভারতের এই চিরায়ত আকাংখার প্রকাশ ওয়াহাবীদের জীবনেও ঘটেছে এবং এই ধারাকে তাঁরা দক্ষতার সাথে নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এমনকি কৃতকর্মের জন্য আইনের খড়্গের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কিংবা উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থতাজনিত হতাশার কারণ তারা আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা লাভের উপায় হিসেবে হয় কোন শহরের নির্জন কক্ষে আশ্রয় নিয়েছে অথবা বনাঞ্চলে কিংবা পার্বত্য এলাকায় নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকের পথ বেছে নিয়েছে। পথ পরিক্রমকারী নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের ওয়াহাবী গ্রামের সরল বাসিন্দাদের সবিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। বছরের অধিকাংশ সময় তারা কোন মানব গৃহের শরণাপন্ন হয় না। দূরবর্তী প্রদেশ থেকে আগত ওয়াহাবী পরিব্রাজক কদাচিৎ দু'একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী ছাড়া নিঃসঙ্গভাবে পথ অতিক্রম করে চলে যায়। ব্যবহারিক জীবনের প্রতি অনীহা এবং বাহ্যিক আড়ম্বরহীনতা তাকে সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির ভিন্ন মানুষে পরিণত করেছে। সুতরাং গ্রামবাসীরা স্বাভাবিক কারণেই তার চার পাশে জড়ো হয় এবং তার সান্নিধ্য লাভের পর তারা খালের পানি নিয়ে বিরোধ কিংবা সীমানা নিয়ে আত্মকলহের কথা ভুলে যায়। ওয়াহাবী প্রচারক সরাসরি তাদেরকে

রাজদ্রোহের মন্ত্র শুনাবে না, কিন্তু এমন মতবাদের কথা শুনাবে যাতে করে আমলকারীরা রাজদ্রোহের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। তাদের প্রচারিত মতবাদ, বেকনের চমৎকার উপমা উদ্ধৃত করে বলা যায়, মানুষকে দয়া-মায়া বা প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে না ; মানুষকে শান্তির পায়রার পরিবর্তে হিংস্র শকুনী ও বাজপাখিতে পরিণত করে। অবশ্য তাদের কেউ কেউ এ জাতীয় বিষাক্ত প্রচারণা থেকে বিরত রয়েছে। ১৮৭০ সালে বাংলার ধর্মান্ধ পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলো সফরের সময় আমি অনুরূপ এক ব্যক্তির কথা জানতে পারি এবং সেই অভিজ্ঞতার পর থেকে কোন ওয়াহাবীকে রাজদ্রোহী হিসেবে বর্ণনা করিতে আমার মন ব্যথিত হয়। একজন ওয়াহাবী প্রচারক একটি প্রত্যন্ত পল্লীতে প্রবেশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার গ্রামবাসী তার কাছে জমায়েত হয়। পার্শ্ববর্তী হিন্দু অধিবাসীরা এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দূরবর্তী জেলা সদর কার্যালয়ে ঘটনার খবর দিয়ে সাহায্য চেয়ে পাঠায়। কিন্তু ওয়াহাবী প্রচারকটি তাঁর মুসলিম শ্রোতাদের দুর্নীতিদুষ্ট জীবনযাপন এবং শিকারী কার্যকলাপের নিন্দা করে ধর্মযুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সরাসরি অস্বীকার করেন। গ্রামবাসীরা তার কাছ থেকে শুধুমাত্র নৈতিক উপদেশ শুনে খুশী হতে পারেনি এবং হতাশ মনে যে যার ঘরে ফিরে যায়। জেলা সদরে নালিশ করার জন্য যে হিন্দুটি গিয়েছিল ইতিমধ্যে সে ফিরে এসে দেখতে পারে যে, তথাকথিত রাজদ্রোহের গুরুকে তার স্বধর্মীয়রা ত্যাগ করে চলে গেছে এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের প্রদত্ত চাল ও লাকড়ীর উপর নির্ভর করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর নেই।

সাধারণত বলা যায় যে, ওয়াহাবী প্রচারকরা যেসব জেলা অতিক্রম করে যাতায়াত করে থাকে সেখানকার স্থানীয় বৃটিশ অফিসারদের কাছ থেকে তাদের ভীত হওয়ার মত বিশেষ কারণ নেই; এবং এটাও ঠিক যে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের সম্মুখবর্তী ছায়াঘেরা প্রাঙ্গণই হচ্ছে তাদের প্রচারকার্য চালাবার প্রিয় ময়দান। প্রথম যে প্রচারকটির সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে, তিনি তো কমিশনারের সার্কিট হাউসের সম্মুখবর্তী রাস্তায় শিবির গড়েছিলেন। একটা পিপুল গাছের নিচে একদল মুসলমানের সাথে এই বৃদ্ধ প্রচারক কথা বলছিলেন। তার কাছাকাছি ছিল একটি খর্বাকৃতির রুগ্ন ঘোড়া, যার কৃশ গ্রীবার উপর মস্ত একটা মাথা, এবং সে তার একগুচ্ছ লেজ নেড়ে গায়ের মাছি তাড়াচ্ছিল। দুর্দশাগ্রস্ত ঘোড়াটির চারটি পা ঘাসের তৈরি দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং পথচারীদের দিকে হতাশ দৃষ্টি মেলে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল। গৌরবর্ণের বৃদ্ধ প্রচারকটির লম্বা সাধা দাড়ি ছিল। তিনি

ফিসফিস করে কথা বলছিলেন, কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গী প্রমাণ করে যে, উত্তর ভারত থেকেই তিনি এসেছেন। দেখে বুঝা গেল যে, তিনি আন্তরিক উদ্যমের সাথে কথা বলছেন, কিন্তু তাঁর আট কি দশটি শ্রোতা নির্বোধ দৃষ্টি মেলে তাঁর কথা শুনছিল এবং কথা শেষ হওয়ার পর তারা ঠিক ইংলণ্ডের কোন ধর্মানুষ্ঠানে যোগদানকারীদের মত স্বাধীনভাবে রাজপথ অতিক্রম করে চলে যায়। সেটা ছিল মে মাস এবং বৃদ্ধ প্রচারক আসন্ন উৎসবের ত্রুটি সম্পর্কে তীব্র ভাষায় নিন্দা করছিলেন। কারো মনে আঘাত লাগতে পারে সে দিকে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে তিনি তাঁর শ্রোতাদের বলেন যে, তারা তো পুরানো মনের উপর নতুন পোশাক পরিধান করবে কোরআনের সহজ-সরল সত্যবাণী হৃদয়ঙ্গম না করা পর্যন্ত তারাতো বাঙ্গালী কাফেরদের মতই ঢোলকরতাল বাজিয়ে উৎসব করবে ; এবং মহররমের সকল উৎসব, তার নকল যুদ্ধ, উৎকট মাতম ধ্বনি, আদিম মাতামাতি— এ সবই তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়।

পশ্চিম বাংলার নির্জন গ্রামের মুসলমানরা এমন মাটিতে বাস করে যা নাকি কোন সংস্কারকের বীজ বপনের জন্য মোটেই উর্বর নয় ; এবং দেখা গেল, বৃদ্ধের কথা শুনে উঠে যাওয়ার পর শ্রোতারা তাঁর সাথে একমত হতে পারেনি, যদিও তাদের নিজেদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা ছিল। একজন মন্তব্য করল ঃ "এ লোকটা চায় না যে, আমরা আমাদের বাপের কবরে বাতি জ্বালাই।" আর একজনের মন্তব্য ঃ "আমাদের মেয়েদের বিবাহানুষ্ঠানে বাদ্য-বাজনা এবং মহিলাদের নাচ-গান তিনি বন্ধ করতে বলেন। তৃতীয় ব্যক্তির মন্তব্যটা কিঞ্চিৎ অনুকূল এ সত্ত্বেও কোরআনের ৭৭ হাজার ৬ শ ৩৯টি শব্দ তাঁর মুখস্থ। তিনিই ঠিকই বলেছেন যে, "কোরআন আমাদেরকে শুধু আল্লাহর উপাসনার শিক্ষাই দিয়েছে। সত্যি তিনি একজন আইনের ডাক্তার।" তৃতীয় ব্যক্তির মত খণ্ডন করেন যিনি তিনি একজন মোল্লা বা মসজিদের মোয়াজ্জিন। প্রামাণ্যতার সাথে স্বীয় বক্তব্য পেশ করে তিনি আলোচনার যবনিকা টানলেন। তিনি বললেন, "এই লোকটা হচ্ছে একজন জাল ইমামের সাগরেদ। ঐ জাল ইমাম অস্ত্রবলে পবিত্র নগরী দখল করেছিল, হজ্জের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল এবং পবিত্র কাবাগৃহের দরজার উপর লিখেছিল— "এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই এবং সউদ তাঁর প্রেরিত নবী (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু সউদ রসুলুল্লাহ)।"

মোট কথা, প্রচারকের উপদেশ একেবারে মাঠে মারা যায় এবং তিনি নিজেও তা জানতেন ; সমবেত জনতা প্রস্থান করার পর মাত্র দুই ব্যক্তি

সেখানে থেকে গেল ; তাদের শরীরে কাদামাটি মাখা ছিল এবং মনে হয় তারা প্রচারকটির সহযাত্রী। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধ প্রচারক ঘুমিয়ে পড়লে কর্দমাক্ত দু'ব্যক্তি পালাক্রমে তাকে বাতাস করতে থাকে। অভুক্ত ঘোড়াটি তার চার পাশের শুকনো ঘাস চিবানো শেষ করে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে নিল। সন্ধ্যায় আবহাওয়া ঠাণ্ডা হলে তারা সকলের অগোচরে সেখান থেকে প্রস্থান করে— বৃদ্ধ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে এবং কর্দমাক্ত দুই সহযাত্রী তার পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে।

এটা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ভারতীয় ওয়াহাবীরা একটা বিরাট সম্প্রদায়ের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। অকৃতকার্য ওয়াহাবী প্রচারকটি হচ্ছেন এই মুহূর্তে গোটা এশিয়ায় পরিভ্রমণরত হাজার হাজার একনিষ্ঠ মানুষের একজন প্রতিনিধি। কখনও লোকের কাছে তিনি স্বীকৃতি পান। আবার কখনওবা কোন মসজিদে তাকে অবজ্ঞা করা হয়। তিনি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু তিনি হচ্ছেন, একজন উৎসর্গীত প্রাণ সংস্কারক, মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্মমতকে পরিশুদ্ধ করাই যার জীবনের ব্রত—যেমন হিল্ডব্রাণ্ডের পাদ্রীরা রোমের চার্চকে পরিশোধিত করেছিলেন।

ভারতে বৃটিশ সরকারের এটা একটা দুর্ভাগ্য যে, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকে বিধর্মী বিজেতাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সব দেশে মুসলমানরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রাথমিক নীতিগুলো কার্যকরী করতে প্রয়াসী হলে সেটা অনিবার্যভাবে শাসক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে । এমনকি সর্বাধিক রক্ষণশীল মুসলিম রাষ্ট্রকেও বেসামরিক প্রশাসনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য ঐসব নীতির পুনর্বিন্যাস করতে হয়েছে । ইসলামের শক্ত ঘাঁটি মক্কা সম্পর্কেও বলা যায় যে, সারা বিশ্বের মধ্যে সেখানকার মুসলমানদের সবচেয়ে ঘৃণা ও ভয়ের চোখে দেখা হয়। শেষের কয়েকটি পাতায় আমি একজন নম্র স্বভাবের ওয়াহাবী প্রচারকের বিষয় উল্লেখ করেছি ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর স্বধর্মীয়দের ধর্মান্ধতাকে রাজদ্রোহের কাজে লাগিয়ে বেঁচে আছেন। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পুরনো বিদ্বেষের কিছু নমুনা এখানে পেশ করছি। ধর্মযুদ্ধ হচ্ছে, মুসলমানদের প্রাথমিক কর্তব্য ; কেউ যদি বলে যে, বর্তমানে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অবাস্তব পরিকল্পনা, তখন জওয়াব দিয়ে বলা হয়, তাহলে দেশত্যাগ করে যাওয়াই একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা। বিধর্মী সরকারের শাসন যতদিন চলবে ততদিন এদেশ এবং এদেশের মাটিতে

যা কিছু গজায় তার সবকিছুতেই অপবিত্র মনে করা হয়। ধর্মযুদ্ধের অপরিহার্যতা সম্পর্কে ওয়াহাবীরা যেসব গদ্য বা পদ্য রচনা করেছে তার কিছু নমুনা ইতিপূর্বেই আমি পেশ করেছি। অনন্তকালের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে বিধর্মী শাসিত দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য পূর্ববঙ্গের অজ্ঞ কৃষকদের উসকানী দেয়ার উদ্দেশ্যে ওয়াহাবীরা যেসব যুক্তি প্রয়োগ করে থাকে তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

"পরম ক্ষমাশীল করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। তিনিই হচ্ছেন সারা বিশ্বজগতের পালনকর্তা প্রভু। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর, তার সকল আসহাব, বংশধর ও অনুসারীদের উপর আল্লাহর অশেষ করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক। সকলেই অবগত আছেন যে, কোন দেশ যদি বিধর্মী শাসকের অধীনস্থ হয়ে পড়ে এবং শাসকশক্তি যদি মুসলমানী আইন কার্যকরী করতে বাধা দেয় তাহলে মুসলমানদের পক্ষে সে দেশ থেকে হিজরত করা অপরিহার্য কর্তব্য। এর ব্যতিক্রম হলে মৃত্যুর সময় আত্মা যখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে তখন অশেষ শাস্তি ভোগ করতে হবে। দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে আজরাইল উপস্থিত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমাদের এই বাস্তুভিটা ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাসের জন্যে আল্লাহর রাজ্য কি পর্যাপ্ত ছিল না ? এবং একথা বলে কঠিন আজাবের সাথে তিনি তাদের দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন করবেন। তারপর তাদের উপর শুরু হবে বিরামহীন গোর-আজাব এবং মহা-বিচারের দিনে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তারা অনন্তকাল ধরে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ করুন, মুসলমানদের যেন বিধর্মী শাসিত দেশে মৃত্যুবরণ না করতে হয়।"

"তোমরা এখনই হিজরত কর । এমন দেশে চলে যাও যার শাসক মুসলমান এবং সেখানে মুসলমানের শাসনে জীবনযাপন কর। জীবিত অবস্থায় সেখানে পৌঁছাতে পারলে তোমাদের জীবনের সকল পাপ মাফ হয়ে যাবে। জীবনধারণের উপকরণ সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না ; আল্লাহই রেজেকের মালিক এবং তোমরা যেখানে যাবে সেখানেই তিনি তোমাদের জন্যে রেজেকের ব্যবস্থা করবেন।"

"পবিত্র গ্রন্থে লিখা আছে, একজন ইসরাইলী নিরানব্বইটি মানুষকে হত্যা করার পর জনৈক আল্লাহওয়ালা সাধু ব্যক্তির কাছে গিয়ে সকল অপরাধ স্বীকার করে এবং কি করে তার পাপমোচন হবে তা জানতে চায়। উত্তরে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিটি বলেন ঃ যদি কেউ অন্যায়ভাবে একজন মানুষকেও

হত্যা করে তবে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। তোমার পাপ মাফ হবে না, এবং তোমাকে অবশ্যই দোজখে যেতে হবে। একথা শুনে ইসরাইলী ব্যক্তিটি বলে, 'আমার দোজখ গমন যখন সুনিশ্চিত, তখন আমি একশটি হত্যা পুরা করার জন্য আপনাকেও হত্যা করব।' সে তখন ঐ সাধু ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং তারপর আর একজন সাধু ব্যক্তির কাছে গিয়ে একশটি নরহত্যার কথা স্বীকার করে কিভাবে এই পাপমোচন হবে তা জানতে চায়। আল্লাহওয়ালা সাধু ব্যক্তি জওয়াবে বললেন, "অনুতাপ করে, এবং বিধর্মীদের দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে গিয়ে।" একথা শুনার পর সে তার কৃতকার্যের জন্য তওবা করে এবং স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয় এবং তার জান কবয করার জন্য ক্ষমার ফেরেশতা ও শাস্তির ফেরেশতা উভয়েই হাজির হন। ক্ষমার ফেরেশতা বলেন যে, তিনিই ঐ লোকটির জান কবয করবেন, কারণ সে তার পাপকার্যের জন্য অনুশোচনা করেছে এবং হিজরত সম্পন্ন করেছে। শাস্তির ফেরেশতা বলেন যে, লোকটি যদি ভিন দেশে গিয়ে পৌছাতে পারত তাহলে ক্ষমার ফেরেশতাই তার জান কবয করতে পারতেন ; কিন্তু যেহেতু লোকটি বিশ্বাসীদের দেশে গিয়ে পৌছে হিজরত সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সুতরাং তিনিই তার জান কবয করার অধিকারী এবং দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করার সময় তিনি তাকে কষ্টও দেবেন। অতঃপর লোকটি যে জমিনে শয্যাশায়ী ছিল ফেরেশতা দুজন সেটাকে মেপে দেখেন যে, তার এক পা সীমানা অতিক্রম করে ইসলামী রাজ্যের অভ্যন্তরে পড়েছে। এর পর ক্ষমার ফেরেশতা দাবি করেন যে, "তিনিই জান কবযের অধিকারী এবং তদনুসারে কোন কষ্ট না দিয়ে তিনি লোকটির আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং মৃত্যুর পর লোকটি আল্লাহর অনুগ্রহভাজনদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ধর্মীয় কারণে হিজরতকারীরা পরলোকে কিরূপ পুরস্কার লাভ করেন তা তোমরা শুনেছ। সুতরাং আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা কর, যাতে করে অনতিবিলম্বে হিজরত সম্পন্ন করে কাফেরদের দেশে মৃত্যুবরণের শোচনীয় পরিণতি থেকে রেহাই পেতে পার।"[১]

অজস্র রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য, পাটনায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রচারকেন্দ্র এবং সারা বাংলার আনাচে-কানাচে প্রচারকদের আনাগোনা ছাড়াও জনগণের মাঝে রাজদ্রোহমূলক কাজের উৎসাহ সৃষ্টির জন্য ওয়াহাবীরা একটি

---

[১] ক্যালকাটা রিভিউ, ৭ম খণ্ড, ৩৮৮-৩৮৯ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

চতুর্থ সংগঠনও গড়ে তুলেছে। প্রাথমিক খলিফারা যেসব এলাকায় অনুকূল সাড়া পাওয়া যাবে সেখানেই প্রচারকদের স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিলেনে। এইভাবে পল্লী বাংলার বিভিন্ন স্থানে এক ধরনের বিদ্রোহী কলোনী গড়ে উঠেছে। জেলায় জেলায় গড়ে উঠা এইসব বিদ্রোহী কলোনী যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজ চালাতে পারে সেজন্য অর্থ ও লোক সংগ্রহের নিজস্ব সংগঠন তাদের আছে এবং পাটনার কেন্দ্রীয় প্রচারকেন্দ্রের সাথে তারা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ১৮৭০ সালে অনুরূপ একটি জেলা কেন্দ্র ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং নিরপেক্ষ বিচারের পর কেন্দ্রের প্রধান প্রচারকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত করা হয়। এই মামলায় উদঘাটিত সাক্ষ্য-প্রমাণ যেকোন বৈদেশিক সরকারের জন্য শিক্ষণীয়, কারণ এতে তারা দেখতে পাবেন যে, বৃটিশ ভারতীয় সরকারের চেয়ে তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক সংহতি কম বিপন্ন নয়।

প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে একজন খলিফা [১] ধর্মীয় প্রচারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ বঙ্গের মালদহ জেলায় আসেন। জায়গাটা অনুকূল দেখে তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করেন এবং স্থানীয় একটি মেয়েকে বিবাহ করে তিনি স্কুল শিক্ষকের পেশা গ্রহণ করেন। ছোট ভূস্বামীদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যার্জনের জন্য ঐ শিক্ষিত ব্যক্তির শরণাপন্ন হয় এবং এভাবে জেলার ভূস্বামী পরিবারগুলোর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় লোকদের মধ্যে তিনি জোরেসোরে রাজদ্রোহমূলক প্রচার চালাতে থাকেন ; ধর্মযুদ্ধের জন্য নিয়মিত চাঁদা উঠাতে থাকেন; এবং সীমান্তের বিদ্রোহী শিবিরে সরবরাহের উদ্দেশ্যে পাটনার প্রচারকেন্দ্রে প্রতি বছর নিয়মিত অর্থ ও লোক পাঠাতে থাকেন। তার একজন চাঁদা আদায়কারী[২] ছিল নিম্নশ্রেণীর চাষী, কিন্তু, তাকে তিনি শিক্ষিত করে তুলে প্রতিভাশালী ও অত্যুৎসাহী সাগরেদে পরিণত করেন । সংগৃহীত চাঁদার এক-চর্তুথাংশ তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হত এবং ক্রমান্বয়ে সে একজন গ্রাম্য মাতব্বরের মর্যাদায় উন্নীত হয় । অনেক বছর ধরে এই কাজে লিপ্ত থাকার পর ১৮৫৩ সালে তার সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটের সন্দেহের উদ্রেক হয়। ফলে তার গৃহ তল্লাশী করা হয় এবং এমন সব চিঠিপত্র উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় যা থেকে তার রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপ এবং ধর্মযুদ্ধের জন্য সীমান্ত শিবিরের সাথে তার যোগাযোগ

---

[১] লক্ষ্ণৌর অধিবাসী আবদুর রহমান। প্রথম আমলের অন্যতম খলিফা বেলায়েত আলী তাঁকে খলিফা পদে নিযুক্ত করেন।

[২] রফিক মণ্ডল।

প্রমাণ পায়। অল্প কিছুদিন আগেই উক্ত সীমান্ত শিবির থেকে পাঞ্জাবে অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা চলে।[১]

জেলা কেন্দ্রের পরিচালককে গ্রেফতার করা হয়, কিন্তু ছোটখাটো বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে আমাদের নমনীয় নীতির বদৌলতে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি মুক্তি পেয়ে যান। অবশ্য অল্প কদিনের কারাবাসের ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি বিদ্রোহী তৎপরতার জন্য চাঁদা সংগ্রহের কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে ঐ কাজের দায়িত্ব তার ছেলের[২] উপর ন্যস্ত করেন। তার উত্তরাধিকারী নিজেকে এই দায়িত্বের উপযুক্ত বলে প্রমাণ করেন। তার বিরুদ্ধে আনীত মামলায় সরকার পক্ষের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিরপেক্ষ মন্তব্য[৩] উদ্ধৃত করে বলা যায় ঃ "প্রথম থেকে বিচারের সময় পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধের জন্য লোক সংগ্রহ করার কাজে তিনি আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দেন।" জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনরূপ বাধা না পেয়েই তিনি এসব কাজ করেন। ভারতে কর্তব্যরত ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের শাসিত জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকাই সঙ্গত মনে করেন। সুতরাং ধর্মীয় আবরণে রাজদ্রোহমূলক কাজ চালানো বেশ সহজ। কিন্তু ১৮৬৫ সালে পাটনার মামলায়[৪] এ তথ্য প্রকাশিত হয় যে, ষড়যন্ত্রের সাথে মালদহ জেলা কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ অবদান ছিল। এই হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও সীমান্ত শিবিরের যুদ্ধে সাহায্যের জন্য তিনি অর্থ ও লোকজন সংগ্রহ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যান। তিনি গ্রামে গ্রামে সফর করে বিদ্রোহের মন্ত্র প্রকাশ্যে প্রচার করেন এবং ১৮৬৮ সালে জনসাধারণের মধ্যে নিরুৎসাহের ভাব দেখতে পেয়ে উৎসাহ পুনরুজ্জীবিত করার কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য পাটনা থেকে খলিফার পুত্রকে আনিয়ে নেন। তার কার্যসীমা তিনটি পৃথক জেলা[৫] পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয় এবং গঙ্গা নদী দিয়ে কয়েকদিনের

---

১. ১৮৫২ সালে একটি ভারতীয় পদাতিক বাহিনীকে বিদ্রোহীরা বশীভূত করে এবং বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট পেশ করেন। তারপর পাটনা শহরে বিদ্রোহী শক্তির প্রাধান্য বিনষ্ট করার জন্য কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হন।

২. মালদহ জেলার মৌলবী আমিরুদ্দীন।

৩. ১৮৭০ সালের মালদহ মামলায় সরকারী নথির সাথে পেশকৃত রিপোর্ট।

৪. মামলায় সেশন আদালত রাজদ্রোহের দায়ে মৌলবী আহমদুল্লাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়। পরে প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

৫. সমগ্র মালদহ জেলা এবং মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার অংশসহ।

নৌভ্রমণে যতগুলো গ্রাম ও দ্বীপ অতিক্রম করতে হয় তার সবগুলোতে বসবাসকারী মুসলমান কৃষকরা তার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। যাদেরকে রিক্রুট করে তিনি সীমান্ত শিবিরে পাঠান তাদের সঠিক সংখ্যা কখনও নিরূপণ করা সম্ভব নয় ; তবে দেখা গেছে যে, সীমান্তে একটি বিদ্রাহী উপকেন্দ্রে উপস্থিত ৪৩০ জন যোদ্ধার শতকরা দশভাগেরও বেশি তার এলাকা থেকে প্রেরিত হয়েছে ।

তার প্রবর্তিত অর্থসংগ্রহ ব্যবস্থাটা সহজ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। গ্রামগুলোকে বিভিন্ন আর্থিক এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক এলাকার জন্য একজন করে প্রধান ট্যাক্স আদায়কারী নিয়োগ করা হয়। এই অফিসারটি আবার প্রতি বাড়ি থেকে কর সংগ্রহের জন্য প্রতি গ্রামে একজন করে আদায়কারী নিয়োগ করেন। তাদের আদায়কৃত অর্থ তিনি হিসেব মিলিয়ে নিয়ে জেলা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতেন। প্রতি গ্রামে একজন করে ট্যাক্স আদায়কারী নিয়োগের নিয়ম থাকলেও যে গ্রামের জনসংখ্যা খুব বেশি সেখানে একাধিক আদায়কারী নিয়োগ করা হয় এবং তার মধ্যে একজন মৌলবী[১] থাকতেন যিনি নামাযে ইমামতি করা ছাড়াও কর আদায় করতেন। একজন জেনারেল ম্যানেজার[২] রাখা হয় যিনি মুসলমানদের দুনিয়াবী কাজের তদারক করতেন। এ ছাড়াও একজন অফিসার[৩] থাকতেন যার কাজ ছিল বিপজ্জনক চিঠিপত্র বিলিবন্টন ও রাজদ্রোহমূলক কাজের খবরা-খবর আদান-প্রদান করা।

চার রকমের চাঁদা সংগ্রহ করা হত। প্রথমটি ছিল, চান্দ্র বছরে কোন লোকের অধিকারে যত রকমের সম্পত্তি থাকত তার শতকরা আড়াই ভাগ কর হিসেবে আদায় করা। একে বলা হত আইনসঙ্গত চাঁদা[৪] এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই অর্থ কাফেরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে ব্যয়িত হয় কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত সম্পদের মালিকদের উপর এই কর ধার্য করা হয় এবং পাটনার খলিফা[৫] সীমান্ত শিবির থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দেখতে পান যে, এই অর্থ ধর্মযুদ্ধের চাহিদা মেটাবার জন্য যথেষ্ট নয়। দুঃস্থ লোকদের সাহায্যের জন্য এতকাল ধরে মসজিদে যেসব দান-খয়রাত জমা করা হত তিনি তা বাজেয়াপ্ত করে ধর্মযুদ্ধে ব্যয় করার ব্যবস্থা করেন। মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে এই দান সংগৃহীত

---

[১] দীন- কে-সরদার।

[২] দুনিয়া-কে-সরদার।

[৩] ডাক-কে-সরদার।

[৪] যাকাত।

[৫] এনায়েত আলী।

হত। এক মাস কৃচ্ছ্রতা ও উপবাস[১] পালনের পর ধর্মীয় আনন্দোৎসব[২] উদযাপিত হয়। ধর্মপ্রাণ মুসলমান মনে করে, ঈদের নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার আগেই গরীবদের মধ্যে দানখয়রাত বিতরণ করতে হবে নইলে তার গত ত্রিশ দিনের কৃচ্ছ্রতা ও উপবাস আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না। এই দান-খয়রাতকে[৩] পাটনার খলিফা ধর্মযুদ্ধের কাজে নিয়োজিত করেন এর পরেও তিনি এমন একটা নতুন কর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন যার আওতা থেকে দরিদ্রতম ব্যক্তিও রেহাই পেতে পারে না। তিনি নির্দেশ জারি করেন যে, প্রত্যেক পরিবারের কর্তা তার পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের প্রতিবারের খাদ্য থেকে একমুষ্টি করে আলাদা করে রাখবেন[৪] এবং প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজান্তে তা গ্রাম্য আদায়কারীর কাছে জমা দেবেন। এভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য বিক্রি করে লব্ধ অর্থ ধর্মযুদ্ধের কাজে পাঠানো হত। অবশ্য, ধর্মীয় ট্যাক্স আদায়কারীদের যত প্রকারের কর আদায়ের ক্ষমতা ছিল, উপরোল্লিখিতগুলো তার একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র। নব দীক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় যাতে ভাটা না পড়ে সেদিকে খলিফার সজাগ দৃষ্টি ছিল। আদায়কারীরা তাদের অধিকারের বস্তু হিসেবে নিয়মিত যে কর আদায় করতেন তার উপরেও তিনি আর এক ধরনের অতিরিক্ত মাশুল ধার্য করেন, যাকে নিয়মিত আদায়কৃত স্বেচ্ছাধীন চাঁদা হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রধান টাক্স আদায়কারী বছরের শেষে তার এলাকাধীন গ্রামসমূহ সরেজমিনে সফর করে নিশ্চিত হতেন যে, প্রত্যেক পরিবার গত বারো মাসে দেয় প্রতিটি কর ও চাঁদা ঠিকমত পরিশোধ করেছে।

সারা বাংলা জুড়ে কর আদায় ও লোক সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত জেলা কেন্দ্রগুলোও সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে যে হতভাগ্য লোকটির প্রসঙ্গ আমি উল্লেখ করেছি তার মতন আরো বহু লোক ঐ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। দক্ষিণ বঙ্গ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অভিমুখে যে বড় রাজপথটি চলে গিয়েছে তার উপরেই তার সদর দফতর অবস্থিত এবং রাজদ্রোহমূলক কাজের প্রচারকরা যাতায়াতের সময় এটাকে তাদের বিশ্রাম শিবির হিসেবে ব্যবহার করে। সীমান্ত যুদ্ধে যে দুজন খলিফা[৫] প্রাণত্যাগ

---

[১] রমযান।

[২] ঈদুল ফিতর অথবা রমযান-কি-ঈদ।

[৩] ফিতরা।

[৪] মুঠি।

[৫] এনায়েত আলী ও মাকসুদ আলী।

করেন, তারাও এই বিশ্রাম শিবিরে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্রোহী শিবিরের বর্তমানের অন্যতম নায়ক[১] পথ অতিক্রমের সময় ঐ বিশ্রাম শিবিরে তার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া পাটনা প্রচারকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন জেলা কেন্দ্রের নেতারাও সেখানে তাঁর সাথে থেকেছেন। যে শহরে[২] তার এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা আগে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। জায়গাটা জেলা সদর দফতর ও পুলিশ ফাঁড়ির বেশ দূরে। এমনকি, পরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন শহরটি ধ্বংস হওয়ার পর তাদের কাজের বিস্তৃতি সাধনের পথ আরো প্রশস্ত হয়। স্রোতের তোড়ে গঙ্গার দক্ষিণ তীরের এই জায়গাটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় ওয়াহাবী অধ্যুষিত গ্রামগুলোর কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট রইল না। বাসিন্দারা সব অন্যত্র চলে যায় ; কেউ গিয়ে বসতি করে নদীর বাম তীরের নতুন চরে, অন্যরা অদূরবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর এলাকায় গিয়ে বাস্তুভিটা গড়ে তোলে। কিন্তু তারা যেখানে গিয়ে বসতি গেড়েছে সেখানটাই বিদ্রোহী কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। নদীতে নতুন চর জেগে ওঠা মাত্রই সেটা ওয়াহাবী পল্লীতে পরিণত হয়ে রাজদ্রোহের নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, স্থায়ী ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা এসব বিদ্রোহী তৎপরতা ভারত সরকারের উৎকণ্ঠার যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি করেছে। গত সাত বছরে ক্রমাগত একের পর এক রাজদ্রোহীরা গ্রেফতার হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। আমাদের সীমান্তে যেমন একের পর এক ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তেমনি দেশের ভিতরেও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা রুজু হয়েছে। বহু দূরবর্তী জেলাসমূহ থেকে ধৃত বিপুল সংখ্যক বন্দী এই মুহূর্তে বিচারের অপেক্ষায় হাজতে বাস করছে। এক মাস পূর্বে এই বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর পাঁচ জন বিদ্রোহীর আরেকটি দল সেশন আদালত কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। যারা বিচারাধীন রয়েছে তাদের ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা এই মুহূর্তে বলা যায় না, কারণ ইতিমধ্যেই যারা দণ্ডিত হয়েছে তাদের অনেকের সাথে এদের নামের মিল দেখা যাচ্ছে। এসব রাষ্ট্রীয় মামলা ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক দুর্ঘটনার স্বরূপ উদঘাটন করলেও মামলার বিবরণ থেকে প্রাপ্ত প্রমাণাদির বিস্তারিত উল্লেখ ব্যতিরেকে বাংলায় বিদ্রোহী ষড়যন্ত্রের

---

[১] ফৈয়াজ আলী।

[২] নারায়ণপুর।

এই পুরানো ব্যাধির সাথে বিস্তারিতভাবে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং যে সকল আসামীর বিচার এখনও শেষ হয়নি তাদের প্রসঙ্গ না টেনে (কারণ তাদের সম্পর্কে আলোচনা করলে বিচারকার্য ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে) যেসব মামলার বিচার শেষ হয়ে গেছে তার একটি নিয়ে এখানে আমি কিছু আলোচনা করব ।

১৮৬৪ সালের মামলাটা ছিল ১৮৬৩ সালের ধর্মযুদ্ধের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। পূর্ববর্তী কয়েক বছরের অনেক মামলার মত এটা মুষ্টিমেয় ভারতীয় সিপাহীর বিদ্রোহ কিংবা দু'চার জন রাজদ্রোহীর বিক্ষিপ্ত কার্যকলাপের মত ছোটখাটো ব্যাপার ছিল না ; বরং এটা ছিল বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা, যাদের কার্যকলাপের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযোগী দক্ষ সংগঠন রয়েছে। ১৮৬৪ সালের জুলাই মাসে আম্বালার সেশন জজ স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস একটি রাষ্ট্রীয় মামলার রায় প্রদান করেন ; রায় ঘোষণার আগে মামলাটির বিশ বার শুনানী হয়। মামলায় মহামান্য রানীর এগার জন মুসলমান প্রজার বিরুদ্ধে ঘোরতর রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে মুসলমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ছিল, যেমন, অত্যন্ত উচ্চ বংশোদ্ভূত ধর্মগুরু ; একজন সামরিক কন্ট্রাক্টর ও কসাইখানার মালিক ; একজন দলিল লেখক ; একজন সৈনিক; একজন পেশাদার প্রচারক ; একজন গৃহভৃত্য ; এবং একজন কৃষক। একজন ইংরেজ কৌসুলী আদালতে তাদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের যাবতীয় সুযোগ তাদের ছিল। বিচারকের সাহায্যকারী হিসেবে ছয়জন ভারতীয় জুরী ছিলেন। বিচার শেষে অভিযুক্তদের আটজন যাবজ্জীবন কারদণ্ড এবং অবশিষ্ট তিনজন আইনের সর্বশেষ দণ্ড লাভ করে।

ভারতের বিরাট উত্তরাঞ্চলীয় প্রেসিডেন্সীর অধিবাসীদের মধ্যে গাত্র বর্ণ ও ভাষাগত বৈচিত্র্য রয়েছে ; এবং একজন ইতালীয়ের পক্ষে ইংরেজ পরিচয় দিয়ে লণ্ডন অতিক্রম করা যত সহজ, একজন বাঙ্গালীর পক্ষে পাঞ্জাবী পরিচয় দিয়ে পেশোয়ার অতিক্রম করা তেমন সহজ নয়। ১৮৫৮ সালের সীমান্ত সংঘর্ষে আমাদের অফিসাররা লক্ষ্য করেন যে, যুদ্ধে নিহতদের অনেকের চেহারায় দক্ষিণ বঙ্গের জলাভূমি অধ্যুষিত এলাকার কাল বা শ্যামল বর্ণের সৌসাদৃশ্য রয়েছে। এ নিদর্শনের অনুবর্তন তৎক্ষণাৎ সম্ভব হয়নি। অভিযান শেষে অনিয়মিত অশ্বারোহীদের সংখ্যা হ্রাস করা হয় এবং যোগ্য লস্করদের অনেককে অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। তাদের একজন

ছিল পাঞ্জাবী মুসলমান[১] এবং অতিশীঘ্র সে আম্বালার নিকটবর্তী একটা জেলায়[২] সার্জেন্ট পদে উন্নীত হয়। ১৮৬৩ সালের মে মাসে একদিন সকালে টহলদানের সময় সে উত্তরের মহাসড়ক দিয়ে গমনরত চারজন বিদেশীকে দেখতে পায়। তাদের খর্বাকৃতি, কালচে রং এবং নাতিদীর্ঘ দাড়ি দেখে বৃদ্ধ সৈনিকটির মনে পড়ে যায় যে, ১৮৫৮ সালের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত বাঙ্গালী বিদ্রোহীদের যে সকল লাশ সে দেখেছিল তাদের আকৃতিও ঠিক এই রকম ছিল। সে তাদের সাথে কথাবার্তা শুরু করে তাদের গোপন তথ্য কিছু অবগত হয় এবং জানতে পারে যে, তারা মুলকা থেকে আগত বাঙ্গালী প্রচারক, বিদ্রোহী শিবিরে পাঠাবার জন্য নতুন করে অর্থ ও লোকজন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা নিজ প্রদেশে ফিরে যাচ্ছে।

দীর্ঘদেহী উত্তরাঞ্চলীয় সৈনিকটি তৎক্ষণাৎ উক্ত চারজন রাজদ্রোহীকে গ্রেফতার করে। তারা মুসলমান ভাই হিসেবে তার কাছে আবেদন জানিয়ে বলে যে, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলে উৎকোচ হিসেবে সে যা চাইবে তাই দেওয়া হবে এবং পার্শ্ববর্তী থানেশ্বর বাজারে জাফর খান নামক জনৈক দূতের মারফত উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাব করে। কিন্তু বৃদ্ধ সৈনিকটি নিমকহারামী করতে সম্মত না হয়ে ধৃত ব্যক্তিদের তৎক্ষণাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সোপর্দ করে। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, ম্যাজিস্ট্রেট তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে হাজতবন্দী করে বিচারে সোপর্দ করলে গোটা ষড়যন্ত্রটা উদঘাটিত হয়ে পড়ত এবং তার ফলে ধর্মান্ধরা আর আমাদের মূল বাহিনীর উপর হামলা করার সুযোগ পেত না এবং একটা বড় রকমের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্য রেহাই পেতে পারত। কিন্তু সে সময় গোটা সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল থানেশ্বর একটা অভ্যন্তরীণ শান্তজেলা ; বড় রকমের রাজদ্রোহ ছিল বিরল ঘটনা এবং অর্থ আদায়ের জন্য ভারতীয় পুলিশ কর্তৃক মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত চারজন 'শান্তিপ্রিয় পথিককে' বিচারে সোপর্দ করতে অস্বীকার করে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যার ফলে দোষ প্রমাণের শতকরা নিরানব্বই ভাগ সম্ভাবনা আছে এমন লোকেরা খালাস পেয়ে যায়। আর সেটা ছিল অনুরূপ একশততম ঘটনার মধ্যে একটি।

ধৃত লোকগুলো মুক্তি পাওয়ায় অশ্বারোহী পুলিশের সার্জেন্ট ভয় পেয়ে যায়। তার রিপোর্ট সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এ কথা ভেবে তার

---

[১] গুজ্রান খান।

[২] কার্নাল।

পাঞ্জাবী মনে ভীষণ আঘাত লাগে এবং তখনও সে এই বিশ্বাসে অবিচল ছিল যে, সাম্রাজ্যের উপর এক ভীষণ বিপদ নেমে আসছে।

সে এমন একটা পরিকল্পনা উদ্ভাবন করে যা নাকি স্পার্টানদের সহিষ্ণুতা এবং রোমকদের প্রভুভক্তি সংক্রান্ত কিংবদন্তীকে প্রায় ছাড়িয়ে যায়। ছুটি মঞ্জুর না করিয়ে চাকরি ছেড়ে যাওয়া দলত্যাগের সামিল ; কিন্তু সুদূর উত্তরে স্বগ্রামে তার ছেলে ছিল এবং একমাত্র পারিবারিক মর্যাদা ছাড়া দুনিয়ার আর যেকোন বস্তুর চেয়ে ছেলেটি ছিল তার সর্বাধিক প্রিয়। তার গ্রাম এবং সীমান্তের মধ্যবর্তী এলাকায় আমাদের অনেকগুলো ঘাঁটি ছিল এবং প্রত্যেক ঘাঁটির সৈনিকরা সন্দেহভাজন পথিক ও আত্মগোপনকারী বিদ্রোহীদের ধরার জন্য সদা সতর্ক ছিল। সীমান্তের অপর পার্শ্বে ছিল ধর্মান্ধ বিদ্রোহীদের ঘাঁটি, যারা তখন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হামলা চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কাজেই কোন সন্দেহভাজন নবাগতকে দেখতে পেলে তারা নিঃসন্দেহে তাকে সরকারী বাহিনীর গুপ্তচর মনে করে হত্যা করবে এটা ছিল অবধারিত। আমাদের বাহিনীর নজর এড়িয়ে যেতে পারলেও সীমান্তের ওপারে ওয়াহাবীদের হাতে ধরা পড়লে তার ছেলে যে রেহাই পাবে না একথা সম্যক অবগত হওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধ সিপাই পারিবারিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার প্রাণপ্রিয় ছেলেকে মুলকা গমনের নির্দেশ দিয়ে বলে যে, বাইরের বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে আমাদের এলাকার মধ্যে যেসব রাজদ্রোহী কর্মরত রয়েছে তাদের নাম সংগ্রহ না করে সে যেন ফিরে না আসে।

পিতার চিঠি পেয়ে ছেলেটি পরের দিনই গ্রাম ত্যাগ করে। অন্তর্ধানের পর তাকে কী যে দুঃখকষ্ট সইতে হয়েছে তা শুধু তার স্বজনরাই জানে। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, ছেলেটি আমাদের ঘাঁটিতে প্রহরারত সৈনিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে সীমান্ত শিবিরে গিয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং তারপর ওয়াহাবীদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের সাথে মিশে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের পর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে রোগজীর্ণ শরীরে একদিন সন্ধ্যায় কয়েকশ' মাইল অভ্যন্তরে পিতার কুটিরে ফিরে আসে। সে এই গোপন তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসে যে, "থানেশ্বরের সেই মুনশী জাফর, লোকে যাকে খলিফা বলে ডাকে, সে হচ্ছে ওয়াহাবী এজেন্ট এবং বাঙ্গালীদের সীমান্ত শিবিরে গমনাগমনে সাহায্য করা, তাদেরকে রাইফেল ও রসদ যোগানোই হচ্ছে তার কাজ ।" স্মরণ থাকতে পারে যে, এই জাফরই হচ্ছে থানেশ্বর বাজারের সেই দলিল লেখক যে নাকি উপরোল্লিখিত চারজন পথিককে ছেড়ে দেয়া হলে সার্জেন্টকে ঘুষের টাকা সরবরাহ করত।

উপরোক্ত দৃঢ়চেতা পাঞ্জাবী পিতার কর্তব্যনিষ্ঠার মত আর কোন হৃদয়-স্পর্শকারী ঘটনা আমার জানা নেই। সেদিন এমন একজন কর্তব্যনিষ্ঠ সিপাই যে গর্বভরে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে নীরবে বিড়বিড় করতে করতে প্রতিদিনের টহলদান কার্য সমাধা করেছে এবং ছেলের ভাগ্যে কি ঘটল না ঘটল সেই চিন্তায় প্রতি মাসে বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বিদেশী প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা এবং পারিবারিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে সে তার প্রাণপ্রিয় ছেলেকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

থানেশ্বর বাজারের দলিল লেখক জাফরের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস বেশ চিত্তাকর্ষক। অত্যন্ত দরিদ্রের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও চরিত্রগুণে সে তার শহরের প্রধান ব্যক্তি[১] হিসেবে নিজের মর্যাদা উন্নীত করে। একদিন জনৈক পেশাদার ওয়াহাবীর বক্তৃতা শুনার সুযোগ তার ঘটে এবং এতে করে এই প্রতিপত্তিশালী লোকটির ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হয়। মসজিদে বিরাজমান কুসংস্কারাচ্ছন্ন আনুষ্ঠানিকতার প্রতি তার মন বিরূপ হয়ে ওঠে এবং জন বুনিয়ানের মত তার মানসনেত্রও নিদ্রোত্থিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে সে নিজেকে ওয়াহাবী পরিচয় দিয়ে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে নিজের সকল কর্মশক্তি উৎসর্গ করে।

নব দীক্ষিত এই ওয়াহাবী আত্মবিশ্লেষণে এবং আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। সে নিজের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উপর লিখতে শুরু করে এবং তার এ রচনাটি রাষ্ট্রীয় মামলায় পেশকৃত অন্যতম চিত্তাকর্ষক দলিলে পরিগণিত হয়।

"১৮৭৮ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ[২] মঙ্গলবার আমি এই বইটি লিখতে শুরু করি। কবে এ লেখা শেষ করতে পারব তা আল্লাহ্‌র মর্জির উপর নির্ভরশীল। বই লেখার জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি আমি অনুসরণ করিনি ; ধর্ম ও দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত যেসব ঘটনার সাথে আমি জড়িত হতে পেরেছি কেবল সেই সব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করছি । আমি এটা জানিয়ে দিতে চাই যে, এই দুনিয়া একটা ক্ষণস্থায়ী জায়গা। মানুষ, জ্বিন, গাছ-পালা-পশু-পক্ষী সবই নির্দিষ্ট সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একমাত্র আল্লাহ্‌ই চিরঞ্জীবী। এ দুনিয়ার কোন বাসিন্দা যদি হাজার বছরও জীবিত থেকে থাকে তবু শেষ বিদায়ের সময় কেবল মনস্তাপ ছাড়া আর কিছুই সে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। আমার নিজের অবস্থাটা নিয়ে বর্ণনা করছি। দশ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যার্জনের কোন সুযোগ আমি পাইনি। পিতার মৃত্যুর সময় আমার বয়স ছিল দশ কি বার বছর, আর আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার

---

[১] লম্বরদার, অথবা সরকারী অফিসারদের তদারককারী শহরের অর্থনৈতিক প্রতিনিধি।

[২] জুন, ১৮৬২।

বয়স তখন মাত্র ছ'মাস। এরপর আমরা মায়ের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠি, কিন্তু তিনি ছিলেন অশিক্ষিতা এবং ধর্মীয় শিক্ষাও তার তেমন কিছু ছিল না। বাল্যকালে লেখাপড়া শিখার কোন চিন্তা না করে আমি ভবঘুরের মত নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে থাকি ; কিন্তু কিছুটা জ্ঞানোদ্রেক হওয়ার পর আমি পড়ালেখা শুরু করি।"

"১৮৫৬ সালে নিজেকে দলিল লেখকদের দলভুক্ত করি এবং অত্যল্প-কালের মধ্যে দেখতে পেলাম যে, সকল দলিল লেখক ও উকিলরা আইনের বিভিন্ন ধারা ও কার্যবিধি সম্পর্কে আমার পরামর্শ গ্রহণ করছে এবং আমি তাদের শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠলাম।" দলিল লেখকরা ছিল এক ধরনের আনরেজিস্টার্ড ক্ষুদে আইনজীবী। তারা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলাকারীদের দরখাস্ত লিখে দিত এবং এজন্য ৬ পেন্স থেকে ২ শিলিং পর্যন্ত ফি পেত। জাফর প্রচুর অর্থ আয় করত ; কিন্তু বিধর্মীর আদালতে লব্ধ আয় কোন কাজে আসবে না বলে তার মনে ধারণার সৃষ্টি হয় । "এই জীবিকা গ্রহণের ফলে আমি আমার ধর্মবিশ্বাসের প্রচুর ক্ষতি করেছি। এই জীবিকা গ্রহণ না করলেই আমার ধর্মাত্মা গ্লানিমুক্ত থাকত। উপাসনা আরাধনার পথে আমার জীবিকা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় বলেই আমার ধারণা। যখন আদালতের কাজ থেকে দু'একদিনের জন্য বিশ্রাম পেতাম তখনই আমার মন ভাল থাকত। অবিশ্বাসী মুসলমান কর্মচারীদের সাথে নিছক সম্পর্ক স্থাপন করে আমার যে মর্যাদা অর্জিত হয় সেটা ছিল আমার আত্মাবনতির কারণ।"

এই জীবিকার প্রতি অনীহা থাকা সত্ত্বেও এ পেশায় জাফরের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী পরিবার তাকে তাদের পারিবারিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করে । তাকে খুব নিষ্ঠাবান বলে মনে হয় এবং পার্থিব জীবনের এই অস্থায়ী সাফল্যকে সে কখনও পারমার্থিব ও অনন্ত কল্যাণের বাধাস্বরূপ হতে দেয়নি। যে কেউ তার সান্নিধ্যে এসেছে সেই তার বশীভূত হয়ে পড়েছে এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর মত সেও নিজের পরিবারের সদস্যদের সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করে। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে তার কেরানী ; চরম কার্যপদ্ধতি অনুসরণের সময়ও সে তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। আম্বালার সেশন আদালতে অন্যান্য স্ব-ধর্মীয়দের মত এই কেরানীটিও সাক্ষী হিসেবে জাফরের সঙ্গে ছিল।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ শুরু হবার পর জাফর তার বারো জন সর্বাধিক বিশ্বস্ত অনুচরকে বিদ্রোহী শিবিরে প্রেরণ করে। চারিত্রিক বিশুদ্ধতা অর্জনের

শিক্ষার প্রতি জাফর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং তার ফলে সর্বাধিক বিপজ্জনক রাজদ্রোহমূলক কাজের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে তাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত বলে মনে করা হত। দিল্লীতে বিদ্রোহীদের সকল আশা ভরসার পতন ঘটার পর সে থানেশ্বরে তার আইন ব্যবসারের জায়গায় ফিরে আসে এবং আল্লাহ কেন অবিশ্বাসীদের জয়ী করলেন তা নিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হয়। দলিল লেখকের গ্লানিকর জীবিকার প্রতি তার বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি পায়। প্রকাশ্য বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে এবং অতঃপর গুপ্ত ষড়যন্ত্রের দ্বারা কিছু করা যায় কিনা তা দেখতে বাকী রইল। ব্যাপকভাবে সংগঠিত ওয়াহাবী সংস্থার একজন সদস্য হিসেবে জাফর যোগ দিল। যে জীবিকার প্রতি তার মনে অনীহা জন্মেছিল, এখন গুপ্ত তৎপরতার বদৌলতে সে পেশার প্রতি ধর্মীয় অনুমোদন প্রাপ্ত হল। জাফর নিজেই লিখেছে, "জেনে রাখা উচিত যে, গুপ্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোন এক ব্যক্তির নির্দেশে আমি এটা করেছি।" [১]

উপরে বর্ণিত কোন এক ব্যক্তি হচ্ছেন পাটনার মৌলবী ইয়াহিয়া আলী, যিনি ছিলেন ভারতীয় ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক পরিচালক। আর আলোচ্য গুপ্ত উদ্দেশ্যটা হচ্ছে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংঘর্ষ শুরু করার, উদ্দেশ্যে সংগৃহীত লোকদেরকে অস্ত্রশস্ত্রসহ গোপনে মহাবনে অবস্থিত বিদ্রোহী কলোনীতে প্রেরণ করা।

আমি ইতিপূর্বেই পাটনার কেন্দ্রীয় প্রচার কেন্দ্রের বিষয় উল্লেখ করেছি। ইয়াহিয়া আলী ছিলেন ঐ কেন্দ্রের তদানীন্তন প্রধান পরিচালক। ১৮৬৪ সালের মামলা শুরু হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই বিদ্রোহী তৎপতার ঘাঁটি হিসেবে ঐ কেন্দ্রটি সারা ভারতে পরিচিত ছিল। বেশ বড় আকারের ফটকসহ কেন্দ্রের ইমারতগুলো সাদিকপুর লেনের বাম দিকে অবস্থিত এবং এর শেষ অংশ সদর রাস্তা থেকে অনেকটা ভিতর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ইমারতের বাইরের দিকটা ভাঙ্গাচোরা ধরনের ; ভারতের অধিকাংশ ইটের বাড়ি বর্ষাকালের পর ঠিক অনুরূপ জরাজীর্ণ রূপ ধারণ করে এবং তার ফলে প্রাচ্যের জাঁকালো অট্টালিকা সম্পর্কে আমরা পাশ্চাত্যের লোকেরা যেসব কথা শুনে এসেছি তার সাথে এগুলো সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। একটা সাদামাটা মসজিদ ছিল এই তৎপরতার কেন্দ্র-

---

[১] স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস দণ্ড প্রদানের সময় জাফরের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন। "এই আসামীর চরম শত্রুতামূলক মানসিকতা, রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপ এবং নাশকতামূলক কাজের দক্ষতার দ্বিতীয় নজির নেই। সে একজন শিক্ষিত লোক এবং তার গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে তার অপরাধ ক্ষমার অতীত।" ১৮৬৪ সালের আম্বালা বিচারের সরকারী রেকর্ড থেকে সংগৃহীত।

বিন্দু, সেখানে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর নামায পড়া এবং প্রতি শুক্রবার জুমার নামায অন্তে খুতবা পড়া বা বক্তৃতা দেয়া হত। এই বক্তৃতায় কাফেরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত। সেই সঙ্গে ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবিহীন কাজের নিষ্ফলতা বর্ণনা করে আধ্যাত্মিক জীবনের সাফল্যের জন্য শ্রোতাদের তাকিদ দেয়া হত। পয়গম্বরের সহজ-সরল প্রার্থনা রীতির সাথে প্রচলিত জটিল রীতিনীতির ও আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মীয় কার্যকলাপের বৈপরীত্য বর্ণনা করা হত। এ ছাড়া জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ নির্মাণের অপ্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে সবশেষে শ্রোতাদেরকে যুদ্ধ অথবা হিজরতের জন্য তাকিদ দেয়া হত।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, তারা যে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে প্রয়াসী ছিলেন তা মানুষের সাধারণ ক্ষমতার অতীত; এবং শ্রোতারা এসব নসিহত গভীর নিষ্ঠার সাথে শ্রবণ করলেও কেবল এর স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কিছুই তারা পালন করতে পারত না । অধিকন্তু, অন্যান্য মসজিদের ইমামরা সাদিকপুর মসজিদের বক্তাদের জ্ঞান ও উচ্চস্তরের বাগ্মীতাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও সার্বিকভাবে প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণকারী হিসেবে তাদেরকে নিন্দা করতেন।

প্রধান ইমাম ও খলিফা ইয়াহিয়া আলী শক্ত অথচ নমনীয় হাতে সকল প্রচারকার্য পরিচালনা করতেন। দক্ষিণ বঙ্গের প্রচারকরা নতুন সংগৃহীত যেসব লোকদের এই কেন্দ্রে পাঠাতেন তাদেরকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করা হত। এদের অধিকাংশকে তিনি ট্রেনিং দিয়ে প্রচারকার্যের উপযোগী করে গড়ে তুলতেন; অবশিষ্টদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব একজন সহকর্মীর উপর ন্যস্ত ছিল, যিনি বিস্তারিত ধর্মীয় শিক্ষার দিকে না গিয়ে, কেবল ন্যূনতম শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে সীমান্ত শিবিরে পাঠাবার উপযোগী করে তুলতেন।[১] এ সহকর্মীটি ছিলেন প্রচার কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ এবং গোষ্ঠী সংগঠনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। প্রধান ইমাম অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার সময় তিনিই ছাত্রদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করতেন। এছাড়াও দৈনন্দিন বৈষয়িক কাজের দায়িত্বও তিনি নির্বাহ করতেন। সকল কাজই তিনি প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও গভীর আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করেছেন এবং সবশেষে স্বীয় গুরুর সাথে আম্বালা মামলায় আসামীর কাঠগড়ায় উপস্থিত হয়েছেন।

প্রধান ইমাম ইয়াহিয়া আলীর উপর বহুবিধ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ভারতে ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসেবে তাঁকে অধীনস্থ

---

[১] আবদুল গফফার।

প্রচারকদের সাথে নিয়মিত পত্রালাপ করতে হত। তাঁকে এক ধরনের গোপন ভাষায় চিঠি তৈরি করতে হত এবং এ গোপন ভাষাটা তাঁরই আবিষ্কার। প্রচুর অর্থ সীমান্তের বিদ্রোহী শিবিরে নিয়মিত পাঠাবার ব্যবস্থাটাও তাঁকেই পরিচালনা করতে হত। মসজিদে নামাযে ইমামতি করা, ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের রাইফেলগুলো পরীক্ষা করে তাদের হাতে তুলে দেওয়া, ছাত্রদের মাঝে ধর্মীয় বক্তৃতা প্রদান করা এবং ব্যক্তিগত পড়াশুনার মাধ্যমে আরবী ধর্মগুরুদের প্রবর্তিত তত্ত্বজ্ঞান আরো গভীরভাবে রপ্ত করা—এই সবই ছিল তার দৈনিক কর্মসূচীর অন্তর্গত।

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের সর্বাধিক জটিল যে কাজটি ছিল তা হচ্ছে পাটনার প্রচার কেন্দ্র থেকে লস্করদের সীমান্ত শিবিরে প্রেরণ করা। বাংলার নব দীক্ষিত লস্করদের পথিমধ্যে হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হতে হত । পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ হয়ে অকুস্থলে গমনের জন্য তাদেরকে প্রায় দু'হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হত এবং পথিমধ্যে তাদের দৈহিক গড়ন দেখে গ্রামের লোকেরা সহজেই বুঝতে পারত যে তারা বিদেশী। সুতরাং প্রধান ইমাম গমন পথের বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্থানে ওয়াহাবী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে প্রতিটি কেন্দ্রের দায়িত্ব একজন করে বিশ্বস্ত অনুচরের উপর ন্যস্ত করেন। এতে অন্যান্য প্রদেশ থেকে সংগৃহীত ওয়াহাবীরা গোটা ভ্রমণপথে বিশ্বাসী সাহায্যকারী পেয়ে যায় এবং তাদের সহায়তায় নিরাপদে সীমান্তের বিদ্রোহী শিবিরে গিয়ে পৌছুতে সক্ষম হয়। পথিমধ্যস্থিত এসব আশ্রয় শিবিরের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন সামাজিক স্তরের লোক হলেও তারা সবাই ছিল বৃটিশ উৎখাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এছাড়া তারা সবাই স্ব স্ব এলাকার ওয়াহাবী কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিল। এই লোকগুলোকে বাছাই করার ব্যাপারে ইয়াহিয়া আলী অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ; কারণ চরম বিপর্যয়ের সময়ও এদের একটি লোককেও ভীতি বা লোভ দেখিয়ে তাদের নেতার বিরুদ্ধে কাজে লাগানো সম্ভবপর হয়নি।

সর্বোপরি, ইয়াহিয়া আলী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবারের সাথে পাটনায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সম্পর্কও ভাল ছিল। তাঁর পরিবারের এক ব্যক্তি বৃটিশ সরকারের অধীনে একটি অনারারী পদে নিযুক্ত ছিলেন, আবার অন্য একদল বৃটিশদের বিরুদ্ধে সীমান্ত শিবির থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সেশন জজ স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস এই লোকটিকে প্রাণদণ্ড প্রদানের সময় তাঁর সম্পর্কে যে হৃদয়গ্রাহী শব্দ ব্যবহার করেছেন তা কোন বিচারকের রায়ে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ঃ

" এই মামলায় যে বিরাট রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হয়েছে তার মূল নায়ক যে ইয়াহিয়া আলী তা প্রমাণিত হয়েছে। ভারতে অর্ধচন্দ্রের (ইসলামী) শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে পাটনার মসজিদে তিনি ধর্মবিষয়ক প্রচারণায় নিয়োজিত ছিলেন। অর্থ সংগ্রহ এবং মুসলমানদের জিহাদ (কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) পরিচালনার জন্য তিনি বহু সংখ্যক অধঃস্তন এজেন্ট নিয়োগ করেছেন। হাজার হাজার স্বদেশবাসীকে তিনি রাজদ্রোহের কাজে নিয়োজিত করেছেন । ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের দ্বারা তিনি ভারতের বৃটিশ সরকারকে সীমান্ত যুদ্ধের মত এমন একটা সংঘর্ষের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন যেখানে শত শত লোক নিহত হয়েছে। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত লোক এবং কৃত অপরাধ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশের কোন সুযোগই তাঁর নেই। পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক অবিচল বিশ্বাসের সাথেই তিনি এই রাজদ্রোহমূলক বিদ্রোহ সংগঠিত করেছেন। জন্মগতভাবে তিনি একটি অবাধ্য ধর্মান্ধ পরিবারের লোক।

তিনি একজন ধর্মীয় সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, কিন্তু বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণসমাজের সংস্কারকরা যে পদ্ধতিতে কাজ করেছে সেভাবে যুক্তি ও বিবেকের দ্বারা চালিত না হয়ে তিনি রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে লক্ষ্যে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন ; অথচ এই সরকারই সম্ভবত ভারতীয় মুসলমানদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছে। "

ষড়যন্ত্রের দুই মূল নেতা হিসেবে দলিল লেখক জাফর এবং প্রধান ইমাম ইয়াহিয়া আলী ১৮৬৪ সালের মামলায় বন্দীদের মধ্যে প্রথম কাতারে ছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলক কাজের ব্যাপারে এদের প্রতিভা দিল্লীর কসাই মোহাম্মদ শফির কাছে ম্লান হয়ে পড়ে। এই কসাইটি পাঞ্জাবের বৃটিশ সৈন্যদের মাংস সরবরাহ করত। সে ছিল উত্তর ভারতের এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের যুদ্ধের সময় থেকেই সরকারের সাথে এই পরিবারের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মোহাম্মদের প্রপিতামহ ও পিতামহ উভয়েই ছিল অতি ক্ষুদ্র রাখাল বা পশুপালক এবং গবাদিপশুর দালালী করে ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলে তারা যথেষ্ট উন্নতি হাসিল করে। সেটা ছিল এমন একটা সময় যখন সম্পদ সঞ্চয়ের চেয়ে বরং সম্পদ আহরণের সুযোগই ছিল বেশি। যুদ্ধের দরুন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে ক্রমাগত স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় সেনা দফতরকে উত্তর ভারতের গবাদিপশু বিক্রেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। আলোচ্য রাজদ্রোহীর পূর্বপুরুষদের পারিবারিক সৌভাগ্য সম্ভবত

১৭৬৯ সালের দুর্ভিক্ষের সময় খুলে যায়। আর এই দুর্ভিক্ষ ইংলন্ডের জনসাধারণকে ভারতের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রথম সচেতন করে তোলে। শতাব্দীর শেষ যুগে তার পিতামহ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ মর্যাদা প্রাপ্ত হন। তিনি তখন যুদ্ধ দফতরের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের পূর্ণ সন্তুষ্টি বিধান করে বড় রকমের ঠিকাদারীতে নিয়োজিত। মোহাম্মদের পিতা পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত এই ঠিকাদারী ব্যবসায়কে আরো উন্নত করে তোলেন। ছোটখাটো পশু পালকদের অর্থ দাদন দেয়ার পরেও তার হাতে প্রচুর পুঁজি থেকে যেত এবং তা তিনি উচ্চ সুদে লগ্নী দিতেন। পুত্র পিতার বিরাট বৈভবের উত্তরাধিকারী হয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেও এই ব্যবসায়ের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের অর্থ ও পাইকারী মাংস সরবরাহকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সে আম্বালা জেলের কয়েদী হিসেবে কষ্টদায়ক কারাকক্ষে নিজের স্থান করে নেয়।

প্রধান ইমাম যেমন ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক ছিলেন, তেমনি এই লোকটি ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

হিন্দুস্থানের প্রায় প্রতিটি প্রধান শহরে তার এজেন্সী ছিল এবং গ্রেট নর্থ রোড বরাবর সাতটি প্রধান বৃটিশ সেনানিবাসে সে মাংস সরবরাহ করত। রক্ত সূত্রে হোক আর বাণিজ্যিক সূত্রেই হোক, পাঞ্জাবের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী পরিবারগুলোর সাথে তার সম্পর্ক ছিল ; উত্তর ভারতের সর্বত্র বহুসংখ্যক অধঃস্তন ব্যবসায়কেন্দ্র সে গড়ে তোলে ; এবং এই বাণিজ্যিক সূত্রেই সীমান্তের অপর পারের উপজাতীয় মেষ পালকদের সাথে তার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মাংস সরবরাহের দরুন প্রতি বছর সে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ পাউণ্ড আয় করে। বাণিজ্যিক লেন-দেনের ব্যাপারে সে খুব নিয়মানুবর্তী এবং বিনয়ী ছিল এবং সে এমনভাবে যুদ্ধ দফতরের অফিসারদের হাত করে ফেলে যে, রাণীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাবার ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত হবার পরেও সে বৃটিশ সেনানিবাসে মাংস সরবরাহের চুক্তি রিনিউ করতে সমর্থ হয়।

এভাবে আমাদের ভৃত্য হিসেবে যে বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয় তাকেই সে আমাদের ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করে। ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ডের সেই ছিল অর্থের যোগানদার। সেনাবাহিনীকে মাংস সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমাদের সরকার তাকে যে অর্থ দিতেন তাই সে বিদ্রোহী শিবিরের পোষকতার কাজে লাগাত। অন্যদের মত ধর্মীয় উদ্দীপনা তার ছিল না, এমন কোন ধর্মান্ধতাও তার ছিল না যা বিপজ্জনক কাজে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

সাধু-সজ্জনদের মত আত্মোৎসর্গের মন্ত্রেও সে দীক্ষিত ছিল না। সে ছিল অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী পেশাদার ঠিকাদার এবং উচ্চ মুনাফা অর্জন ছাড়া এই ধ্বংসাত্মক কাজে তার জড়িয়ে পড়ার অন্য কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় না । সে ভেবেছিল, সরকারী মহলের সাথে তার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তার বদৌলতেই সে বিপদ এড়িয়ে এ কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

পক্ষান্তরে দলিল লেখক জাফরের এবং প্রধান ইমাম ইয়াহিয়া আলীর মধ্যে মিথ্যা আনুগত্যের ছলনা ছিল না এবং আমাদের হাতে ধরা পড়ার পর বিন্দুমাত্র অনুকম্পাও তারা চায়নি। গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ের সাথেই তারা এই ধ্বংসের পথে পা বাড়ায়, যে ধ্বংসের শিক্ষা তারা পেয়েছে ভূয়া ধর্মীয় দীক্ষা থেকে। ষড়যন্ত্রের যোগ্য মূল্যও তারা পেয়ে গেছে এবং ইতিহাস হয়ত তাদের এ দুর্ভাগ্যের জন্য ভাবাবেগপূর্ণ অনুশোচনাই প্রকাশ করবে। কিন্তু মোহাম্মদ শফির জন্য অনুরূপ অনুশোচনা প্রকাশের কোন কারণ থাকবে না। ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই সে আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেছিল। রাজদ্রোহমূলক কাজের সাথে নিজের ব্যবসাকে জড়িত করে সে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে মুনাফা অর্জন করেছে। সে তাদেরকে অর্থ লগ্নী দিয়ে সুদ আদায় করেছে। ১৮৬৪ সালের রাষ্ট্রীয় মামলায় যেসব ধর্মীয় নেতাকে আসামীর কাঠগড়ায় উঠানো হয় সে তাদের সমগোত্রীয় ছিল না এবং তাদের মত তার অপরাধ লঘু ছিল না; রোমান প্রজাতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে এবং সিকারোর বাগ্নীতার ফলশ্রুতিতে যেসব ভীষণ দুরাত্মা লোকের সৃষ্টি হয় সে ছিল তাদেরই সমগোত্রীয়। ওপিয়ানিকাসের হৃদয়হীনতা এবং লিটুলাসের সতর্কতার একত্র সমন্বয়ে তার চরিত্র গঠিত হয়। দস্যুরা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে না পড়া পর্যন্ত সে তার কৃতকর্মের ঘোর পরিণতি উপলব্ধি করতে পারেনি।

আম্বালার আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দিনের পর দিন এক সাথে দণ্ডায়মান চারজন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীর[১] বিবরণ আমি বর্ণনা করেছি। বাকী আট ব্যক্তি সম্পর্কে বিচারকের রায়ে যে কথা বলা হয়েছে তার উদ্ধৃতি দেয়া ছাড়া আমি নিজের থেকে কিছু বলতে চাই না। বিচারকের রায়ে বলা হয়েছে ঃ

---

[১] প্রধান ইমাম ইয়াহিয়া আলী; পাটনার প্রচার কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ আবদুল গফ্ফার পানেশ্বরের দলিল লেখক জাফর নতুন রিক্রুটদের পাঞ্জাবের পথে বিদ্রোহী শিবিরে পাঠানোর দায়িত্ব যে পালন করেছে; এবং বৃটিশ সেনানিবাসে মাংস সরবরাহকারী মোহাম্মদ শফি সেনাবাহিনীর কন্ট্রাকটর হিসেবে যে তার বিশেষ সুযোগ সুবিধাকে বৃটিশ সৈন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে বিদ্রোহীদের গোচরীভূত করার কাজে ব্যবহার করেছে।

'' এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামী রহিমের বাড়িতে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র পরিচালিত হয়। বাঙ্গালী মুজাহিদরা তার ঘরে জমায়েত হয়ে অবস্থান করত। তার ভৃত্য আগন্তুকদের টাকা-পয়সা জমা রাখত, তাদেরকে খাওয়াতো এবং বিদায়ের সময় টাকাকড়ি ফেরত দিয়ে দিত। আর তার ভগ্নিপতি ইয়াহিয়া আলী তার বাড়িতে এসে আগন্তুকদের বিদ্রোহের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করত। তার কর্মদক্ষতা ইয়াহিয়া আলীর মত ছিল না, তবু সে তার সাধ্যানুযায়ী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

"ইলাহী বখ্‌শের বিরুদ্ধে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, পাটনার মৌলবীরা বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত তহবিল তার মারফত কোষাধ্যক্ষ জাফরের কাছে পাঠাতো এবং জাফর সে টাকা মুলকায় ও সিত্তানায় বিদ্রোহী শিবিরে প্রেরণ করত।"

প্রমাণিত হয়েছে যে, পাটনার হুসাইনী ইলাহী বখশের ভৃত্য; রাজদ্রোহের কাজে অর্থ লেনদেনের উদ্দেশ্যে ইলাহী বখশ তাকে নিয়োগ করে ; ইয়াহিয়া আলীর নির্দেশে আব্দুল গফ্‌ফারের কাছ থেকে প্রচুর স্বর্ণের মোহর পেয়ে সে নিজের কাছে গচ্ছিত রাখে ; এই স্বর্ণের মোহরগুলো আস্তিনের মধ্যে সেলাই করে সে পাটনা থেকে দিল্লী নিয়ে যায় এবং নির্দেশ মোতাবেক তা আসামী জাফরের কাছে হস্তান্তর করে। আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, সে ৬০০০ টাকা মানি অর্ডার করে পাঠায় এবং এই সব রাজদ্রোহমূলক তৎপরতা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল।"

"কাজী মিঞাজানের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, সে বাংলায় রাজদ্রোহের প্রচার এবং মুজাহিদ সংগ্রহের কাজ করেছে। পাটনার ষড়যন্ত্রকারী দল ও পার্বত্য অঞ্চলের ধর্মান্ধদের এজেন্ট হিসেবে সে কাজ করেছে। অর্থ সংগ্রহ করে পাঠানো এবং চিঠিপত্র আদান-প্রদানের কাজও সে করেছে। পাটনা ও মুলকা থেকে প্রেরিত গুরুতর রাজদ্রোহমূলক যেসব চিঠি তার ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, তার তিন-চার রকমের ছদ্মনাম ছিল।'

"আব্দুল করিমের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, সে মোহাম্মদ শফির (মাংস সরবরাহকারী) গুপ্তচর হিসেবে রাজদ্রোহমূলক কাজের জন্য পাটনা থেকে টাকাকড়ি বহন করে নিয়ে যেত এবং এসব বিষয়ে ইয়াহিয়া আলীর সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।"

"থানেশ্বরের হুসেইনীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে. রাজদ্রোহমূলক কাজের জন্য আসামী মোহাম্মদ জাফর ও মোহাম্মদ শফির মধ্যে সে যোগসূত্র

হিসেবে কাজ করেছে এবং রাণীর শত্রুদের কাছে পাঠাবার উদ্দেশ্যে জাফরের কাছ থেকে ২৯০ খণ্ড স্বর্ণ[১] নিয়ে মোহাম্মদ শফির পৌঁছে দেয়ার সময় তাকে হাতে-নাতে গ্রেফতার করা হয়।"

"আব্দুল গফফারের (২নং)[২] বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, সে পাটনায় ইয়াহিয়া আলীর শিষ্য ছিল থানেশ্বরে বিদ্রোহী সংগ্রহের কাজে বন্দী জাফরের সাহায্যকারী হিসেবে ইয়াহিয়া আলী একে নিয়োগ করে সে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে এবং রাজদ্রোহমূলক ব্যাপারে ইয়াহিয়া আলীর সাথে পত্র বিনিময় করে।"[৩]

মামলার বিচারকার্য থেকে যে তিনটি সর্বাধিক বিস্ময়কর ব্যাপার উদঘাটিত হয় তা হচ্ছে ঃ ব্যাপক এলাকা জুড়ে সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে সংগঠকদের বিচক্ষণতা; কর্মতৎপরতা পরিচালনাকালে গোপনীয়তা রক্ষায় কর্মীদের দক্ষতা, এবং তাদের পরস্পরের প্রতি সার্বিক বিশ্বস্ততা। তাদের সাফল্যের মূলে অনেকাংশে ছিল ছদ্মনাম গ্রহণের ব্যবস্থা এবং খবর আদান-প্রদানের জন্য এক ধরনের গুপ্ত ভাষার প্রবর্তন।[৪] এটা বিশ্বাস না করে পারা যায় না যে, ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের কর্তব্যকে আল্লাহর কাজ মনে করে অবিচল দৃঢ়তা ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে জীবনবাজি রেখে তা সম্পাদন করেছে কেবল উপরে বর্ণিত মাংসের ঠিকাদারই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে অগ্রনায়ক যারা ছিল, এমনকি তাদেরকেও শহীদ হবার সুযোগ না দিয়ে বৃটিশ সরকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। প্রদেশের সর্বোচ্চ আদালত মামলার আপীল আবেদন ধৈর্যের সাথে শ্রবণের পর আসামীদের কৃত অপরাধ সম্পর্কে স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডসের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে গণ্য করলেও এমনকি চরম

---

১. স্বর্ণের মোহর।

২. ইতিপূর্বে যে আবদুল গফ্ফারের কথা বলা হয়েছে এই ব্যক্তি সে নয়।

৩. ১৮৬৪ সালের এই মামলার ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে আমি ১৮৬৪ সালে আমার রচিত একটি নিবন্ধ থেকে সাহায্য নিয়েছি। সরকারী নথিপত্র এবং আদালতের কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি থেকে ঘটনার বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে।

৪. তাদের গুপ্ত ভাষায় যুদ্ধকে বলা হয় মামলা; আল্লাহ্‌কে বলা হয় মামলার তদ্বিরকারী; স্বর্ণের মোহরকে বড় লাল পাথর অথবা দিল্লীর স্বর্ণখচিত জুতা অথবা বড়লাল পাখী বলা হতো; স্বর্ণের মোহর পাঠানোকে লাল পাপড়িওয়ালা বড় গোলাপ পাঠানো এবং টাকাকড়ি পাঠানোকে বই বা জিনিসপত্র পাঠানো বলা হতো; ড্রাফট ও মানিঅর্ডারকে সাদা পাথর এবং অর্থের পরিমাণকে গোলাপের সাদা পাপড়ির পরিমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হতো।

অপরাধকারীদের বেলায়ও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দেন।

বিদ্রোহীদের উৎসাহ প্রশমনে ১৮৬৪ সালের মামলা খুব বেশি কাজে আসেনি, এমনকি ১৮৬৩ সালের প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থার উপরও এর যেমন প্রভাব পড়েনি। তাদের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের জন্য সীমান্তের গোলযোগ কয়েকটা বছরের জন্য থেমে যায়, কিন্তু ইত্যবসরে আমাদের সীমানার অভ্যন্তরে ধর্মযুদ্ধের প্রচারণা জোরেসোরে শুরু হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গের প্রতিটি জেলা বিদ্রোহীদের তৎপরতায় আলোড়িত হয় এবং পাটনা থেকে সুদূর সমুদ্রোপকুল পর্যন্ত সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার মুসলমান কৃষকরা ধর্মযুদ্ধের অংশ হিসেবে শুক্রবারে জুমার নামায পড়া বন্ধ রাখে। খবর আদান-প্রদানে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সীমান্ত শিবিরের প্রকৃত অবস্থা অবগত হতে না পারায় অভ্যন্তর ভাগের বিদ্রাহীদের উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়ে এবং তার ফলে কিছুটা নমনীয় কর্মসূচী অনুসরণের দিকে তাদের ঝোঁক দেখা যায়। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার ধর্মান্ধ মুসলমানরা নিজেদেরকে ওয়াহাবী না বলে ফ্যারায়েজী[২] অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনাবশ্যকীয় আচারানুষ্ঠানাদি বর্জনকারী হিসেবে পরিচিত করে। এরা নিজেদেরকে নয়া মুসলমান বলে পরিচয় দেয় এবং কলকাতার পূর্ব দিকের জেলাসমূহে এদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। আমরা আগেই দেখেছি ১৮৩১ সালে একজন সাধারণ স্থানীয় নেতা তিন থেকে চার হাজার লোককে একত্রিত করে কিভাবে কলকাতা থেকে প্রেরিত একটি মিলিশিয়া বাহিনীকে হঠিয়ে দেয়, এবং কেবল মাত্র নিয়মিত সেনাবাহিনী গিয়ে তাকে দমন করতে সক্ষম হয়। ১৮৪৩ সালে

---

১. আপীলের শুনানীর পর পাঞ্জাবের জুডিসিয়াল কমিশনার প্রদত্ত রায়ের ১৮২-১৮৪ অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। তারিখ, ২৮শে আগস্ট, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ।

২. ফারায়েজীরা মুসলমানদের পাঁচটি কর্তব্যের মধ্যে মাত্র প্রথম দু'টিকে কোরআন ও হাদীস মোতাবেক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করে। (আরবী ফারাইজা, বহু বচনে ফারায়েজ, অর্থাৎ ফরজ-এর সমতুল্য শব্দ থেকে ফারায়েজী নামের উৎপত্তি)। আলোচ্য পাঁচটি ধর্মীয় কর্তব্য হচ্ছেঃ (প্রথম) ফরজ (এ থেকেই ফারায়েজী); যা পালন না করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়। (দ্বিতীয়) ওয়াজব; যা পালন না করলে মানুষ গোনাহগার মুসলমানে পরিণত হয়। (তৃতীয়) সুন্নত, যা পালন না করলে আল্লাহর আক্রোশ নিপতিত হয়। (চতুর্থ) মুস্তাহাব; যা পালন না করলে গোনাহ হবে না কিন্তু পালন করলে সওয়াব পাওয়া যায়। (পঞ্চম) মুবাহ্; যা পালন করা। অপ্রয়োজনীয় ফারায়েজীরা বর্তমানে দাবি করছে যে, তাদের মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা তিতুমিয়া নয়, শরফাত উল্লাহ (শরিয়াত উল্লাহ), যিনি ১৮২৮ সালে ঢাকায় প্রচার কার্যে অবতীর্ণ হন, তিনি হচ্ছেন এ মতের প্রতিষ্ঠাতা।

'এই সম্প্রদায়টি এতদূর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যে, তাদের সম্পর্কে তদন্তের জন্য সরকারকে বিশেষ তথ্যানুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করতে হয়। বাংলার পুলিশ-প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, মাত্র একজন প্রচারক প্রায় আশি হাজার অনুগামীর এক বিরাট দল গড়ে তুলেছে এবং তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে। তাদের কেউ বিপদে পড়লে তাকে রক্ষার জন্য যেকোন অন্যায় কাজ করতেও তারা দ্বিধা করে না।[১] পরবর্তী খলিফারা, বিশেষতঃ ইয়াহিয়া আলী, পূর্ববঙ্গের ফারায়েজীদের উত্তর ভারতীয় ওয়াহাবীদের সাথে একত্রীভূত করে। গত তের বছর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহতদের মধ্যে এক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মামলায় আটক বন্দীদের মধ্যেও উভয় সংস্থার লোকদেরকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা গেছে।

১৮৬৪ থেকে ১৮৬৮ সালের মধ্যে ধর্মযুদ্ধের জন্য আগের মতই কর আদায় করা হয় এবং ষড়যন্ত্রের মোকাবিলার জন্য একটা বিশেষ সংস্থা গঠন করতে হয়। বর্তমানে একটিমাত্র প্রদেশের ওয়াহাবীদের ওপর নজর রাখা এবং তাদের তৎপরতাকে সীমার মধ্যে রাখতে গিয়ে সরকারকে যে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে তার পরিমাণ স্কটল্যাণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি বৃটিশ জেলায় বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও ফৌজদারী অপরাধ দমনের কাজে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় তার সমান। ষড়যন্ত্র এত ব্যাপক এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে যে, এর যে কোথায় শুরু, তা বুঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। প্রতিটি জেলা কেন্দ্রে হাজার হাজার পরিবারের মাঝে অসন্তোষের বিষ ছড়াচ্ছে ; কিন্তু এই তৎপরতার একমাত্র সম্ভাব্য সাক্ষী হচ্ছে এর কর্মীরা যারা তাদের নেতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে বরং মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় বলে মনে করে।

আমাদের এলাকার ভেতরে পুলিশী তৎপরতা এবং সীমান্ত এলাকায় সামরিক ফাঁড়িগুলোতে সৈন্যদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ১৮৬৮ সালে ধর্মান্ধ বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ পুনরায় সাম্রাজ্যকে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন করে। ঐ বছরই মালদহ জেলা কেন্দ্র বাংলায় ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার চালাবার জন্য নির্ভয়ে পাটনার খলিফার পুত্রকে বাংলায় নিয়ে আসে। সংকটের ব্যাপকতার তুলনায় আইন-আদালত কর্তৃক অনুসৃত সাধারণ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত মনে হয় এবং তার ফলে বিশেষ ধরনের অপরাধের মোকাবিলার জন্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সুদূর ১৮১৮ সালেই আইনসভা কর্তৃক

---

[১] বাংলার পুলিশ কমিশনারের পত্র নং ১০০১; তারিখ ১৩ই মে, ১৮৪৩।

গৃহীত ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে, বিপুল সংখ্যক বিজিত জনগণের উপর শাসন-কার্যে নিয়োজিত মুষ্টিমেয় বিদেশী সরকারকে কী ভীষণ বিপদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সুতরাং আইনসভা শাসন বিভাগকে ষড়যন্ত্রমূলক কাজে নিয়োজিত যেকোন লোককে আটক করার ক্ষমতা প্রদান করে। এ ধরনের জাতীয় বিপদ উপস্থিত হলে ইংলণ্ডে হেবিয়াস কর্পাস আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখা হয় ; কিন্তু ভারতে অনুরূপ ব্যবস্থাগ্রহণের মানে সামরিক আইন প্রয়োগের মত পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া । বর্তমান ঘটনায় দেখা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ই এ ব্যাপারে দায়ী; এবং পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তারা ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-দশমাংশ মাত্র। সুতরাং এখানে হেবিয়াস কর্পাস স্থগিতকরণের অনুরূপ কোন আইন জারি করা হলে হিন্দুরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই এই অভিযোগ তুলবে যে, এদেশের প্রকৃত মৌল অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদের চরম শত্রু মুসলমানদের অবাধ্যতার জন্য তাদেরকেও দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেও এই অভিযোগ উঠবে যে, ওয়াহাবীদের দমনের জন্য জারিকৃত সাধারণ বিধি-নিষেধের আওতায় সুন্নী ও শিয়াদের নিক্ষেপ করা হয়েছে।

ইংলণ্ডবাসীরা জানে না অথচ ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি বদ-অভ্যাসের দরুন উপরোক্ত অবিচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বাঙ্গালীরা ব্যক্তিগত বিরোধ বা শত্রুতা মিটাবার জন্য অপ্রয়োজনীয় হিংসাত্মক পন্থার পরিবর্তে বরং আইনের আশ্রয় নিতে বেশি অভ্যস্ত। একজন ইংরেজ যে উদ্দেশ্যে ঘোড়ার চাবুক কিংবা একজন ক্যালিফোর্নিয়াবাসী ছোরা ব্যবহার করে, সেই একই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীরা আদালতের শরণাপন্ন হয়। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে জব্দ করার জন্য ফৌজদারী মামলা দায়ের করাই যথেষ্ট ; এবং হেবিয়াস কর্পাসের অনুরূপ আইনের সুযোগ ভারতে সাময়িকভাবে বাতিল করা হলে প্রতিটি লোক তার দুশমনের করুণার পাত্রে পরিণত হবে। ভারতে কি পরিমাণ মিথ্যা মামলা দায়ের হয়ে থাকে তা এদেশের পুলিশের বিরাট রোজগার থেকে সহজে অনুমান করা চলে এবং বাঙ্গালীরা যেকোন ছুতানাতায় মামলা রুজু করার মত প্রাথমিক অভিযোগ তৈরি করতে বেশ সিদ্ধহস্ত। সুতরাং এখানে হেবিয়াস কর্পাসের অধিকারের উপর সরকারীভাবে হস্তক্ষেপ করা হলে মিথ্যা মামলা রুজু করার হিড়িক পড়ে যাবে। সে অবস্থায় রাজদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়ে নির্দোষ ব্যক্তিরা সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকবে এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রতিশোধ পরায়ণ লোকেরা হাতে স্বর্গ পেয়ে যাবে।

তথাপি, হেবিয়াস কর্পাস সাময়িকভাবে বাতিল করার ফলে ইংলন্ডে রাণীর মন্ত্রীরা যে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন, ভারতেও যদি বিদ্রোহের সময় শাসন বিভাগের হাতে অনুরূপভাবে গ্রেফতারের ক্ষমতা অর্পণ না করা হয় তাহলে এদেশে বৃটিশ শাসন এক মাসও নিরাপদে কার্যকর হতে পারবে না। সেইজন্য আইনসভা শাসন বিভাগের হাতে অনুরূপ ধরনের বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছে, তবে এ ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক প্রতিবিধানও সন্নিবেশিত হয়েছে। কেবলমাত্র সর্বোচ্চ সরকারী কর্তৃপক্ষই এ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে এবং এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সরকারী কর্তৃপক্ষ মানে বড়লাট ও তাঁর শাসন পরিষদ। আইনের উপক্রমণিকায় এর প্রয়োগ কেবলমাত্র রাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রেই সীমিত করা হয়েছে। আলোচ্য ধারায় বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র "বিদেশী শক্তিসমূহের সাথে সম্পাদিত বৃটিশ সরকারের মৈত্রী চুক্তিকে রক্ষা করা বৃটিশ সরকারের আশ্রিত দেশীয় রাজ্যসমূহের এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এবং বৈদেশিক হামলা অথবা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ থেকে বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলোর নিরাপত্তা রক্ষার" উদ্দেশ্যেই এ আইন ব্যবহৃত হবে।[১] আটক বন্দীরা যাতে সদ্ব্যবহার পেতে পারে তজ্জন্য আইনে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইন বেশ সতর্কতার সাথে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের থেকে এদের পৃথক মর্যাদার অধিকারী করেছে এবং এদের আটকাবস্থাকে হাজতবাস না বলে ব্যক্তিগত বিধিনিষেধ বলে অভিহিত করেছে। তারা সরকারের কাছ থেকে ভাতাও পেয়ে থাকে। গভর্নর জেনারেলের কাছে সরাসরি আবেদন বা দরখাস্ত করার অধিকারও তাদের রয়েছে।[২] আটকের মাত্রানুসারে সংশ্লিষ্ট রাজবন্দীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে কিনা, এবং প্রদত্ত ভাতা সামাজিক মর্যাদা অনুসারে তার নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ চালাবার জন্য যথেষ্ট কিনা, এসব বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসার সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে রির্পোট প্রদানে বাধ্য।[৩] তার সম্পত্তি সাধারণত নিজের কিংবা তার পরিবারের এখতিয়ারে থাকবে। কিন্তু তার সম্পত্তি সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সে অবস্থায় বকেয়া ভূমিরাজস্ব আদায় অথবা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর কারণে সম্পত্তি বিক্রয়ের উপর বাধানিষেধ আরোপিত থাকবে। বন্দীকে যাতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘদিন আটক থাকতে না হয় তার জন্য প্রতিবিধেয়ক ব্যবস্থাও আইনে রাখা হয়েছে। বন্দীর আটকাদেশ অব্যাহত রাখা হবে, না সংশোধন

---

১. ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের প্রথম ধারা।

২. ঐ. ৫ম ধারা।

ঐ. চতুর্থ ধারা।

করা হবে, সে সম্পর্কে বড়লাটের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে তার আচরণ, স্বাস্থ্য এবং প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত অফিসার সরকারের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছে বছরে দু'বার করে রিপোর্ট প্রদানে বাধ্য।[১]

১৮৫৮ সালের বিদ্রোহের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও জাতিসমূহের উপর যদি এই আইন প্রয়োগ করা হতো, তাহলে ১৮৬৩ সালের ধ্বংসাত্মক সীমান্ত যুদ্ধ এড়াতে বৃটিশ সরকার সক্ষম হতেন। মাত্র অল্প সংখ্যক লোককে সুপরিকল্পিতভাবে আটক করে রাখতে পারলে আমরা আম্বিয়ালা গিরিপথের সংঘর্ষে নিহত বা আহত প্রায় হাজার খানেক সৈন্যের প্রাণ রক্ষা করতে এবং বহু লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে পারতাম। এমনকি উক্ত সংঘর্ষের পরেও যদি ১৮৬৪ সালের রাষ্ট্রীয় মামলায় উদঘাটিত ষড়যন্ত্রজাল এই আইনের ব্যাপক প্রয়োগের দ্বারা আমরা ছিন্নভিন্ন করে ফেলতাম, তাহলে ১৮৬৮ সালের ব্লাক মাউন্টেন অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বিনষ্ট করাও হয়ত আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো। কিন্তু অন্যত্র যে কারণের বিষয় আমি উল্লেখ করেছি[২] তার ফলেই ভারত সরকার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে সক্রিয় হতে দ্বিধান্বিত হয়েছে এবং এতে করে সরকার তার নিজের শাসনব্যবস্থাকেই মাঝে মাঝে বিপন্ন করে তুলেছে। আমাদের শাসন কর্তৃত্ব যদি সাময়িকভাবেও বানচাল হয় তাহলে ভারতে ইংলণ্ডের স্বার্থ এবং বৃটিশ শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকে এদেশের রেলপথ নির্মাণ, খাল খনন এবং অন্যান্য উৎপাদনমূলক কাজে বৃটিশ পুঁজিপতিরা যে কোটী কোটী স্টার্লিং ব্যয় করেছে তার সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সীমান্ত এলাকার ব্যয়বহুল যুদ্ধ এবং আমাদের সীমানার অভ্যন্তরে বিচার বিভাগ প্রদত্ত কঠোর সাজা— এসব কিছুই ধর্মান্ধদের যুদ্ধোন্মাদনা দমনে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সরকার ১৮৬৮ সালে অপরাধীদের গ্রেফতারের কঠোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়।

নিরপরাধ ব্যক্তিদের ক্ষতির কারণ না ঘটিয়ে এবং জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি না করেই এই আইনটি কার্যকরী করা যেতে পারে। প্রত্যেক জেলার নেতৃস্থানীয় রাজদ্রোহীদের তালিকা কয়েক বছর আগেই সরকারের হাতে এসেছে; এবং দু'দিন আগে বা পরে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে এটাই হিন্দু জনসাধারণ আশা করেছিল। রাজদ্রোহের প্রধান নায়কদের গ্রেফতার করা হয়; তারা তাদের অনুসারীদের উপর যে প্রভাব বলয় গড়ে তোলেন তা ভেঙ্গে

---

[১] ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের ৪র্থ ধারা।

[২] পল্লী বাংলার বার্ষিক ঘটনা বিবরণী: ১ম খন্ড, ২৪১ পৃঃ ৪র্থ সংস্করণ।

সেওয়া হয় এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়ায় ধর্মযুদ্ধে অর্থ সাহায্যকারীদের নাম ও পরিচয় উদঘাটিত হয়। যেসব ধনী ব্যক্তিরা বিদ্রোহীদের গোপনে অর্থ যোগান দিয়ে এসেছে, যেমন ১৮৬৪ সালের রাষ্ট্রীয় মামলার অন্যতম আসামী সেই সামরিক কন্ট্রাক্টর, তাদেরকে খুঁজে বের করার মত তথ্য প্রমাণ সরকারের হস্তগত হয় ।

শত শত মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত বিভিন্ন জেলায় গত সাত বছরে আরো পাঁচটি রাষ্ট্রীয় মামলা দায়ের হয়েছে। এই সব মামলার আসামীদের সবাই একই ষড়যন্ত্রমূলক লক্ষ্য সামনে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। প্রতিটি মামলার শুনানী থেকে অনুরূপ আরো অনেক ঘটনার সূত্র আবিষ্কৃত হয় এবং দেশের দূরবর্তী এলাকার অন্ততঃ অর্ধডজন ষড়যন্ত্রের আখড়ার তথ্য তল্লাশী না করে একজন ষড়যন্ত্রকারীর সন্ধান পাওয়াও সম্ভব ছিল না। ১৮৬৪ সালের আম্বালা মামলায় প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ১৮৬৫ সালের পাটনা মামলাকে প্রয়োজনীয় করে তোলে এবং এর সামগ্রিক ফলশ্রুতি ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মালদহ মামলা ও অন্যান্য গ্রেফতারকে সম্ভব করে। এর প্রতিটি মামলা অন্যটির উৎপত্তিতে সাহায্য করেছে ; যেমন ১৮৭০ সালের অক্টোবর মাসের রাজমহল মামলা, এবং ১৮৭১ সালের সেই বিরাট মামলা যার মাধ্যমে অতি সম্প্রতি আরো একদল ধর্মান্ধ ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ করেছে। সাজাপ্রাপ্ত বিদ্রোহী বা অপরাধের দায়ে যারা এখন বিচারাধীন রয়েছে তাদের কারো বিরুদ্ধেই গণ-অসন্তোষ উস্‌কে দেয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। অনুরূপ মামলার নিষ্পত্তি আদালতের শান্ত পরিবেশে সম্পন্ন হওয়া উচিত ; সাম্প্রতিক মামলার পর যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা কারো জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না। কিন্তু ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার স্বরূপ পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য আমি এখানে দু'একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার জের টানতে চাই। পাঠক হয়ত জানেন না যে, এসব মামলায় দক্ষ ইংরেজ ব্যারিস্টাররা উচ্চ ফিস দাবি করে থাকেন এবং প্রতিটি মামলার সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রকে প্রভূত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের প্রাথমিক তদন্ত সম্পূর্ণ করতে প্রায় দু'মাস লেগে যায়। সর্বশেষ মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের প্রাথমিক তদন্তের পর সেশন জজের এজলাসে এক মাস তিন সপ্তাহ শুনানী চলে। শুনানীর জন্য আদালতকে আটত্রিশ দিন এজলাসে বসতে হয়, ১৫৯ জন সাক্ষীকে জেরা করা হয় এবং বিভিন্ন ভাষায় লিখা বিপুল সংখ্যক প্রামাণ্য দলিলপত্র পরীক্ষা করতে হয়। সেশন আদালতের কাজ শেষ হওয়ার পর মামলাটি এখন কলকাতা হাই- কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। সেখানে মামলা শেষ হতে আরো কতদিন লাগবে

এবং কত অর্থ যে ব্যয় হবে তা আগের থেকে অনুমান করে বলা কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়।

সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এইসব মামলার প্রত্যেকটির বিচার সম্পূর্ণ হতে এক বছরের মত সময় লাগে এবং এই দীর্ঘ সময়কালে মামলার বিষয়কে কেন্দ্র করে ধর্মান্ধ জনগণের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়ে আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে কিরূপ গণ-অসন্তোষ জাগ্রত হয়। সর্বশেষ মামলাটি হাইকোর্টে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে একজন মুসলমান ঘাতক বাংলার প্রধান বিচারপতিকে তাঁর ট্রাইব্যুনাল কক্ষের সিঁড়ির উপর ছুরিকাঘাত করে। আমি যখন এই লাইনগুলো লিখছি ঠিক সেই সময় মুসলমান ও ইংরেজ উভয়ের মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যা সিপাহী বিদ্রোহের পর আর কখনও হয়নি। ভারতীয়দের মধ্যে আবার প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং বিস্ফোরণ প্রতিহত করতে হলে যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তা দেখাতে হবে। যে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে ক'রে আতঙ্কমুক্ত হয়ে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ লিখার কাজ চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। বৃটিশ ভারতে সংঘটিত অপরাধ নিবারণের যথেষ্ট ক্ষমতা বৃটিশ ভারতের আদালতসমূহের রয়েছে। শাসন বিভাগের হাতে গ্রেফতারের যে ক্ষমতা ইতিমধ্যেই ন্যস্ত করা হয়েছে তাকে আরো শক্তিশালী করে তোলা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হতে পারে কিন্তু এটা আইন পরিষদের ঠাণ্ডা পরিবেশে বিচার-বিবেচনার বিষয়, একটা ক্রুদ্ধ সম্প্রদায়ের হঠকারি সিদ্ধান্তের বিষয় নয়— এমন একটা সম্প্রদায় যারা এখনও পর্যন্ত আকস্মিক ও বিরাট বিপর্যয়ের দুঃখ ভুলতে পারেনি।

ইতিমধ্যে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তা থেকে উদ্ভূত মামলা ধর্মান্ধ ওয়াহাবীরা যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট রয়েছে তার বিপদ সম্পর্কে মুসলমানদের সজাগ করে তুলেছে। ধর্মান্ধদের সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার দৃঢ় সংকল্প তারা প্রকাশ করেছে। তাদের প্রত্যেক ফেরকা ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে শাস্ত্রকারদের প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ[১] করেছে এবং এতে ওয়াহাবীদের রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপের নিন্দা করা হয়েছে। এই আগ্রহোদ্দীপক প্রামাণ্য দলিলগুলো নিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমি আলোচনা করব। ধর্মান্ধদের ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত যে ভেঙ্গে পড়েছে তার নিদর্শন তাদের নিজেদের অবস্থা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তাদের প্রধান নেতারা ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে এবং অবশিষ্টরাও বুঝতে পেরেছে যে, সক্রিয়

---

[১] ফতোয়া।

হলে তাদেরকেও একই পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু গুরুত্বহীন বলে মনে হলেও সীমান্তের সশস্ত্র শিবিরগুলো এখনও টিকে আছে এবং সময় মত সেগুলো হয়ত বিরাট ধর্মীয় মহাসম্মিলনের রূপ পরিগ্রহ করবে। আজ সকালেই[১] আমি এই পরিচ্ছেদ রচনার কাজ শেষ করার সময় একটি নির্ভরযোগ্য ভারতীয় সংবাদপত্রের খবরে জানতে পারলাম যে, ব্লাক মাউন্টেনের উপর বিদ্রোহীশিবির থেকে আরেকটি আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে। ৪ঠা জুন স্থানীয় অধিবাসীদের দৃঢ় প্রতিরোধ সত্ত্বেও একদল সশস্ত্র উপজাতি হামলা চালিয়ে তিনটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।[২] ঘটনার সংবাদপ্রাপ্তির চার ঘণ্টার মধ্যে আমাদের নিকটবর্তী সেনানিবাস থেকে তৃতীয় পাঞ্জাব পদাতিক বাহিনী এবং ৪র্থ পাঞ্জাব অশ্বারোহী বাহিনীর একটা দল অকুস্থলে যাত্রা করে ; এবং তারপর ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার কারণ ধর্মীয়, না অন্য কিছু, সে সম্বন্ধেও কোন তথ্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কেবল এটাই আমরা জেনেছি যে, বৃটিশ ভারতের সকল সংবাদপত্র গত কয়েক সপ্তাহ যাবত আরেকটি আফগান যুদ্ধের সম্ভাব্যতা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চালাচ্ছে। আমাদেরকে যদি অনুরূপ কোন পরীক্ষার মধ্যে আবার পড়তে হয়, তাহলে, আমাদের সীমানার মধ্যেকার ওয়াহাবী ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করতে পারলে সীমান্তের অপর পারের বিপদ উৎরানো সহজ হবে।

---

[১] সিমলা, ১৪ই জুন, ১৮৭১ (প্রথম পরিচ্ছেদ)।

[২] ১২ই জুনের পাইওনিয়ার পত্রিকা; ১৪ই জুন পত্রিকাটি সিমলায় পৌছায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমান আইনবিদদের সিদ্ধান্ত

বাংলায় ওয়াহাবীদের রাজদ্রোহমূলক সংগঠন গড়ে তোলার সময় নিজ দেশবাসীদের কাছ থেকে তাদেরকে কিছুটা বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। মুসলমান সমাজের বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে যে পারস্পরিক বিদ্বেষ রয়েছে তা এত তীব্র যে, এক ফেরকা অন্য ফেরকার লোকদের খ্রীস্টানের মত বিধর্মী বলে মনে করে ; এ ছাড়াও বিষয়-সম্পত্তি ও কায়েমী স্বার্থের মালিক মুসলমান ও হিন্দু নির্বিশেষে সবাই যেকোন জেলায় ওয়াহাবীদের উপস্থিতিকে একটা উৎপাত বলে মনে করে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ একই রকম হয়ে থাকে এবং ওয়াহাবীরাও তদনুসারে লুথার বা ক্রমওয়েলের মত সংস্কারবাদীর ভূমিকায় না গিয়ে বরং রবসপিয়ের বা তাঞ্চলিনের[১] মত ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় অবতীর্ণ হয়। উতরেত সম্প্রদায়ের যাজকরা যেমন প্রতিবার কশাঘাতের সম্মুখীন হয়ে ভয়ে চীৎকার দিয়ে ওঠতো, তেমনি মসজিদ বা ধর্মস্থান[২] সংলগ্ন বারো একর জমির মালিক প্রতিটি মুসলমান যাজক গত অর্ধশতক যাবত ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে ভয়ার্তকণ্ঠে চীৎকার করে আসছে। ১৮১৩ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত মক্কায় ওয়াহাবীরা জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে রাস্তায় বের হতে পারেনি। এমনকি আজও অসম্মান ও মারপিটের আশংকা ছাড়া তারা পথে চলাফেরা করতে পারে না।

অন্য দেশে যেমন, ভারতেও তেমনি, ভূস্বামী ও যাজকরা যেকোন পরিবর্তনকে ভয়ের চোখে দেখে থাকে। মুসলমান ভূস্বামীরা মসজিদের স্বার্থ দেখাশোনা করে, যেমন ইংরেজ ভূস্বামীরা প্রতিষ্ঠিত গীর্জার স্বার্থ রক্ষা করে। ধর্মীয় বা রাজনৈতিক যেকোন ধরনের বিপ্লব কায়েমী স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর। ভারতীয় ওয়াহাবীরা উভয় দিক থেকেই চরম বিপ্লবী ঃ ধর্মীয় বিষয়ে তারা মানুষের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে নাড়া দিয়েছে ; আর রাজনৈতিক বিষয়ে

---

[১] 'তার অনুসারীরাই ছিল খাঁটি খ্রীস্টান। তিন হাজার দেহরক্ষীর এক বিরাট বাহিনী দ্বারা তিনি সব সময় পরিবৃত থাকতেন। জনসাধারণ তাকে দেবতা বা তার চেয়েও বড় কিছু মনে করে পূজা করত। তার গোছল করা পানি তারা পান করত।' — মিলম্যান প্রণীত ল্যাতীন খ্রীস্ট ধর্মের ইতিহাস; ৫ম খণ্ড; পৃঃ ৩৮৯; সঃ ১৮৬৭।

[২] সাধারণতঃ মাজার সংলগ্ন যৎসামান্য জমি বা আম বাগান।

তাদের কার্যকলাপ ঠিক কম্যুনিস্ট ও রেড রিপাবলিক্যানদের মত। শুরু থেকেই তারা স্বমতের বিরোধী যেকোন মুসলমানের উপর উৎপীড়কের মত আবির্ভূত হয়েছে। তাদের ধর্মগুরু হিন্দুশিখদের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধারণ করেছেন ঠিক তেমনি ১৮২৭–৩০ সালে পেশোয়ারের জনৈক একগুঁয়ে মুসলিম গভর্নরের বিরুদ্ধেও তিনি অসি চালনা করেন। ১৮৩১ সালে কলকাতার চারপাশে যে কৃষক বিদ্রোহ হয় তখনও তারা মুসলমান ও হিন্দু জমিদারদের গৃহ সমান তছনছ করে। এমনকি তাদের হাতে মুসলমান ভূস্বামীরাই সর্বাধিক নির্যাতিত হয়েছে বলা চলে, কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে দস্যুরা কোন মুসলিম ভূস্বামীর কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে তাদের দলপতির সাথে জোর করে বিয়ে দিয়েছে। এদের সম্পর্কে পনের বছর পর যে সরকারী তথ্য বিবরণী প্রকাশিত হয় তা পড়লে পৃথিবীর যেকোন ভূস্বামী সক্রোধ অস্থিরতা প্রকাশ করবে। ঐ বিবরণীতে বলা হয়েছে ঃ 'এরা ছিল আশি হাজার লোকের এক বিরাট জনতা, যারা নিজেদের মধ্যে পূর্ণ সমতা দাবি করে, এবং এরা নিম্ন শ্রেণীর পরিবার থেকে উদ্ভূত।'

এমনকি এ ধরনের কোন ধর্মীয় উপদ্রব জমিদার বা সুবিধাভোগী শ্রেণীর কেউ সুনজরে দেখতে পারে না। অবশ্য বাংলায় একটা গোটা বাণিজ্যিক গোষ্ঠী (এরা খুবই বিত্তশালী ও শক্তিমান) তাদের পক্ষভুক্ত ছিল। চর্মকার হচ্ছে হিন্দু সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর লোক। হিন্দুদের পবিত্র গরু মারা গেলে চর্মকার তার অপবিত্র হাতে সেই গরুর চামড়া খুলে নিয়ে ব্যবসা করে লাভবান হয়। এরা এমন একটা জাতের লোক যারা আজন্ম অপবিত্র, ভদ্র সমাজের কাছে অস্পৃশ্য, এবং কোন সম্পদ বা সাফল্যই তাদেরকে সম্মানজনক স্তরে উঠাতে পারে না। এই অবমাননাকর অবস্থা সে একজন হিন্দু হিসেবে নির্বিবাদে মেনে নেয়। কোন অবস্থাতেই সে আর সমাজের উপর স্তরে উঠতে পারে না, সুতরাং এজন্য কোন চেষ্টাও সে করে না। সে যতই সৎ ও বিনয়ী হোক না কেন, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সে কখনও সম্মানজনক ব্যবহার পাবে না ; কাজেই সম্মান ছাড়াই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। গ্রামে অধিকসংখ্যক গরু মারা গেলে সে খুশী হয়, কারণ তাহলে অনেক বেশি চামড়া তার হাতে আসবে। আর গরুর মৃত্যুর হার খুব বেশি কমে গেলে সে বিষ প্রয়োগ করে মৃত্যুর হার কিছুটা বাড়িয়ে নিতে পারে। এ ধরনের হতভাগ্য লোকেরা কখনও খুচরো ব্যবসায়ের চেয়ে বেশি কিছু আশা করতে পারে না ; ফলে চামড়ার অতি লাভজনক পাইকারী ব্যবসায়টা মুসলমান

---

১. বাংলার পুলিশ কমিশনার মিঃ ড্যাম্পিয়ার প্রণীত রিপোর্ট, যা ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে। কিন্তু পবিত্র গরুর চামড়া নিয়ে ব্যবসা করাকে হিন্দুরা যে কত অপরাধজনক কাজ মনে করে, মুসলমানদের তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনই প্রয়োজন নেই। একারণে এটা মুসলমান চর্ম ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়েছে এবং এ থেকে তারা দেশের অন্যতম প্রধান ধনাঢ্য শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু হিন্দুরা তাদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং হিন্দুদের এই মানসিকতার প্রতিদানও তারা দিয়ে থাকে। তারা ভাল করেই জানে যে, ব্রাহ্মণরা কোন সময় কর্তৃত্ব পেয়ে গেলে তারাই হবে পৌত্তলিকদের হামলার প্রথম শিকার। কাজে কাজেই তারা পৌত্তলিক হিন্দুদেরকে পহেলা নম্বর দুশমন বলে মনে করে এবং এই অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্যই তারা ওয়াহাবীদের সবচেয়ে বেশি অর্থ সাহায্য করে।

কিন্তু যতই শক্তি ও বিত্তের অধিকারী হোক না কেন, এটাই ওয়াহাবীদের শক্তির একমাত্র উৎস নয়। ওয়াহাবীরা জোরালো ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালায় এবং ধর্ম ও রাজনীতি যেকোন দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা আবেদন করেছে সেটাই অশান্ত জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে এমন হাজার হাজার কর্মী আছে যাদের সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি এবং আবারও আনন্দের সাথে বলছি যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেয়াকেই জীবনে প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করে। এটা এমনই একটা বৈশিষ্ট্য যার জন্য পার্থিব লাভ-লোকসান নিয়ে ব্যাপৃত জনসাধারণ তাদেরকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখে। আদর্শ ওয়াহাবীরা নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভীতিমুক্ত এবং অন্যের সম্পর্কে ক্ষমাহীন। তার চলার পথ খুবই স্পষ্ট এবং কোন কিছুই তাকে দমিত করতে পারে না। বাংলার কোন এক কারাগারে বর্তমানে এমন একজন বৃদ্ধ আলেম আটক আছেন, যিনি সব দিক দিয়েই নিষ্কলঙ্ক জীবনের অধিকারী তবে তিনি ভয়ঙ্কর রাজদ্রোহী। গত ত্রিশ বছর যাবৎ তাঁর রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন এবং তিনিও জানতেন যে সরকার তাঁর মতলব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। ১৮৪৯ সালে তাঁকে সরকারীভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়। তারপর ১৮৫৩ ও ১৮৫৭ সালে তাঁকে উপর্যুপরি সতর্ক করা হয় এবং ১৮৬৪ সালে তাঁকে প্রকাশ্যে আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তলব করে শেষবারের মত হুঁশিয়ার করা হয়। কিন্তু এসব সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত না করায় ১৮৬৯ সালে তাঁকে নজরবন্দী করা হয়। এ জাতীয় তৎপরতা দমন করা খুবই অসুবিধাজনক। নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী নিষ্ঠার সাথে নিজ পথ অনুসরণকারী এই ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা কোন সরকারই গ্রহণ করতে চায় না এবং এ ক্ষেত্রে

কেবল অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে তাকে নজরবন্দী রাখা ছাড়া আর কোন বিকল্প সম্ভবতঃ নেই।

ওয়াহাবীদের মতবাদ প্রচার করা মোটেই সহজ কাজ নয়। প্রথমতঃ এ মতের অনুসারীদের বার্ষিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ওয়াহাবী তহবিলে দান করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করে এবং সীমান্তের প্রশিক্ষণ শিবিরে যারা অংশগ্রহণ করে তাদেরকে তো অত্যন্ত কঠিন ভাগ্য বরণ করে নিতে হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিচারে এই জাতীয় কর্মীরা যে সকল জবানবন্দী দিয়েছে তার চেয়ে দুঃখজনক আর কোন বিবরণ আমি পাঠ করিনি। বিচারকদের অভিমতের সারাংশ থেকে এ তথ্য জানা গেছে যে, ওয়াহাবী প্রচারকরা অত্যুৎসাহী যুবকদের, যাদের বয়স সাধারণত বিশ বছরের নিচে, রিক্রুট করে তাদের মধ্য থেকে হত্যাকার্যের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রুপ গঠন করে এসব যুবকদের পূর্ব বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে রিক্রুট করা হয়। এবং প্রায় ক্ষেত্রেই পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই তাদেরকে দলভুক্ত করা হয়। এভাবে তারা হাজার হাজার কৃষক পরিবারের মাঝে দুঃখ-দুর্দশার সঞ্চার এবং উদীয়মান তরুণ বংশধরদের পরিণাম সম্পর্কে সমগ্র পল্লীবাসীদের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। কোন ওয়াহাবী পিতার পক্ষে তার তরুণ বয়সের ছেলে কোন মুহূর্তে যে অদৃশ্য হয়ে যাবে না, তা বলা সম্ভবপর নয়। এভাবে গড়ে-উঠা যুবকদের একটা বড় অংশ মহামারী, দুর্ভিক্ষ অথবা যুদ্ধের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শিবির থেকে মুষ্টিমেয় যে কয়টি যুবক ফিরে আসতে পেরেছে তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্র দূরে হটিয়ে দেয়া হয়েছে। এ জাতীয় যুবকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট ভোগ করেছে এমন একজনের কথা এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে ঃ "আমি পাটনার খলিফার একজন সাগরেদ। দশ কি বারো বছর বয়সে খলিফার কাছে লেখাপড়া শিখার জন্য আমি রামপুর বোয়ালিয়ায় যাই (সাফীর গ্রামের অনতিদূরে দক্ষিণ বঙ্গের একটা শহর)। শিক্ষকরা একটা ধর্মযুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে এ কাজে অর্থ ও লোক-লস্কর পাঠাবার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। আমার বয়স যখন প্রায় পনের বছর সেই সময় আমাকেও জেহাদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। আবার পাটনা ও দিল্লী হয়ে (সীমান্তের শিবির থেকে প্রায় দু'হাজার মাইল দূরবর্তী স্থান) অকুস্থলে গমন করি। পাটনায় এক রাত আমি খলিফার কাছে অবস্থান করি। দিল্লী পৌছার পর আমার অন্যান্য সঙ্গীরা অকুস্থলে গমন করে কিন্তু আমি সেখানে থেকে যাই এবং একজন ধর্মগুরুর কাছে শিক্ষা লাভের জন্য দেড় বছর অবস্থান করি। অতঃপর সীমান্ত

শিবিরে গমনকারী একটা দলের সাথে আমি গুজরাট পর্যন্ত গমন করি। কিছু দিন পর সেখানে আগত আরেকটা দলের সহযাত্রী হয়ে আমি পার্বত্য অঞ্চলে উপস্থিত হই এবং সেখানে আমাকে আশ্বস্ত করে বলা হয় যে, ইমাম সৈয়দ আহমদ পুনরাভির্ভূত হয়েছেন। সেখানে আমি আট থেকে নয় হাজার লোক জমায়েত দেখতে পেলাম এবং তাদের নেতা হিসেবে যাকে দেখলাম তিনিই হচ্ছেন আমার সেই ওস্তাদ যার কাছে বারো বছর বয়সে আমি শিক্ষা লাভ করেছি (এবং এখন তিনি পাটনার খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন)। এখানে আমি বুঝতে পারলাম যে, কোন ঐশ্বরিক নেতার আবির্ভাব ঘটেনি এবং সকল ব্যাপারটাই একটা ছলনা। আমি এবং অন্যান্যরা রাগান্বিত হয়ে দিল্লী ফিরে আসি। এর পর আরবের একজন ধর্মগুরু দিল্লী আসেন। তিনি আমাদের আশ্বাস দেন যে, ঐশ্বরিক নেতার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে এবং তিনি এখন সিত্তানায় অবস্থান করছেন। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে পুনরায় জেহাদে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি দিল্লী থেকে যাত্রা করি। সিত্তানায় উপস্থিত হয়ে আমি ঐশ্বরিক নেতাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করি, কিন্তু কোন সদুত্তর পেলাম না। আমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে, আমরা আবার প্রতারিত হয়েছি। অতঃপর হামলার উদ্দেশ্যে একটি বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর আগমনের সময় আমি সেখান থেকে পালিয়ে দিল্লী চলে যাই। কিছুদিনের মধ্যে আমি আমার নিজের বাড়িতে ফিরে আসি।"[১]

এটা হচ্ছে একজন বিশিষ্ট কর্মীর বিবরণ, যে শেষ পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছে। কিন্তু যেসব কর্মী ব্যাধি, ঠাণ্ডা ও দারিদ্র্যের শিকার হয়ে অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ফিরে আসে তাদের বিবরণ আরো করুণ ; তবে এ বিষয়ে আমি আর কিছু উল্লেখ করব না। সরকার কর্তৃক আনীত মোকদ্দমার চেয়ে বরং একজন হতাশাগ্রস্ত মুজাহিদের সীমান্ত থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের ঘটনার দ্বারাই একটা জেলায় ওয়াহাবী মতবাদের ধ্বংসের পথ সুগম হয়েছে। যেসব ধর্মান্ধ যুবক ধর্মযুদ্ধে নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, একজন হতাশাগ্রস্ত মুজাহিদের প্রত্যাবর্তন তাদের মোহমুক্তি ঘটায় এবং এসব ঘটনার ফলে বহু নিষ্ঠাবান ওয়াহাবী বিদ্রোহ অবশ্য প্রয়োজন নয় এই মর্মে প্রদত্ত ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করে।

---

[১] ১৮৭০ সালের ১৫ই আগস্ট দিনাজপুরের জজ সাহেবের এজলাসে প্রদত্ত মোহাম্মদ আব্বাস আলীর জবানবন্দীর সংক্ষিপ্তসার। আমি যতদূর সম্ভব স্বগতোক্তি পরিহারের চেষ্টা করেছি।

এই ব্যাখ্যা বাংলার মুসলমানদের উপর গত কয়েক বছরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। ওয়াহাবীরা সকল শ্রেণীর লোকের উপর জিহাদে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক বলে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এখন অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে কোন লোককে গুরুতর ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে বাধ্য করা অথবা যোগ না দিলে ধর্মত্যাগী বলে দোষারোপ করা খুব কঠিন কাজ। আগে ওয়াহাবীদের কাজে সাহায্য করা বড় একটা ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ ছিল না ; কিন্তু শাসন কর্তৃপক্ষ গ্রেফতারের ক্ষমতা লাভের পর থেকে বিদ্রোহাত্মক কাজে সাহায্য করাও খুব মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কেবলমাত্র অতিরিক্ত ধর্মান্ধ ব্যক্তিই এই ঝুঁকি নিতে রাজী হবে। বিধবাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য বেশি এসেছে এবং যারা ধর্মযুদ্ধে আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তারাও মসজিদে গিয়ে জিহাদের কাজে চাঁদা দিয়েছে। পক্ষান্তরে বিধর্মী সরকারের ভয়ে যারা ধর্মের স্বার্থ পরিহার করেছে, গোঁড়া ধর্মান্ধরা তাদেরকে নিন্দা করেছে ; দলত্যাগীদেরকে তারা শুধুমাত্র কাপুরুষ ও স্বার্থপর বলে নিন্দা করে পরক্ষণেই আবার জিহাদে উস্কানী প্রদানের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করেছে— এবং এভাবেই সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোকেরা ইহকাল ও পরকাল দুইকূল রক্ষার চেষ্টায় আছে।

অতীতে বিত্তশালী মুসলমানরা এই জাতীয় অপবাদ নীরবে সহ্য করেছে। কিন্তু এখন গোটা মুসলমান যাজক সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ তাদের সমর্থনে এসে যাওয়ায় তারা এখন আত্মপক্ষ সমর্থনের শক্ত যুক্তি খুঁজে পেয়েছে। তারা এখন নীতিগতভাবে ওয়াহাবীদের জিহাদী মতবাদের বিরোধিতা করে রানীর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে যোগ দেয়া বাধ্যতামূলক নয় বলে দাবি করছে। গত কয়েক বছরে এদের যুক্তির সমর্থনে এক গাদা ফতোয়া হাজির করা হয়েছে। এমনকি ইংলণ্ডের রানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত একটা বিপজ্জনক দায়িত্ব থেকে ভারতীয় মুসলমানদের বিরত করার উদ্দেশ্যে মক্কার তিনজন শীর্ষস্থানীয় মুফ্‌তির[১] ফতোয়া পর্যন্ত হাজির করা হয়েছে।

এই সন্তোষজনক ফলশ্রুতি লাভের জন্য আইনজীবীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বড় একটা দেখা দেয়নি। কোরআনের সোজা অর্থ হচ্ছে এই যে, ইসলামের অনুসারীরা গোটা দুনিয়াকে স্বমতে আনবে ; বিজিতদের

---

[১] হানাফী, শাফী ও মালেকী সম্প্রদায়ের তিনজন মুফ্‌তি। চতুর্থ হচ্ছে হাম্বলী সম্প্রদায়, কিন্তু মক্কায় তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য বলে সেখানে এই সম্প্রদায়ের কোন মুফ্‌তি নেই।

হয় স্বধর্মে দীক্ষিত করবে নতুবা এমনভাবে অধীনস্থ করবে যেটা ঠিক গোলামীর অথবা মৃত্যুর সমতুল্য। অবশ্য, কোন আধুনিক জাতির প্রয়োজন মেটাবার জন্য কোরআন লিখিত হয়নি ; আত্মকলহে ক্ষতবিক্ষত আরবীয় উপজাতির উপর যুদ্ধংদেহী বিজয়ী সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব কায়েমের স্থানীয় প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকেই কোরআন লেখা হয়েছে। বহু যুগের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট পরবর্তীকালের বিদ্বান ব্যক্তিদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা কোরআনের যুদ্ধংদেহী ধর্মান্ধ ভাবধারা অনেকটা পরিমার্জিত হয়েছে; এবং এর একচোখা ধর্মান্ধ ভাবোচ্ছ্বাস থেকে কোনরূপ একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রদর্শনও গড়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য, পবিত্র যুদ্ধের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মহামান্য পয়গম্বর যেসব কথা বলে গিয়েছেন, মুসলমানদের ন্যায়শাস্ত্রে তা অবিকৃতভাবে সংকলিত হয়েছে। হিদায়া নামক বিখ্যাত ভারতীয় গ্রন্থের একটা গোটা অধ্যায়ে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিশিষ্ট ভারতীয় পণ্ডিতরা এই প্রয়োজনীয়তাকে জোরালো সমর্থন দান করেছেন। কিন্তু এই সব আলোচনায়, যা ভারতীয় মুসলমানদের মনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, কোরআনের অনুশাসন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয়নি এবং সব মতের প্রবক্তারা বিষয়টাকে পবিত্র গ্রন্থের আওতাবহির্ভূত করে আইনবিদদের ফতোয়ার বিষয়ভুক্ত করে ফেলেছেন।

মুসলমান ও আমাদের জন্য এটা আনন্দের বিষয় যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ শান্তি ও আনুগত্যের পাল্লা ভারী করেছে। বলা বাহুল্য যে, ঐ ফতোয়াগুলো যদি বিদ্রোহের পক্ষ জোরদার করত তবে তার পরিণাম হত অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিরূপ বিপজ্জনক ভিত্তির উপর ভারতে আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, উপরোক্ত প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সরকারের বিরোধিতার জন্য উত্থিত ঐ সিদ্ধান্তগুলোর ফলশ্রুতি হিসেবে এমন রক্ষণশীল রক্তাক্ত বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় যা বিশ্ববাসী বিস্ময়ের সাথে অবলোকন করেছে। এমনকি জৌনপুরের মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদদের সিদ্ধান্তের ফলে আকবরও প্রায় ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার উপক্রম করেছিলেন ; তারা ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, আকবরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান শাস্ত্রসম্মত। এর ফলে বাংলায় বড় রকমের সামরিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং সে সময় কতিপয় দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশের ভূস্বামীদের প্রজার পরিবর্তে জায়গীরদার খেতাবে ভূষিত করা হয়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় একটি শহর থেকে 'দিল্লীর

শাসন' ঘোষণাকালে একজন মুসলমান বিদ্রোহী প্রথম যে কাজটি করেন সেটা হল ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণার জন্য স্থানীয় মুসলিম ধর্মগুরুর কাছে ফতোয়া চেয়ে পাঠানো। ইউরোপেও দেখা গেছে, তুর্কীর সুলতান যখনই অস্ট্রীয় সীমান্তের খ্রীস্টান প্রদেশগুলোর বা বুলগেরিয়ার উপর স্বীয় দলবলকে লেলিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন তখনই তিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সুফল ও পুরস্কার সম্পর্কে ইসলামী আইনবিদদের ফতোয়া কাজে লাগিয়ে সৈন্যদের ধর্মান্ধতায় উসকানী প্রদান করেছেন। খ্রীস্টানরাও ঠিক একই কায়দায় কাজ করেছে এবং ধর্মযুদ্ধের শেষ পর্বে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করা হয়। মুসলমান দেশসমূহে বিধর্মীদের বিতাড়নের জন্য ধর্মীয় ফতোয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রকারদের সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার এবং ১৮৬৭ সালে কনস্টান্টিনোপলে অবস্থানকালে আমি দেখেছি যে, সেখানে শাস্ত্রকারদের সিদ্ধান্ত খুব সহজে পাওয়া গেছে। অতি সম্প্রতি মিসরের পাশা এবং তুর্কীর সুলতান সেইসব ধর্মান্ধ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন, যারা বিশ্বাস করে যে, 'আমীরুল মুমিনিন' পবিত্র শাস্ত্রীয় বিধি লংঘন করেছেন এবং তার ফলে তাঁকে এবং তাঁর অনুগত সেনাবাহিনীকে বিনাশ করাই তাদের পবিত্র কর্তব্য। সুতরাং এটা অতীব আনন্দের বিষয় যে, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফতোয়াটি যে জেলা[১] থেকে ঘোষিত হয়েছিল সেই জেলাতেই এমন আর একজন মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদ[২] জন্মগ্রহণ করেছেন যিনি বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিরুদ্ধে জোরালো সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

মুসলমানদের দু'টি প্রধান মাযহাব শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায় প্রশ্নটির সমাধানের জন্য বিগত কয়েক মাসে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, আমি এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করতে চাই।

শিয়ারা অন্যান্য সব বিষয়ের মত রানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারেও বিশ্বাসীদের কর্তব্য সম্পর্কে নিজস্ব পৃথক মতামত গ্রহণ করেছে। এটা এমন একটা মাযহাবের অভিমত যাদের সংখ্যা ভারতে খুব নগণ্য এবং যারা অতীতের সকল ধর্মান্ধ মুসলমান সরকারের আমলে নির্যাতনের শিকার হয়েছে,

---

১. জৌনপুর।

২. ১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর কলকাতার মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিতে প্রদত্ত মৌলবী কেরামত আলীর বক্তৃতা।

এমন নির্যাতন যা কোন বৃটিশ শাসক কখনও অনুমোদন করবে না। ধর্মযুদ্ধের প্রশ্নে কিছুদিন আগে তারা যে ক্ষুদ্র ফার্সী প্রচারপত্রটি[1] বিলি করে তা সুন্নীদের মতামতের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। সুন্নীরা হচ্ছে ভারতীয় মুসলমান জনসমষ্টির দশ ভাগের নয় ভাগ। কিন্তু অযোধ্যার সাবেক নওয়াবের অন্যতম প্রধান ধর্মগুরুসহ শিয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট শাস্ত্রকারদের সাথে পরামর্শক্রমে শিয়া মাযহাবের উপরোক্ত বিশিষ্ট আইনশাস্ত্রবিদ যে ফতোয়া প্রণয়ন করেছেন তা' দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। সংখ্যায় অল্প হলেও শিয়াদের মধ্য থেকে ভারতীয় ইতিহাসের বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন ; এবং গত চার বছর যাবত প্রতিটি জেলায় ধর্মযুদ্ধে মুসলমানদের কর্তব্য সম্পর্কে যে সকল আলোচনা চলেছে সে সম্পর্কেও শিয়ারা নিজস্ব স্পষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করেছে।

শিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীদের ১২জন ইমামের উপর বিশ্বাস আনতে হয়, আল্লাহর রাসূলের বংশ থেকেই যার প্রধান ইমামের উৎপত্তি—এটাই হচ্ছে শিয়াদের মৌলিক নীতি। পবিত্র দায়িত্ব সম্পূর্ণ করবার জন্য উক্ত ইমামের একজন এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু পাপাচারপূর্ণ লৌকিক জগতের অগোচরেই তিনি বর্তমানে অবস্থান করছেন। এ জগতে তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ব পাপ-তাপে দগ্ধ হতে থাকবে এবং বিশ্বাসীদের উপর ঘৃণ্য সুন্নী, খ্রীস্টান ও অন্যান্যদের নিপীড়ন চলতে থাকবে। কিন্তু প্রত্যাশিত ইমামের আশীর্বাদবাহী এমন একজন মহান ধর্মগুরু আবির্ভূত হবেন যাঁর আগমনের পর সকল অন্যায়ের অবসান হবে এবং সকল মানুষ আল্লাহর ধর্মে দীক্ষিত হবে। কিন্তু এটা না ঘটা পর্যন্ত বিশুদ্ধ জগত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পার্থিব প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া কিংবা বিদ্রোহ বা যুদ্ধ করে কোন লাভ হবে না। এই মতের বিরুদ্ধবাদীদের শিয়ারা ধর্মদ্রোহী বলে নিন্দা করে। শিয়া সম্প্রদায়ের আলোচ্য ফতোয়াটিতে বলা হয়েছে ঃ বর্তমানে মুহম্মদের (দঃ) অনুশাসন[2] সম্পর্কে অজ্ঞ এবং সত্য উদঘাটনে অক্ষম একদল অবিবেচক লোক রাজদ্রোহের উসকানী দিয়ে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এদেশে, হিন্দুস্থানে, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে মাত্র দু'টি -মাযহাব রক্ষণশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে—এরা হচ্ছে,

---

[1] মুনশী আমীর আলী খানবাহাদুর প্রণীত (কলকাতা, ১৮৭১) 'জিহাদ সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায়ের ধারণা ও বিশ্বাস'।

[2] সূরা

শিয়া ও সুন্নী। মুসলমানদের অবশিষ্ট মাযহাবগুলো, তা' তারা ওয়াহাবী বা ফারায়েজী যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তাদেরকে বিশ্বাস করা যায় না।' জিহাদ[১] শব্দের তিনটি অর্থ বিশ্লেষণের পর আলোচ্য পুস্তিকায় বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মযুদ্ধকে অর্থবহ ও আইনসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সাতটি শর্ত পূরণ করা জিহাদের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। "প্রথমত, যদি সত্যিকার ইমাম উপস্থিত হয়ে জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন। দ্বিতীয়ত, যখন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, যখন খোদাদ্রোহী এবং আল্লাহর দুশমনদের[২] বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালিত হবে। চতুর্থত, ধর্মযুদ্ধের প্রতিটি যোদ্ধা যখন জিহাদের মর্ম সম্পর্কে সম্যক যুক্তির অধিকারী হবেন, এবং তিনি অপ্রকৃতিস্থ বা অস্থিরমতিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি হবেন না ; এবং যদি তিনি অসুস্থ বা অন্ধ অথবা খোঁড়া না হন। পঞ্চমত, যখন তিনি জিহাদে যোগদানের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি নেবেন। ষষ্ঠত, যখন তিনি ঋণমুক্ত হবেন। সপ্তমত, নিজ পরিবারের ভরণপোষণ চালানো এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া-আসা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের মত পর্যাপ্ত অর্থ যদি তার থাকে।"

রানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার যৌক্তিকতা এবং তার সাফল্য বা ব্যর্থতার প্রশ্ন বাদ দিলেও ধর্মযুদ্ধের জন্য শিয়াদের প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে ইমামের উপস্থিতি। কিন্তু শিয়া মতবাদ অনুযায়ী ঐ ঐশ্বরিক নেতা এতদিন যাবত দুনিয়ার লোক সমাজের দৃষ্টির অগোচরে অবস্থান করছেন। তিনি এখনও পর্যন্ত লোকসমাজে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বাসীদের সৈনাপত্য গ্রহণের কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তাঁর আগমন না ঘটা পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধ আরম্ভের যেকোন উদ্যোগ অযৌক্তিক ও গোনাহর কাজ বলে বিবেচিত হবে। শিয়াদের পুস্তিকাটিতে বলা হয়েছে ঃ "সেই পুণ্যবান ইমামের আবির্ভাব কখন ঘটবে তা' শুধু সর্বজ্ঞ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। কিন্তু ইমামের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়া রক্তপাত ঘটানো শিয়াশাস্ত্র অনুযায়ী কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমামের

---

১. (১) জিহাদ-ফি-নিল্লাহ্ — আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হওয়া।
(২) জিহাদ-বা-নফস্-ই-আমরা — রিপু দমন করা, যাতে করে অন্যায় কার্যাবলী থেকে বিরত হয়ে সত্য কাজে সময় নিয়োজিত করার অভ্যাস আয়ত্ত হয়।
(৩) জিহাদ-ফি-দীন — অর্থাৎ মুসলিম শাস্ত্র মোতাবেক বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ।

২. হার্ব-ই-কাফের।

ঐশ্বরিক নির্দেশ ব্যতীত যারা বিদ্রোহ করবে তারাই বিদ্রোহী এবং গোনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে।"

সর্বশেষ বাক্যটি সুন্নীদের উপর একটি আঘাত বিশেষ। পবিত্র ইমামের উপস্থিতি ছাড়াই সুন্নীরা বারবার ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তাদের সাথে শিয়াদের ধর্মীয় নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের পুরনো বিবাদ রয়েছে। অবশ্য শিয়াদের পুস্তিকায় অত্যন্ত সরলভাবে গোটা দুনিয়াকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার শেষ আকাংখা ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এ বক্তব্য তাদের বিরোধী মাযহাবের অন্তর্দাহ সৃষ্টি না করে পারে না। শেষ অবধি সত্য ধর্ম ইসলামই যে বিজয়ী হবে এটা ভারতীয় সুন্নী ও শিয়ারা সমভাবে বিশ্বাস করে। তবে উভয়ের বিশ্বাসের মাঝে কিছুটা পার্থক্য আছে। সুন্নীদের মত অনুসারে শেষ জামানায় পয়গম্বরের নির্দেশাবলী পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করে তারা গোটা দুনিয়াকে ইসলামে দীক্ষিত করবে। পক্ষান্তরে শিয়াদের মত হল দুইটি প্রধান ধর্ম খ্রীস্টান ধর্ম ও ইসলামের সম্মিলনীর (যদিও একদেশদর্শীভাবে) মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় আসবে। শেষ জামানায় স্বধর্ম বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করবে এটা প্রায় সব ক'টি মহান ধর্মের অনুসারীদের স্বপ্ন। হিন্দুদের একটা শাস্ত্রগ্রন্থ[১] আছে এবং এতে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে একদিন আসবে যখন সব মানুষ এক ধর্মের অনুসারী হবে এবং বর্ণভেদ বলে কিছু থাকবে না। এমনকি বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মান্ধদের বিজয়ের সময় সংকলিত[২] বিষ্ণু পূরাণও স্বীকার করে যে, শেষ লৌহ-যুগে (যেখান থেকে আমরা এখন এসেছি) মানুষের আত্মার মুক্তি আসবে তবে ধর্ম বা জাতিগত কারণে নয়। বরং নিষ্পাপ জীবনযাপন এবং নিষ্কলঙ্ক কার্যকলাপের ফলশ্রুতি হিসেবেই আত্মার মুক্তি আসবে। শিয়ারাও যে শেষ বিজয়ের কথা বলে, তবে সেটা ঘটবে খ্রীস্টানদের সাথে একত্রিত হয়ে অর্থাৎ খ্রীস্টানরা সব শিয়া হয়ে যাবে, এবং সম্ভবত শেষ ইমামের নেতৃত্ব অস্বীকারী সুন্নীদের রক্তস্রোতের মধ্য দিয়েই সেটা ঘটবে। শিয়াদের পুস্তিকায় বলা হয়েছে ঃ "আমাদের মুসলমানী আইনশাস্ত্রে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপরোল্লিখিত ইমামের আবির্ভাবের সময় ঈসা (আঃ) চতুর্থ আসমান থেকে দুনিয়ায় নেমে আসবেন এবং দুই মহানায়কের মধ্যে শত্রুতার পরিবর্তে মৈত্রীই গড়ে উঠবে।"

এটা আনন্দের বিষয় যে, আমাদের মুসলমান প্রজাদের মধ্যে এমন একটা ছোট সম্প্রদায় আছে যাদের প্রাথমিক ধর্মীয় অনুশাসন মোতাবেক রানীর

---

[১] ভবিষ্য পূরাণ।

[২] Circ. AD 1050.

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অন্যান্য মুসলমানরা যাই করুক না কেন, মুষ্টিমেয় ভারতীয় শিয়ারা ঘোষণা করেছে যে, তারা অস্ত্রবল প্রয়োগ করে আমাদেরকে লিঙ্গাগ্রছেদন করতে অথবা দাসত্ব বরণ এই দু'টি অপমানকর বিকল্পের যেকোন একটি বেছে নিতে বাধ্য করবে না। এই আশ্বাস অভিনন্দনযোগ্য হলেও আমি এটা বিস্মৃত হতে পারি না যে, শিয়ারা এমন একটা ধর্মীয় সমঝোতার[১] নীতিতে বিশ্বাসী বলে দাবি করে যার ফলে আমাদের মত বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রচেষ্টা দুর্বল না হয়ে পারে না। এক পারস্য ছাড়া দুনিয়ার সর্বত্রই এই সম্প্রদায়টি নিপীড়নের শিকার হয়েছে এবং তার ফলে তারা আত্মরক্ষার এমন একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে যেটা বিদেশীদের চোখে নিজের ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগের সমতুল্য বলেই মনে হয়। এইভাবে একজন শিয়া নিজেকে সুন্নী বলে পরিচয় দিয়ে মক্কা অতিক্রম করলেও এতে তার ধর্মাত্মা অপবিত্র হয় না। সুন্নী নিগ্রহকারীর জেরার সম্মুখীন হলে তারা নিজেদের আলাদা বিশ্বাসের কথা অস্বীকার করতে দ্বিধা করে না। চরম নিপীড়নের শিকার হলে (যেমন সম্প্রতি সিরিয়ায় হয়েছে এবং মাঝে মাঝে ভারতে হয়ে থাকে) এই সাধুতার ছলনা নীতি অনুসরণ করে তারা নিজেদের পরম প্রিয় নীতিসমূহ এমনকি বারো ইমামের প্রতি বিশ্বাসের কথাও অস্বীকার করে। কিন্তু বৃটিশ শাসনে তাদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং নির্যাতনের ফলে নিজের বিশ্বাসের প্রতি ছলনা করার দুর্ভাগ্য থেকেও তারা রেহাই পেয়েছে। বিদ্রোহের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করে তারা বর্তমানে যে ঘোষণা প্রচার করেছে সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করা হয়েছে এবং সে ঘোষণাটা যে মুদ্রাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেটাও আনন্দের বিষয়। এ ঘোষণাটা শিয়াদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এসেছে, কাজেই এটা তাদের গোটা সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্য পালনীয় বলেই আমরা মনে করি। এমনকি এ ধরনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রচারিত না হলেও শিয়ারা সব সময় রাজানুগত্য প্রকাশ করে এসেছে, কারণ তারা জানে যে, হিন্দু অথবা সুন্নী মুসলমানরা ভারতে বিশেষ কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়ে উঠলে শিয়াদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হবে। তাছাড়া চূড়ান্ত বিজয়ের সময় সুন্নীরা ভুলে যাবে না যে, ইসলামের চরম বিজয় মুসলমান ও খ্রীস্টানরা সমভাবে ভাগাভাগি করে নেবে এই মর্মে গৃহীত শিয়াদের আইনগত সিদ্ধান্তটি অযোধ্যার নওয়াবের প্রাসাদ থেকেই ঘোষিত হয়েছে। শিয়াদের এ পুস্তিকাটি ওয়াহাবী ও

---

[১] তাকিয়াহ: অর্থাৎ 'আত্মরক্ষা'; 'সাধুতার ছলনা'।

সুন্নীদের মনে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সে কথা স্মরণ করে সাবেক নওয়াব এবং তাঁর সমমতাবলম্বীদের আনুগত্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে।

এবার আমি সংখ্যাগুরু মাযহাবের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করব। সুন্নীরা ভারতীয় মুসলমানদের সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বলেই তারা সবচেয়ে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, রানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাদের কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নেই। এ ব্যাপারে তারা দু'টো স্পষ্ট আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এ বিষয়ে সুন্নীদের সকল মতামত একত্রিত করে পুস্তকাকারে জোরালো ভাষায় সারাংশ রচনা করেছে কলকাতার মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি। যারা বাঙ্গালী মুসলমানদের বুদ্ধিমত্তাকে খাটো করে দেখে এবং যারা মনে করে যে, সরকারের অধীনে বিচার বিভাগে চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা বাঙ্গালী মুসলমানদের নেই, তাদেরকে আমি আলোচ্য পুস্তিকাটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। এই পুস্তিকাটিতে আইনের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক এবং এতে একই সূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে একত্রিত করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাঞ্ছিত একক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উত্তর ভারতীয় আইনশাস্ত্রবিদরা অব্যক্তভাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে ভারত শত্রুদেশ[১] এবং তারপর সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এখানে ধর্মযুদ্ধ অপ্রয়োজনীয়। কলকাতার আইনশাস্ত্রবিদরা ঘোষণা করেছেন যে, ভারত ইসলামী দেশ[২] এবং সে কারণে এখানে ধর্মযুদ্ধ বেআইনী বলে তাঁরা ঘোষণা করেছেন। উভয় সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিকে অবশ্যই বিত্তশালী মুসলমানদের জন্য সন্তোষজনক বলে মেনে নিতে হবে, কারণ, এটা একদিকে তাদেরকে সীমান্তের ধর্মান্ধ শিবিরে সাহায্য দানের ধ্বংসাত্মক পরিণতি ও আমাদের সন্তুষ্টিবিধানের দ্বৈত সমস্যা থেকে রক্ষা করেছে, এবং এতে করে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আইন ও শাস্ত্রকারদের যেমন রাজানুগত্য প্রদর্শনের কাজে তেমনি রাজদ্রোহের প্রয়োজনেও সমান ব্যবহার করা যায়।[৩]

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলো অবস্থাপন্ন মুসলমানদের চেয়ে বরং ধর্মোন্মত্ত জনসাধারণের স্বার্থেই বেশি প্রয়োজন।

---

[১] দারুল-হার্ব অর্থাৎ শত্রুদেশ।

[২] দারুল-ইসলাম।

[৩] পুস্তিকার শিরোনামা হচ্ছেঃ "কলকাতার মোহামেডান ল' সোসাইটির অধিবেশনের সারাংশ, ২৩শে নভেম্বর, ১৮৭০"। বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের দায়িত্ব সম্পর্কে মুসলিম আইনশাস্ত্রের উপর জৌনপুরের মৌলভী কেরামত আলীর বক্তৃতা, কলকাতা ১৮৭১, অবলম্বনে সংকলিত।

১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে শাসন বিভাগকে গ্রেফতারের যে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে বিদ্রোহের চেষ্টা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে বাধ্য। উক্ত ক্ষমতাবলে ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃত রাজদ্রোহমূলক তৎপরতা দমনে শাসন বিভাগ এখন পর্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী। গত বিশ বছরে বাংলার এবং মাঝে মাঝে পাঞ্জাবের সীমান্তে বিদ্রোহের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা' উক্ত রেগুলেশনের ক্ষমতাবলে এখন দমন করা সহজসাধ্য হবে। তাই সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলো, এমনকি রাজদ্রোহীদের মধ্যে যারা বিত্তবান তারাও এখন নিজেদের হাত মুছে ফেলার একটা উপায় খুঁজে পাওয়ায় আনন্দিত হয়েছে। এসব লোক গুরুতর অসুবিধাজনক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ হিসেবে উপরোল্লিখিত আইনগত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবে। তারা এ সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতে যাবে না, বরং দুরূহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে একে সানন্দে গ্রহণ করবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, কলকাতার মোহামেডান সোসাইটি স্বদেশবাসীদের এবং আমাদের স্বার্থ সমভাবে রক্ষা করেছে এবং এজন্য সোসাইটির সেক্রেটারী মৌলবী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর বিশেষ প্রশংসার পাত্র। সুন্নীদের দৃষ্টিতে আমাদের শাসনে ভারতের ধর্মীয় মর্যাদা যে রকমই প্রতিভাত হোক না কেন, তারা এখন উপলব্ধি করবে যে, উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোন বাধ্যবাধকতা তাদের আর নেই। সুন্নীরা কি মনে করে যে, ভারত এখনও ইসলামী দেশ ? পুস্তিকায় ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠাটা পড়লে তারা দেখতে পাবে যে, উপরোক্ত কারণে রানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আইন-বহির্ভূত কাজ। তারা কি মনে করে যে, ভারত শত্রু দেশে পরিণত হয়েছে ? একাদশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ পাদটীকা পড়লে তারা দেখতে পাবে যে, একই কারণে বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে অবাঞ্ছিত কাজ।[১]

সুতরাং আলোচ্য পুস্তিকাটি প্রকাশ করে মৌলবী আবদুল লতিফ যে বিরাট উপকার করেছেন তাকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা থেকে আমি বিরত থাকব। কিন্তু কলকাতার মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির অভিমতকে

---

১. আলোচ্য পরিচ্ছেদের বর্তমান অংশে এবং অন্যান্য স্থানে আমি যেসব নিবন্ধ ব্যবহার করেছি সেগুলো কলকাতার ইংলিশম্যান পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। উপর্যুপরি আমার এ মতামতগুলো প্রকাশের জন্য আমি পত্রিকার সম্পাদকের সহৃদয়তার কাছে ঋণী থাকব। মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যায় কার্যাবলী এবং তাদের অসুবিধাগুলো দূরীকরণ সম্পর্কে আমার মতামত এসব নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

যদি আমরা ভারতীয় মুসলমানদের অভিমত বলে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করি তবে সেটা একটা গুরুতর রাজনৈতিক ভ্রান্তি হবে। চরম মতবাদের ওয়াহাবীরা কোন যুক্তি মেনে নেবে বলে আশা করা যায় না ; তথাপি ধর্মভীরু মুসলমানদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের পবিত্র শরিয়তের সত্যিকার প্রামাণিক ব্যাখ্যা অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হবেন।

কোন লোকের বিশ্বাস এবং বাস্তব কাজের মধ্যে সব সময়ই একটা ফাঁক থেকে যায়, বিশেষ করে বিশ্বাসকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে গেলে সে যদি রাজদ্রোহের ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হয় তখন এ ফাঁকটা অনিবার্য হয়ে ওঠে। তবে ভাল লোকেরা সব সময়ই বিশ্বাস ও কাজের মধ্যেকার ফাঁকটা দূরীকরণের চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর লোকেরা এতদিন ধর্মান্ধ ওয়াহাবীতে পরিণত না হয়ে বরং সরল মনের ধর্মযুদ্ধকে একটা বিরক্তিকর কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। এরাই সীমান্তের বিদ্রোহী শিবিরকে এতদিন অর্থ সাহায্য করে এসেছে এবং এখন এদেরকে শান্তি ও রাজানুগত্যের পক্ষে টেনে আনা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি যে, সে সব ধর্মান্ধ মুসলমানদের মতামতের উপর, যারা ধর্মীয় দায়িত্বপালনকে জীবনের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে এবং ভয়-ভীতি ও আরাম-আয়েশ কোনটাই যাদের মনে দাগ কাটতে পারে না, সুন্নীদের আলোচ্য সিদ্ধান্তগুলো কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে তা ভালভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। কারণ এটা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, আমাদের মুসলমান প্রজাদের একটা বড় অংশ উপরোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এক শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল ধরে তারা বিদ্রোহী সেনাবাহিনী হিসেবে কাজ করেছে। প্রথমে রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে এবং পরে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের বিরুদ্ধে। সুদূর বঙ্গ প্রদেশেও তারা সীমান্ত শিবিরের জন্য দলে দলে যোদ্ধা সংগ্রহ করেছে। প্রতিটি গ্রাম, এমনকি প্রায় প্রত্যেক পরিবার তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যুদ্ধের কাজে সাহায্য করেছে। অসন্তুষ্ট পথভ্রান্ত রাজদ্রোহীরা দলে দলে আমাদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ; আদালতগুলো একের পর এক নতুন নতুন দল নায়কদের দ্বীপান্তরে পাঠানোর আদেশ দিয়েছে ; কিন্তু এ সত্ত্বেও সীমান্তের ইসলামী শিবিরে যুদ্ধ করার জন্য সারা দেশ জুড়ে লোকেরা অর্থ ও জনবল দিয়ে সাহায্য করেছে এবং এভাবেই খ্রীস্টান শাসনের বিরুদ্ধে তাদের রক্তক্ষয়ী উদ্যম অব্যাহত থেকেছে।

আমি দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই সব অগণিত বিপজ্জনক লোকের উপর কলকাতা সোসাইটির সিদ্ধান্ত আদৌ কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। অবশ্য, ধর্মযুদ্ধের বিরুদ্ধে পুস্তিকাটি দু'টি স্পষ্ট সীমারেখা আরোপ করেছে ; প্রথমত, সোসাইটির নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয়ত, উত্তর ভারতের আইনশাস্ত্রবিদদের সিদ্ধান্ত। শেষোক্তটি প্রতিক্রিয়ামূলক বক্তব্য হিসেবে সংযোজিত হলেও ইতিপূর্বে তা' পৃথকভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এখানে আমি দেখাব যে, এটা বিদ্রোহের বিরুদ্ধে মুসলমান শাস্ত্রের সত্যিকার প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করেছে।

প্রথমত, পুস্তিকাটির বিজ্ঞ মুসলমান প্রণেতারাই শুধু দেখাতে পারেন যে, তাঁদের যুক্তি কোনখানে ব্যর্থ হয়েছে। ভারত একটা ইসলামী দেশ[১] এটা প্রমাণ করাই পুস্তিকার উদ্দেশ্য এবং 'সে কারণে' মুসলমান প্রজাদের জন্য বিদ্রোহ করা বেআইনী। উল্লেখ্য যে, পুস্তিকার প্রথম পাতার আলোচ্য মৌল অংশে 'সে কারণে' শব্দটা বাদ পড়ে গেছে। আরো উল্লেখ্য, মক্কার আইনশাস্ত্রবিদ এবং মৌলবী আবদুল হক, এই দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে শুধু এটাই বলা হয়েছে যে, ভারত ইসলামী দেশ ; কিন্তু সে কারণে বিদ্রোহ বেআইনী একথাটা তাঁরা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, মুসলমান শাস্ত্রের কঠোর বিধান অনুসারে বিপরীত সিদ্ধান্তই সঠিক বলে বিবেচিত হবে এবং মক্কার আইনশাস্ত্রবিদরা তাঁদের মতামত প্রদানের সময় এটা ভাল করেই জানতেন। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, ভারত ইসলামী দেশ ; কিন্তু সে কারণে সরকারী ক্ষমতা জবরদখলকারী বিধর্মীদের, যারা সাবেক মুসলমান শাসকদের ধর্মীয় ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিনষ্ট করার জন্য শত প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে বিতাড়নের জন্য যুদ্ধ বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তাঁরা সাধারণ মুসলমানদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।[২]

---

১. দারুল-ইসলাম।

২. পরিশিষ্ট–১, মক্কা সিদ্ধান্ত দেখুন।

পুস্তিকায় এই যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে যে, ভারত এখনও একটি ইসলামী দেশ (দারুল-ইসলাম), কারণ মুসলমান শাসনামলে তাই ছিল এবং বর্তমানে বিধর্মীদের দ্বারা বিজিত হলেও যে তিনটি কারণে এটা শত্রুদেশে (দারুল -হার্ব) পরিণত হতে পারত তা অনুপস্থিত রয়েছে। মুসলমান আইনশাস্ত্রের সর্বপ্রধান শাস্ত্রকার আবু হানিফা উক্ত তিনটি কারণ উল্লেখ করে গিয়েছেন। কিন্তু পুস্তিকায় এই প্রাচীন ও সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত শাস্ত্রকারের কিতাব থেকে কারণ তিনটি গ্রহণ না করে আওরঙ্গজেবের আমলের ফতোয়া-ই-আলমগীরী থেকে তা নেয়া হয়েছে। প্রথমোক্তটির সাথে শেষোক্তটির মৌলিক পার্থক্য আছে এবং এটা নিঃসন্দেহে তর্কাতীত বিষয় যে, আবু হানিফা ও অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রকারদের বর্ণিত শর্তগুলো ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং রক্ষণশীল মতানুসারে ভারত একটি শত্রুদেশ। নিম্নে এতদসংক্রান্ত ইসলামী শাস্ত্রীয় আইনের দুটি সিদ্ধান্তই আমি তুলে ধরছি যাতে পাঠকরা স্বাধীনভাবে তার অর্থ বিচার করে দেখতে পারেন ঃ

তিনটি শর্ত, যার ফলে একটা ইসলামী দেশ দারুল-হার্ব বা শত্রুদেশে পরিণত হয়

আলোচ্য পুস্তিকার ৩য় পৃষ্ঠায় 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' থেকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ

১। যখন বিধর্মীদের শাসন নির্বিচারে জারি করা হয় এবং ইসলামের অনুশাসন পালন করা যায় না।

২। যদি দারুল-হার্বভুক্ত কোন দেশের সীমান্তে দেশটির অবস্থান হয়ে থাকে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশটি ও দারুল-হার্বভুক্ত দেশের মধ্যেকার কোন বিষয়ে দারুল-ইসলামের কোন শহর থেকে হস্তক্ষেপ না করা যায়।

৩। কোন মুসলমান যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না ; এবং কোন জিম্মি (মুসলমান শাসনের শর্তাবলী স্থায়ীভাবে মেনে চলার শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ বিধর্মী) যখন ইসলামী শাসনে যেসব শর্ত মেনে চলেছে তা আর মানতে পারছে না।

সিরাজিয়া ইমাদিয়াসহ সকল প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতানুসারে ঃ—

১। বিধর্মীদের শাসন যখন নির্বিচারে জারি করা হয়।

২। দেশটা যদি দারুল-হার্ব-এর এতটা সন্নিহিত হয় যে, তার এবং দারুল-হার্ব-এর মাঝে আর কোন দারুল-ইসলাম থাকে না এবং তাতে দারুল ইসলাম থেকে ঐ দেশে সাহায্য আসার কোন উপায় না থাকে।

৩। যখন মুসলমানরা ও জিম্মিরা আমান-ই-আউয়াল (একটি বিশেষ অর্থবোধক শব্দ যার অর্থ পরে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে) ভোগ করতে পারে না।[১]

অধিকতর প্রামাণ্য প্রাচীন কিতাবে উল্লিখিত তিনটি শর্ত ভারতের বেলায় প্রযোজ্য।[২] প্রথমটি সম্পর্কে বলা যায় যে, ফতোয়া-ই-আলমগীরী থেকে এমন

---

[১] সুন্নী পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য আমি যে সকল কিতাব এবং ফতোয়া ও যুক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছি তজ্জন্য আমি কলকাতা মোহামেডান কলেজের প্রফেসর ব্লকম্যানের কাছে ঋণী। ভারত সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য প্রফেসর ব্লকম্যান এখনও ইউরোপে একজন ভারত সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরূপে সমাদৃত।

[২] আবু হানিফার মতে উপরোক্ত তিনটি শর্ত পূরণ হলেই তবে কোন ইসলামী দেশ শত্রুদেশে পরিণত হবে। তার দুই শিষ্য (সাহেবান) ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম ইউসুফের মতে তিনটির মধ্যে যে-কোন একটি শর্ত পূরণ হলেই যথেষ্ট। কলকাতার সুন্নীরা সাহেবানদের মত খন্ডন

কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে বিষয়ে আবু হানিফার বা অন্য কোন প্রাচীন প্রামাণ্য পুস্তকে কিছু উল্লেখ নেই। প্রথম শর্তে শুধু এ কথাটাই বলা হয়েছে যে, "বিধর্মীদের শাসন যদি নির্বিচারে জারি হয়ে থাকে"; এবং এ শর্তটি বর্তমানে ভারতের বেলায় হুবহু প্রযোজ্য। দ্বিতীয় শর্তের বেলায় ও প্রথমটির পরিশিষ্ট হিসেবে পুস্তিকায় অনেক কিছু বাদ পড়ে গেছে। প্রাচীন কিতাব অনুসারে ভারত একটা শত্রুদেশে পরিণত হয়েছে, কারণ এই দেশ ও ইংলণ্ডের মাঝে (সংশ্লিষ্ট দারুল-হার্ব) হস্তক্ষেপ করার মত এমন কোন দেশ নেই যেখান থেকে সৈন্য পাঠিয়ে ভারতের দারুল-হার্বে পরিণত হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করা যায়। ইংলণ্ড যখন ভারত জয় করে তখন তারা এখানে আসার জন্য সমুদ্রপথ ব্যবহার করে ; এবং 'হামাবী' ও 'তাহাতাবী'তে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সমুদ্র হচ্ছে দারুল-হার্ব। ফলে ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মাঝে প্রধান যোগসূত্র হিসেবে এখনও পর্যন্ত কেবল সমুদ্রপথই রয়েছে এবং মধ্যবর্তী এমন কোন ইসলামী দেশ নেই যারা হিন্দুস্থানে সৈন্য পাঠাতে পারে। মুসলমান দেশ কাবুল হিন্দুস্থানের সীমান্তে অবস্থিত হলেও এবিষয়ে তার কিছুই করণীয় নেই। অথচ আবু হানিফার উল্লিখিত শর্ত অনুসারে উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এমন একটা ইসলামী দেশ থাকা চাই যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট দেশটিকে দারুল-হার্বে পরিণত করার চেষ্টা পণ্ড করার জন্য সৈন্য পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করা চলে। কিন্তু কেহই এরূপ দাবি করবে না যে, কাবুল, ইংলণ্ড ও ভারতের মাঝে যোগসূত্রকারী মধ্যবর্তী দেশ কিংবা ভারতের মুসলমান প্রজাদের সাহায্য করার মত কোন শক্তি তার আছে।

কিন্তু পুস্তিকায় উল্লেখিত তৃতীয় শর্তটিই সর্বাধিক মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে। এই শর্তটির সমগ্র শক্তি আমান-ই-আউয়াল শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করছে, এবং পুস্তিকায় এই শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'। কিন্তু শব্দটি আসলে কি বুঝাতে চেয়েছে উপরোক্ত অর্থে তা পরিষ্কার হয়নি। আক্ষরিক অর্থে 'আমান' মানে নিরাপত্তা ; এবং 'আমান-ই-আউয়াল'— এর অর্থ 'জোমি-উর-রুমুজ'-এ যা বলা হয়েছে তা' হচ্ছে মুসলমানরা নিজেদের শাসনামলে যে ধরনের ধর্মীয় নিরাপত্তা ও পূর্ণ মর্যাদা ভোগ করেছে

করার জন্য আবু হানিফার মত সমর্থন করে ঠিক কাজই করেছেন (পুস্তিকার ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য): কিন্তু আমি দেখাতে চাই যে, তিনটি শর্তের সবগুলোই এখন ভারতের বেলায় প্রযোজ্য এবং তার ফলে আবু হানিফা এবং তার শিষ্যদের মতানুসারে ভারত এখন দারুল-হার্বে পরিণত হয়েছে।

তার পূর্ণাঙ্গ পুনরুজ্জীবন ; এই মতটির প্রামাণ্যতা নিয়ে কলকাতার সুন্নীরাও কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চাইবেন না এবং এহেন প্রামাণ্য মত অনুসারে একটি দেশ তখনই শত্রু দেশে পরিণত হয়— (১) যখন মুসলমান ও জিম্মিরা (তাদের অধীনস্থ বিধর্মীরা) কেবল ততটুকু আমান (ধর্মীয় মর্যাদা) ভোগ করতে পারে যেটুকু বিধর্মীরা তাদেরকে অনুমোদন করে ; এবং (২) নিজেদের শাসনামলে তারা যে পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদা ভোগ করেছে এবং বিধর্মী প্রজাদের যতটা ধর্মীয় মর্যাদা তারা তখন অনুমোদন করেছে তা যখন বর্তমান থাকে না। এটা সুস্পষ্ট যে, উপরোক্ত দুটি ধারাই বর্তমানে ভারতের বেলায় প্রযোজ্য। বর্তমানে ভারতে খ্রীস্টান শাসকরা যতটা অনুমোদন করে মুসলমানরা ঠিক ততটুকু 'আমান' বা ধর্মীয় মর্যাদা ভোগ করার অধিকারী। মাত্রার দিক থেকে তাদের বর্তমান ধর্মীয় মর্যাদা তাদের নিজেদের শাসনামলের তুলনায় অনেক কম। বৃটিশ সরকার মুসলমানদের কাছ থেকে কর আদায় করে এবং সে করের টাকা দিয়ে খ্রীস্টানদের গীর্জা নির্মাণ ও খ্রীস্টান যাজক সম্প্রদায়ের ব্যয় বহন করে। বিভিন্ন জেলায় ও প্রদেশে মুসলমান গভর্নরদের জায়গায় খ্রীস্টান গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছে। মুসলমান বিচারক ও আইন অফিসারদের [১] পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে। আদালতে ইংরেজি ভাষা চালু করা হয়েছে। মুসলমান আমলের সকল কার্যবিধি ও ফৌজদারী আইন রহিত করা হয়েছে। ১৮৬৮ সালের চতুর্দশতম আইন[২] জারি করে দুর্ভাগ্য কবলিতা মহিলাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুসলমান শাসকরা যেমন আইন প্রয়োগ করে মুসলিম আইনশাস্ত্র অনুযায়ী সকলকে মসজিদে যেতে এবং অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে বাধ্য করতে পারে, আমাদের পক্ষে সেরূপ কিছু করা সম্ভব হয়নি। মনে রাখা দরকার যে, ইসলামের নাগরিক ও ধর্মীয় আইন এবং মুসলমানদের নাগরিক ও ধর্মীয় মর্যাদা অবিভাজ্য। আমাদের আদালতে প্রবর্তিত স্ট্যাম্প, আমাদের বিধি-বিধানে নির্দিষ্ট সময়-সীমা, পাওনা অর্থের উপর সুদ প্রদানের জন্য আমাদের বিচারকদের নির্দেশাবলী এবং আইন-আদালতের কার্যবিধিও ধর্মীয় সহনশীলতার ব্যাপারে আমাদের প্রবর্তিত যাবতীয় ব্যবস্থাটাই মুসলমানী আইনের বিরোধী এবং মুসলমানরা নিজেদের শাসনামলে যে 'আমান' বা মর্যাদা ভোগ করে এসেছে তার উপর হস্তক্ষেপকারী। 'জিম্মি' ও খ্রীস্টানসহ ভারতের মুসলমান বাদশাহদের আমলের বিধর্মী প্রজাদের ধর্মীয় মর্যাদাও বর্তমানে যথেষ্ট

---

[১] কাজী; ১৮৬৪ সালের একাদশতম আইন জারি করে এই পদ বিলোপ করা হয়। এ সম্পর্কে পরে আরো আলোচনা করব।

[২] ভারতীয় সংক্রামক ব্যাধি আইন ।

পরিবর্তিত হয়েছে। খ্রীস্টান জিম্মিরা আর প্রজা নয়, তারা এখন বিজেতা ও শাসক। হিন্দু জিম্মিদের আর রাজনৈতিক কর[১] দিতে হয় না এবং তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যাপারে আমরা শত প্রকারে হস্তক্ষেপ করেছি, যেমন অগ্নি পানি ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা করার রীতি রহিত করেছি, সতীদাহ বিলোপ করেছি, বর্ণভেদ প্রথা আমলে আনিনি এবং খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণকে আইনসিদ্ধ করেছি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মুসলমান ও জিম্মি উভয়ের 'আমান-ই-আউয়াল' বা সাবেক মর্যাদা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে ; এবং এমনকি আবু হানিফার তৃতীয় শর্তানুসারেও ভারত শত্রুদেশে (দারুল-হার্ব) পরিণত হয়েছে।

কতিপয় ঘটনার নজির টানলে দেখা যাবে যে, বিতর্কিত বিষয়টি বারংবার পরীক্ষিত হয়েছে। গ্রীস যতদিন তুরস্কের অধীনে ছিল ততদিন সেটা ছিল ইসলামী দেশ। কিন্তু অর্ধশতাব্দী আগে তারা মুসলমানী শাসন-শৃঙ্খল ছুঁড়ে ফেলার পর গ্রীসকে শত্রুদেশ হিসেবে বিবেচনা করে আসা হচ্ছে, এমনকি সেখানে বহুসংখ্যক মুসলমান অধিবাসী থাকা সত্ত্বেও। দানিউব তীরবর্তী প্রদেশসমূহ, দক্ষিণ স্পেন এবং অন্য যেসব দেশে অনুরূপভাবে সরকার পরিবর্তিত হয়েছে তাদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। আবু হানিফার প্রখ্যাত শিষ্য ইমাম মোহাম্মদের 'মাবসুত' কিতাবে শাস্ত্রীয় বিধানটিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঃ "কোন ইসলামী দেশ বিধর্মীদের অধিকারে চলে যাওয়ার পরেও যদি মুসলমান গভর্নর ও মুসলমান বিচারকদের[২] চাকরি অপরিবর্তিত থাকে এবং বিধর্মীরা যদি নিজস্ব বিধি-বিধান প্রবর্তন না করে তাহলে দেশটি ইসলামী দেশ হিসেবেই পরিগণিত হবে।" আমরা মুসলমান গভর্নরদের বহাল রাখিনি ; মুসলমান আইন অফিসারদের পদ আমরা বিলোপ করেছি ; আমরা আমাদের নিজস্ব আইন-কানুন চালু করেছি ; এবং সে কারণে ভারতীয় মুসলমানদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে মতে বিশ্বাস করে তদনুসারে ভারত আর ইসলামী দেশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না ।

ওয়াহাবীদের কার্যকলাপ শুরু হয়েছে এই ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে যে, ভারত শত্রুদেশে পরিণত হয়েছে এবং এর শাসকদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কলকাতা পুস্তিকায় প্রথমোক্ত দাবিটি অস্বীকার করে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, ভারত শত্রুদেশে পরিণত হয়নি এবং এটা এখনও ইসলামী দেশ হিসেবে বিরাজিত। কিন্তু এই দাবির সমর্থনে

---

[১] জিজিয়া।

[২] কাজী।

পুস্তিকাটি প্রামাণ্য তথ্যাবলী পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তার ফলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মভীরু মুসলমানদের উপর এটা কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না অথচ এদেরকে আমাদের পক্ষে টেনে আনা কতইনা গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর ভারতের আইনশাস্ত্রবিদরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিতে তাদের বক্তব্য হাজির করেছেন। ওয়াহাবীদের প্রথম বক্তব্য বিষয়কে তারা অস্বীকার করেননি। ভারত আর ইসলামী দেশ নয়, ওয়াহাবীদের এই বক্তব্য অস্বীকার না করলেও ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার বাধ্যবাধকতাসমূহকে তারা অস্বীকার করেছেন।

আমার মতে, সমস্যাটির সমাধানের এটাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট উপায়। মক্কার আইনশাস্ত্রবিদদের মতানুসারে ভারত যদি এখনও ইসলামী দেশ থাকত তাহলে গোঁড়া মুসলমানদের বিরাট অংশ বিদ্রোহের বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নেয়া তাদের কর্তব্য বলে মনে করত। ভারত যদি 'আইনগতভাবে' এখনও ইসলামী দেশ থেকে থাকে তাহলে আমাদের মুসলমান প্রজাদের উপরোক্ত অংশটা এদেশকে 'কার্যকরীভাবে' ইসলামী দেশে পরিণত করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত হবে। সকল শাস্ত্রীয় কিতাবে লেখা রয়েছে ঃ "বিধর্মীরা যদি ইসলামী দেশে[১] ঢুকে পড়ে এবং কোন শহর দখল করে বসে তাহলে সেই বিধর্মী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা প্রতিটি মুসলমান নর-নারী ও শিশুর অপরিহার্য" কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।[২] এটা এমন একটি প্রতিষ্ঠিত বিধান যে, রুশীয়রা বোখারায় প্রবেশের সাথে সাথে মুসলমান প্রজারা তাদের বাদশাহকে রুশীয়দের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করে। কাজে কাজেই ভারত যদি এখনও ইসলামী দেশ থেকে থাকে তাহলে প্রতিদিনই এখানে বিদ্রোহের নতুন নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। আমাদের ধর্মীয় সহনশীলতা একটা বড় রকমের অপরাধ বলেই সাব্যস্ত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ (এবং বৃহত্তর রকমের অপরাধের কথা উল্লেখ না করেও) বলা চলে যে, মুসলমান শাস্ত্রীয় বিধানে বলা হয়েছে যে, কোন ইসলামী দেশের মুসলমান শাসক বা বাদশাহ যদি সত্য ধর্ম প্রচারের বা সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা না করে তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আইনসঙ্গত হয়ে দাঁড়ায়। আকবরের শাসনামলে, যিনি হিন্দুদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনের জন্য ইসলামী আইনের সংস্কার সাধন করেন, বিদ্রোহ করার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয় এবং তা থেকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখা দেয়। ভারত যদি এখনও অনৈসলামিক দেশে

---

[১] বিলাদ-উল-ইসলাম।

[২] ফরজ-আইন।

পরিণত না হয়ে থাকে তবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আরো বেশি করে অপরিহার্য হবে, কারণ ইংরেজরা মুসলমানী বিধি-বিধানের উপর শত প্রকারে হস্তক্ষেপ করেছে, মুসলমান আইন অফিসারদের বরখাস্ত করেছে এবং সমগ্র ইসলামী কার্যবিধি বিলোপ করেছে। অতএব মক্কার আইনশাস্ত্রবিদদের সিদ্ধান্তকে আমি ঘোরতর সন্দেহের দৃষ্টিতে না দেখে পারছি না। কলকাতার মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি যেক্ষেত্রে ভারতকে ইসলামী দেশ হিসেবে বর্ণনা করে " সুতরাং বিদ্রোহ বেআইনী" বলে রায় দিয়েছে, মক্কার আইন-শাস্ত্রবিদরা সেক্ষেত্রে মুসলমানদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকে ধর্মান্ধ শিবিরের হাতকেই শক্তিশালী করেছেন; কারণ এই চুপ থাকাকে ঠিক বিপরীত অর্থে ধরে নেয়া হবে, অর্থাৎ মনে করা হবে যে, "সুতরাং বিদ্রোহ করাই হচ্ছে অপরিহার্য কর্তব্য।"

এসত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এমন একটা শ্রেণী আছে যারা অনুরূপ অর্থ আরোপ করবে না। তাদের কাছে এটা সন্তুষ্টির কারণ হবে যে, কলকাতার মোহামেডান সোসাইটি এতগুলো প্রখ্যাত আইনশাস্ত্রবিদের[১] মুখ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করিয়েছেন যে, ভারত এখনও বিশ্বাসীদের দেশ এবং সে কারণে বিদ্রোহ অবাঞ্ছিত। কারণ খ্রীস্টানদের মত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও মতবাদের বিতর্ক অব্যাহতভাবে চালু রয়েছে। এই শ্রেণীটার মনোভাব সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করাবার জন্য আমি নিচের[২] জনৈক প্রখ্যাত শেখের বক্তৃতা উদ্ধৃত করছি। যে সভায় আলোচ্য পুস্তিকাটি গৃহীত হয় সেখানেই তিনি এই বক্তৃতা প্রদান করেন। ইংরেজরা ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা চালিত হয়ে ভারতের ঘটনাবলীকে প্রায়ই ভুল অর্থে দেখে থাকে। তাদের জানা উচিত যে, তাদের এশীয় প্রজারা, সংখ্যায় যারা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মোট জনসখ্যার ছয়গুণ, তারাও ভারতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে একই অজ্ঞতার দ্বারা চালিত হয়ে ইউরোপীয় রাজনীতির অপব্যাখ্যা করতে পারে।

---

[১] জৌনপুরের মৌলবী কেরামত আলী; শেখ আহমদ এফেন্দী-আল-আনসারী; মৌলবী আব্দুল হাকিম; এছাড়াও রয়েছেন মৌলবী আব্দুল লতিফ খান বাহাদুরের মত ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত একজন বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

[২] শেখ আহমদ এফেন্দী-আল-আনসারী (মদীনার একজন সম্মানিত বাসিন্দা এবং পয়গম্বরের অন্যতম সাহাবী আবু আইয়ুব আল-আনসারীর বংশধর)। গত কিছুদিন যাবত তিনি এই শহরে বসবাস করছেন এবং সভায় বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন যে তিনি সোসাইটির সদস্য নন। তবে এ সভায় উপস্থিত হতে পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন এবং অনুমতি পেলে কিছু বলতে চান; কারণ লৌকিক বিষয় ও ধর্মীয় এবাদত বন্দেগীসহ

নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও কলকাতার সিদ্ধান্তটি বিত্তবান ও শান্তি- প্রিয় মুসলমানদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু উত্তর ভারতীয় আইন-শাস্ত্রবিদদের প্রামাণ্য ঘোষণা অধিকতর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করে। এতে ভারত যে একটি শত্রুদেশ, ওয়াহাবীদের এই বক্তব্য মেনে নেয়া হয়েছে।

মুসলমানদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে এ সভায় আলোচনা হচ্ছে এবং যেহেতু তিনি গত কয়েক বছর যাবত এদেশে এসে বসবাস করছেন তাই এসকল বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করার আগ্রহ পোষণ করছেন।

সভায় সভাপতি জওয়াবে বলেন যে, সভা কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করবে এবং তার মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করবে।

প্রখ্যাত শেখ অতঃপর বলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি আরো অনেক দেশ সফর করেছেন এবং দুবার কনস্ট্যানটিনোপল গিয়েছেন। প্রথমবার যখন তিনি সেখানে যান তখন সে দেশের শাসক ছিলেন সুলতান মাহমুদ খান এবং সে সময় তিনি দু'বছর সেখানে অতিবাহিত করেন। দ্বিতীয়বার যখন যান তখন বর্তমান শাসক সুলতান আব্দুল আজিজ খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তখন তিনি চৌদ্দ মাস সেখানে অতিবাহিত করেন। তিনি মিসর, সিরিয়া এবং এশীয় তুরস্কের বিভিন্ন অংশেও সফর করেছেন। ভারতে এটা তার চতুর্থ সফর। প্রায় ২৯ বছর আগে তিনি সর্বপ্রথম ভারতে আসেন এবং প্রায় সাড়ে সাত বছর ধরে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করেন। তিনি দিল্লীতে আড়াই বছর মরহুম আমজাদ আলী শাহ্-এর রাজত্বকালে দু'বছর ন'মাস লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে তিনি পরলোকগত রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজা তার প্রতি সব সময়ই প্রগাঢ় সহৃদয়তা ও অতিথিপরায়ণতা প্রদর্শন করেন। দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদে দু'বছর কাটিয়ে তিনি বরোদা গমন করেন। বরোদা থেকে তিনি আফগানিস্তান যান এবং সেখানকার বিভিন্ন স্থানে চার কি সাড়ে চার বছর ভ্রমণ করেন। আফগানিস্তানে তাঁর ভ্রমণে সহযাত্রী ছিলেন কাবুলের আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খানের ভ্রাতা এবং কাবুলে অবস্থানকালে তিনি বাদশাহের আতিথ্য গ্রহণ করেন। আরো দুবার তিনি ভারতে আসেন কিন্তু কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে ও সিন্ধু প্রদেশে অবস্থান করে চলে যান। প্রায় এক বছর হল তিনি এবার ভারতে এসেছেন এবং বোম্বাই, ভূপাল, রামপুর, এলাহাবাদ, পাটনা, গয়া প্রভৃতি স্থান হয়ে সর্বশেষ কলকাতায় এসেছেন। এবারও প্রত্যেক জায়গায় তাঁর প্রতি আন্তরিক আতিথেয়তা দেখান হয়, বিশেষ করে ভূপালের মহামান্যা বেগম এবং রামপুরের নওয়াব যে গভীর সহৃদয়তা ও আতিথেয়তা তাঁকে দেখিয়েছেন সে জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা তাঁর জানা নেই। তাঁর এই ভ্রমণ কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, বিভিন্ন দেশে এবং ভারতে পর পর চার বার ভ্রমণের ফলে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন তার ফলে এই সভায় বিশিষ্ট বক্তারা যেসব অভিমত প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে ইংলণ্ডের মহামান্যা রাণী ও তুরস্কের মহামান্য সুলতানের মাঝে প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্ব সম্পর্কে সেক্রেটারী মহোদয় যে বিবৃতি পেশ করেছেন তার সমর্থনে দু'কথা বলার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন। সত্য কথা বলতে কি, সুলতানের সাথে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে বৃটিশ জাতির সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। বক্তা এমন একটা সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করেন যা সুলতানের সাথে

কিন্তু তারপর যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে মুসলমানদের কর্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, তাদের উচিত শান্তিপ্রিয় প্রজা হিসেবে নির্বিবাদে বসবাস করা। তাদের এ সিদ্ধান্তটি আমি পরিশিষ্টে তুলে দিয়েছি এবং এখানে শুধু বিষয়টির অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণীয় এতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি।

বৃটিশ জাতির মধুর সম্পর্কের পরিচয় বহন করে। কিছুদিন পূর্বে মিসরের খেদিব সুলতানের প্রতি অবাধ্যতা ও অনানুগত্যের মনোভাব প্রকাশ করেন। এ নিয়ে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার উপক্রম করে এবং সুলতান খেদিবের কাছে এমন একটা অপমানজনক ফরমান জারী করেন যেটা মেনে নিলেই শুধু খেদিবের অবাধ্যতা সুলতান ক্ষমা করতে পারেন। সুলতানের ফরমান মানতে খেদিব ইতস্ততঃ করেন এবং আদৌ তিনি ফরমানটি গ্রাহ্য করবেন না এরূপ মনোভাব দেখাতে থাকেন। কিন্তু কিছু করার আগে তিনি ফরমানটি বৃটিশ কন্সাল জেনারেলের গোচরে এনে তাঁর উপদেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন এবং কন্সাল জেনারেলও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করেন। বৃটিশ কন্সাল জেনারেল খেদিবকে জানিয়ে দেন যে, বৃটিশ মন্ত্রিসভার কাছ থেকে তিনি এই নির্দেশ লাভ করেছেন যে, খেদিব যদি উক্ত রাজকীয় ফরমান মান্য না করেন তাহলে এথেন্সে অবস্থিত বৃটিশ নৌবহরকে তারযোগে খবর দিয়ে অবিলম্বে আলেকজান্দ্রিয়া উপস্থিত হওয়ার জন্য যেন নির্দেশ দেয়া হয় একথা শোনার পর খেদিব অনমনীয়তা পরিহার করে বিদ্রোহের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। তিনি তৎক্ষণাত ফরমানের অপমানজনক শর্তগুলো মেনে নিয়ে সুলতানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুলতানের প্রতি বৃটিশ জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও প্রগাঢ় বন্ধুত্বের এটা একটা জ্বলন্ত প্রমাণ। বৃটিশরা ইতিমধ্যেই সুলতানের বৈদেশিক শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং বর্তমানে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। যদিও খেদিবকে দমনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা সুলতানের ছিল, তথাপি বৃটিশরা চাননি যে সুলতান একটা গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ুন । এটা লক্ষ্যণীয় যে, ঐ সময় মিসরের খেদিবের সাথেও বৃটিশদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ এই ছিল যে, বৃটিশরা সুলতানের সাহয্যকারী হিসেবে কাজ করে আসছে এবং তাই প্রয়োজনের সময় তারা সুলতানের স্বার্থ রক্ষার জন্য খেদিবের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করে। বৃটিশরা যদি সুলতানের সাহায্যে এগিয়ে না আসতো তাহলে হয়ত খেদিব সুলতানের শক্তিকে খাটো করে দেখত এবং সে অবস্থায় কি যে অঘটন ঘটত তা সহজেই অনুমেয়। বৃটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ত্বরিৎ ব্যবস্থার ফলে সুলতান এবং খেদিব উভয়েই যুদ্ধের পরিণতি থেকে রেহাই পেয়ে যান। ইসলামের সুলতানের সাথে যারা আন্তরিক বন্ধুত্ব প্রদর্শন করেছে তাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে চায় তাদের চেয়ে ইসলামের বড় শত্রু আর কে আছে ? তাছাড়া বৃটিশ-ভারত যে দারুল-ইসলাম. সে সম্পর্কে এই সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রামাণ্য উদ্ধৃতি ছাড়াও পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনার সর্বাধিক পণ্ডিত ধর্মীয় নেতাদের একটা ফতোয়া রয়েছে এদেশের যাবতীয় পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনার পর উপরোক্ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় নেতারা

বর্তমানে উনিশ শতকের শেষ অর্ধাংশ যাবত যে বিষয়টা ভারতীয় মুসলমানদের মনে তোলপাড় সৃষ্টি করে চলছে, আঠারো শতকের অর্ধাংশ যাবত প্রায় সেই একই প্রশ্ন তাদের মনে উত্থিত হয়েছিল। মারাঠী পৌত্তলিকরা ভারতের মুসলমান সাম্রাজ্যকে কাবু করে ফেলে। অনেক প্রদেশের যেখানে আগে মুসলমান শাসনকর্তা বা মুসলমানী আইন অনুসারে তাঁদের হিন্দু সহকারীরা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন সেগুলো পৌত্তলিক রাজবংশের হাতে চলে যায়। সুতরাং গোঁড়া মুসলমানদের মনে বিজেতাদের অধীনে তাদের মর্যাদা এবং শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নটি সঙ্গে সঙ্গেই উত্থিত হয়। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, মারাঠারা যদি শুধুমাত্র রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ[১] নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং প্রশাসনের অন্য কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে তবে ভারত ইসলামী দেশ হিসেবেই পরিগণিত হবে। মুসলমান বিচারক ও আইন অফিসারদের[২] কাজে তারা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেনি। কোন মুসলমান গভর্নর মারা গেলে তদস্থলে তারা আর একজন মুসলমান গভর্নর নিয়োগ করেছে। তথাপি দূরবর্তী মারাঠা রাজদরবারে উপঢৌকন প্রেরণের বিনিময়ে এসব পদে বংশগত উত্তরাধিকারিত্বে স্বীকৃতি লাভ তাদের অধিকারের বিষয় বলে মনে করা হয়। তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ

বৃটিশ-ভারতকে দারুল-ইসলাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন এবং এরপর এ বিষয়ে আর কিছু বলার থাকতে পারে না।

উক্ত ফতোয়ার বলে একজন আরব দ্বিধামুক্ত মনে এদেশে এসেছেন এবং ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে নিশ্চয়তা লাভের উদ্দেশ্যে কোন আবেদন পেশ ছাড়াই যতদিন ইচ্ছা এদেশে অবস্থান করছেন। এছাড়া প্রায় ২৯ বছর আগে তিনি যখন প্রথম এদেশে আসেন তখন লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে শত শত বিজ্ঞ মুসলিম ধর্মীয় নেতার সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু তখন তাঁদের কাউকেই তিনি ভারতকে দারুল-হার্ব হিসেবে অভিহিত করতে শোনেননি। তাঁদের সবাই এদেশকে দারুল-ইসলাম হিসেবে অভিহিত করেন এবং দারুল-ইসলামে করণীয় সব কিছুই প্রতিপালিত হয়। বক্তা নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারেন যে, তখনও যেমন এখনও তেমনি প্রতি শুক্রবারে জুমার নামায এবং বছরে দু'টি ঈদের জামাত আদায় করা হচ্ছে। এমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি যার ফলে দেশটির দারুল-ইসলাম চরিত্র পাল্টে যেতে পারে। বিজ্ঞ শেখ এমন সব সৎ ব্যক্তিদের সাথে এদেশ সফর করেছেন যাতে করে ভারতের মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে কি ঘটছে না ঘটছে তা বুঝতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি।

[১] চৌথ।

[২] কাজী।

প্রামাণ্য সিদ্ধান্তটি[১] ছিল নিম্নরূপ ঃ "ধরে নেয়া যাক যে, কোন ইসলামী দেশ বিধর্মী শাসকের হাতে চলে গেছে, কিন্তু ঐ শাসক মুসলমানদের শুক্রবারের জুমার নামায আদায় করা ও দু'টি ঈদ উৎসব উদযাপনের অনুমতি দিয়ে আসছে। মুসলমানী আইন এবং মুসলমান কাজীও সে অব্যাহত রেখেছে। এসত্ত্বেও মুসলমান গভর্নর নিযুক্তির জন্য বিধর্মী শাসকের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। দুঃখের বিষয় হলেও অনুরূপ দেশ আমাদের সময়কালে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে বিধর্মী শাসক মুসলমান গভর্নর নিয়োগ করে এবং জুমার নামায ও ঈদ উৎসব উদ্‌যাপনের অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। বিধর্মীরা (মারাঠারা) আমাদের কতিপয় প্রদেশ দখল করে নিয়েছে। সুতরাং অনুরূপ অবস্থায় ধর্মীয় আইনশাস্ত্রের বিধান কি, তা জানা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য।"

"বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, অনুরূপ কোন মুসলমান প্রদেশ বিধর্মী শাসকের দখলে চলে গেলেও নিম্নোক্ত কারণে তা ইসলামী দেশ হিসেবেই বিবেচিত হবে ঃ যেহেতু এর সন্নিহিত আর কোন শত্রুদেশ নেই ; যেহেতু বিধর্মীদের আইন সেখানে প্রবর্তিত হয়নি ; যেহেতু গভর্নর ও বিচারক পদে মুসলমানরাই অব্যাহত রয়েছে যারা ইসলামী আইন মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ; এবং যেহেতু এমনি বিধর্মীরাও সেখানে সব বিষয়ে মুসলমানী আইনের শরণাপন্ন হয় এবং মুসলমান আইন অফিসাররাই বিধর্মীদের অপরাধের বিচার করে থাকে।"

ভারতের ইসলামী দেশ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য উপরের যেসব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে তার একটিও বর্তমানে বজায় নেই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকর্তারা প্রথম দিকে এটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই মুসলমানী প্রশাসনের উপর তারা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেনি। তারা এদেশের আইন হিসেবে মুসলমানী বিধিবিধান অব্যাহত রাখে, আইন প্রয়োগের জন্য মুসলিম আইন অফিসারদের নিয়োগ করে এবং ছোট-বড় সব বিষয়েই তারা দিল্লীর মুসলমান বাদশাহ্‌র নামেই কাজ চালিয়ে যায়। সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতটা ভীত ছিল যে, মুসলিম প্রশাসনের অবর্ণনীয়

---

[১] এই ফতোয়াটির জন্যও আমি আবার প্রফেসর ব্লকম্যানের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি। তারনুয়াহর্ ওমরের বংশোদ্ভূত মৌলবী তাকিউদ্দিন মুহম্মদ সাবিরের পুত্র কাজী মুহম্মদ হামিদ; তদীয় পুত্র মৌলবী শেখ আলী, তদীয় পুত্র কাজী মুহম্মদ আলীর মূল আরবী কেতাব থেকে প্রফেসর ব্লকম্যান এ দলিলটি সংগ্রহ করেন। বইটির নাম 'আহকামুল আরাজী', বা ভূমি রাজস্ব বিধি। এতে প্রধানতঃ ইসলামে জায়েজ সম্পত্তি নিয়ে আলোচিত হয়েছে ;

দুর্নীতির কারণে মুসলমানদের তার দেশের শাসনকার্য পরিচালনার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার দীর্ঘদিন পরেও তারা মুসলমান বাদশাহর অধীনস্থ হিসেবেই নিজেদেরকে প্রদর্শন করে। এই ভনিতা শেষ পর্যন্ত কিরূপ অবমাননাকর পরিহাসে পর্যবসিত হয় এবং আমাদের রেজিমেন্ট যখন দরিদ্র পেনশনভোগীদের মাসিক ভাতা পরিশোধ করছিলেন তখনও আমরা কেন দিল্লীর বাদশাহ্র নামাঙ্কিত[১] মুদ্রা চালু রেখেছিলাম সেসব বিবরণ ইতিহাসের বিষয়। যারা কখনও ভারতে পদার্পণ করেননি এমন সব ব্যক্তিরা[২] এতদিন যাবত ভারতের ইতিহাস রচনা করেছেন বলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপরোক্ত নমনীয় নীতির কারণ ইংলণ্ডে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। প্রকৃত সত্য এই যে, মাত্র দশ বছরের মধ্যেই যদি আমরা সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করতাম তাহলে ১৮৫৭ সালের চেয়েও ভয়াবহ মুসলমান বিদ্রোহের মোকাবিলা আমাদের করতে হত। কারণ সেক্ষেত্রে মুসলমানদের যাবতীয় মর্যাদায় রাতারাতি পরিবর্তন ঘটত এবং মুসলমানদের দেশ জবরদখলকারী বিধর্মী শাসক শক্তি হিসেবেই আমরা পরিগণিত হতাম। ভারতীয় মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিদ্রোহ করাকেই তাদের অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত, কারণ আমি আগেই দেখিয়েছি যে, অনুরূপ পরিস্থিতিতে "প্রত্যেক মুসলমান নরনারী ও শিশুর প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে বিধর্মী শাসকের উপর আঘাত হেনে তাকে বিতাড়িত করা।"[৩]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাদের প্রশংসনীয় উদারনীতি, এবং মুসলমান রাজশক্তিকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হতে দেওয়া এবং এ নিয়ে তাড়াহুড়ো না করার যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিল তার ফলেই উপরোক্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ভারত দৃষ্টির অগোচরেই ইসলামী দেশ থেকে শত্রুদেশে[৪] রূপান্তরিত হয়। রাজকীয় ও জেলাসমূহের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিলপত্র বহু বছর যাবত অধ্যয়নের পরেও আমার

---

[১] ১৭৭৩ সালের পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলো খোদিত থাকে–শাসকের নাম অনুসারে সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে— মোহাম্মদী ধর্মের রক্ষক, আল্লাহ্র আশীর্বাদপুষ্ট বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নামাঙ্কিত এই মুদ্রা সাতটি স্তরে প্রচলিত হলো।" মুদ্রার অপর পিঠে: ""সিংহাসনারোহণের ১৯তম বার্ষিকীতে মুর্শিদাবাদে মুদ্রিত।"

[২] মার্শম্যান এবং মিডোজ টেইলর প্রণীত দু'খণ্ড বাদে। মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিন স্টোনের রচনা আলোচ্য সময়ের নয়।

[৩] ইমাম মোহাম্মদের 'মাবসুত' দ্রষ্টব্য।

[৪] অর্থাৎ দারুল-ইসলাম থেকে দারুল-হার্বে পরিণত হওয়া।

পক্ষে বুঝা সম্ভব হয়নি যে, ঠিক কোন বছর বা কোন যুগে ভারতেই এই রূপান্তর বাস্তবায়িত হয়েছে। মুসলমান বাদশাহ্‌র নামমাত্র কর্তৃত্বের অবসান ঘটাবার বহু পূর্বেই আমরা অধস্তন মুসলিম গভর্নরদের চাকরির অবসান ঘটিয়েছি। বাদশাহ্‌র নামমাত্র কর্তৃত্ব প্রহসনে পরিণত হওয়ার পরেও দীর্ঘদিন ধরে, এমনকি ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত, আমাদের মুদ্রা তার নামেই প্রচলিত থাকে।[১] কিন্তু আমাদের টাকার উপর বৃটিশ রাজের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হওয়ার পরেও মুসলিম কার্যবিধির অনেক কিছু এবং মুসলমানী আদালতের ভাষা আমরা অব্যাহত রাখি। পরে এগুলোও আস্তে আস্তে বিলোপ করা হয়। কিন্তু ১৮৬৪ সালের পরই শুধু আমরা সেই বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করি (আমার মতে অবিজ্ঞোচিত কাজ) যার ফলে নতুন আইন[২] প্রণয়ন করে মুসলমান আইন অফিসারদের চাকরি খতম করা হয়। এই আইনটি ছিল নতুন ভারত সাম্রাজ্যের কাঠামো গড়ে তোলার সর্বশেষ কাজ, যার মধ্য দিয়ে ভারত শত্রুদেশে রূপান্তরিত হয় এবং যেটা গড়ে তুলতে ঠিক একশ' বছর লেগেছে (১৭৬৫ থেকে ১৮৬৪)। এভাবে মুসলমানী শাসন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর আমাদের মুসলিম প্রজাদের সামনে নতুন ধরনের বাধ্যবাধকতা দেখা দিতে শুরু করে। ভারত শত্রুদেশে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে ইসলামী দেশের বাসিন্দা হিসেবে মুসলমানদের দায়িত্ব স্তিমিত থেকে যায়। আমি আগেই বলেছি যে, এই দায়িত্বগুলোর অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে বিধর্মী বিজেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। কিন্তু পরিবর্তনটা বাস্তব রূপ পরিগ্রহের পর আরো কিছু নতুন দায়িত্ব সামনে এসে যায়। মুসলমানদের মর্যাদা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এ পরিবর্তনের জন্য বর্তমান বংশধররা দায়ী নয় ; এবং তার ফলে শাসন থেকে রাতারাতি অধিকারচ্যুত হয়ে হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে তারা বাধ্য নয়। তাদের অবস্থাটা ঠিক 'মুস্তামিন' ধরনের অর্থাৎ তারা নিরাপত্তা প্রয়াসী। তাই বৃটিশ শাসকদের কাছ থেকে তারা কতিপয় নাগরিক ও ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা (আমান) লাভ করেছে। মুসলমান শাসনামলের পূর্ববর্তী সম্পূর্ণ মর্যাদা[৩] নয় ; কিন্তু জীবন ও ধনসম্পত্তির

---

[১] কোম্পানী কর্তৃক প্রচলিত টাকায় সর্বপ্রথম ১৮৩৫ সালে বৃটিশ রাজের প্রতিকৃতি এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাম মুদ্রিত হয়।

[২] ১৮৬৪ সালে একাদশতম আইন।

[৩] ফতোয়-ই-আলমগীরি ব্যতীত সিরাজিয়া, ইমাদিয়া ও অন্যান্য সকল কেতাবে বর্ণিত আমান-ই-আউয়াল।

এবং আত্মিক নিরাপত্তার অনেক কিছুই তারা লাভ করেছে। ব্যক্তিগত নামায আদায় করা এবং প্রকাশ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয়নি এবং তাদের ধর্মীয় সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। এই নাগরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার (আমান) বিনিময়ে তারা প্রজা হিসেবে নিজেদের বর্তমান মর্যাদা মেনে নিয়েছে, ঠিক যেমন গত পঞ্চাশ বছর ধরে তাদের পূর্বপুরুষরা মেনে নিয়েছিল। আগের মত তারা আর ইসলামী দেশের মুসলমান নাগরিক নয়, তারা এখন শত্রুদেশের মুসলমান প্রজা, তাই আগের মত ইসলামী দেশের বিধর্মী শাসক-শক্তিকে উৎখাতের জন্য বিদ্রোহের বাধ্যবাধকতা তাদের আর নেই— এখন শত্রুদেশের প্রজা হিসেবে তাদের কর্তব্য হল শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থাকা।

সুতরাং শাসকশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্বের অবসান ঘটেছে। নিজেদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ীই বর্তমান মুসলমান বংশধররা স্থিতাবস্থা মেনে চলতে বাধ্য। বর্তমান অবস্থার জন্য তারা দায়ী নয় ; সুতরাং ঐশ্বরিক বিধান অনুসারে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে সত্য ধর্ম যে মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হবে তা পরিহারের জন্য তারা ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক সম্পর্ক মেনে চলতে এবং যতদিন আমরা তাদের ধর্মীয় অন্যান্য অধিকারের স্বীকৃতি দেব (আমান) ততদিন প্রজা হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে তারা বাধ্য।

অবশ্য ইংরেজ গভর্নররা যদি তাদের নামায, প্রকাশ্য প্রার্থনানুষ্ঠান ও অন্যান্য আইনসঙ্গত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে, কিংবা মসজিদ নির্মাণ, তীর্থ যাত্রা, মাজার জিয়ারত এবং ইসলামী পারিবারিক আইন প্রতিপালনের উপর বাধানিষেধ আরোপ করে, তাহলে তাদের পক্ষে বিদ্রোহ করা আইনসঙ্গত হবে। কিন্তু সে অবস্থায় বিদ্রোহ আইনসঙ্গত হলেও যদি তা অবাস্তব বলে বিবেচিত হয় তাহলে দেশত্যাগ (হিজরত) করা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠবে। কোন কোন অবস্থায় মুসলমান হিজরত করবে তার বিবরণ শাহ আব্দুল আজিজের নির্দেশনামায় রয়েছে এবং মুসলমানদের সমুদয় শাস্ত্রীয় কেতাবেও তা লেখা আছে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমি দেখাব যে, আমরা উপরোল্লিখিত শোচনীয় অবস্থার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। কারণ, শাসকদের প্রতি আমাদের মুসলমান প্রজাদের কর্তব্য নির্দেশ করাই শুধু নয়, সেই সাথে তাদের প্রতি শাসকদের কর্তব্য নির্দেশ করাও এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য। উত্তর ভারতের আইন-শাস্ত্রবিদদের সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে যার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের উপর

আমি আলোকপাত করেছি, সেই শ্রেণীর লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করবে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য যাদের শুভেচ্ছা লাভ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যতদিন আমরা তাদের অধিকার ও ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোর উপর শ্রদ্ধাশীল থাকব কেবল ততদিনই তাদের উপর এই প্রভাব অব্যাহত থাকবে। অনেক ওয়াহাবী, এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এক বিরাট অংশ বিশ্বাস করে যে, ভারত এখন শত্রুদেশ। কিন্তু তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী, অতীতের হারানো মর্যাদা নিয়ে অন্তর্জ্বালা অনুভব করলেও বর্তমান অবস্থায় করণীয় কর্তব্যসমূহ মেনে চলতে আগ্রহী। কোরআনের মর্মকথা হচ্ছে এই যে মুসলমানরা বিজেতা জাতি, কোন অবস্থাতেই বিজিত নয়। আগেই উল্লেখ করেছি যে, বেসামরিক নীতির ক্ষেত্রে কোরআন বহু পূর্বেই অসম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে ; এবং মুসলমান জাতিগুলোর উচ্চাকাংখা পূরণের জন্য কোরআনের ভিত্তিতে এক ধরনের আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক আনুগত্য আশা করলে হতাশ হতে হবে। কিন্তু আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করতে পারি যে, যতদিন আমরা তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব নিঃসঙ্কোচে পালন করে যাব ততদিন আল্লাহ্ তাদেরকে যে অবস্থায় ফেলেছেন সেটাকে মেনে নিয়ে তারাও আন্তরিকভাবে আমাদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করবে।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আইনশাস্ত্রবিদরা ভারতীয় মুসলমানদের মর্যাদার এই পরিবর্তন বহু পূর্বেই আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং সে পরিবর্তনটা এই পুরোপুরি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে। মাঝে মাঝে এমন সব ফতোয়া জারি হয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধীরে চলার নীতি সত্ত্বেও বিপ্লব একেবারে দৃষ্টির অগোচর থেকে হঠাৎ এসে যায়নি। একটি ফতোয়ায় ঘোষণা করা হয় যে, মুসলমান বিচারকরা (যাদেরকে আমরা বিলোপ করেছি) যতদিন আইন প্রশাসনের কর্তৃত্বে থাকবে ততদিন ভারত ইসলামী দেশ বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু ভারত-ভাস্কর শাহ্ আব্দুল আজিজ এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মৌলভী আব্দুল হাই-এর ফতোয়া দু'টিই সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যখন প্রশাসনের সব কিছু ক্রমান্বয়ে আমাদের হাতে নিয়ে আসছিলাম তখন আমাদের সঙ্গে তাদের কি ধরনের সম্পর্ক হবে তা নিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং তারা এতদসংক্রান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় পণ্ডিতদের পরামর্শ প্রার্থী হন এবং উপরোক্ত দু'জন শীর্ষস্থানীয় আলেম সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। তাঁদের সে সিদ্ধান্তের হুবহু উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হল ঃ

আব্দুল আজিজ ঘোষণা করেন, "কোন মুসলমান দেশ যখন বিধর্মীদের অধিকারে চলে যায় এবং সে দেশের মুসলমানদের পক্ষে ও প্রতিবেশী জেলা-সমূহের জনসাধারণের পক্ষে বিধর্মী দখলদারদের বিতাড়ন করা যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কোনদিন সম্ভব হবে বলেও যদি যুক্তিসঙ্গত আশা না থাকে ; এবং বিধর্মীদের ক্ষমতা যদি এমন মাত্রায় বাড়তে থাকে যে, তারা নিজেদের খুশিমত ইসলামী আইন-কানুন বাতিল করা বা বহাল রাখার শক্তি লাভ করে ; এবং বিধর্মীদের অনুমতি ছাড়া দেশের রাজস্ব আদার করা যদি কারও পক্ষে সম্ভব না হয় ; এবং মুসলমান বাসিন্দারা যদি আগের মত নিরাপদে বসবাস করতে না পারে ; তবে সে দেশটি রাজনৈতিকভাবে শত্রুদেশে (দারুল-হার্ব) পরিণত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।"

আমাদের শক্তি সংহত হওয়ার পর মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদদের ভারত দারুল-হার্ব এই সিদ্ধান্ত অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আব্দুল আজিজের বংশধর মৌলবী আব্দুল হাই নিম্নোক্ত স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন ; "কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত গোটা ভারতে এবং মূল হিন্দুস্থানের সন্নিহিত দেশসমূহে (অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে) বিস্তারিত খ্রীস্টান সাম্রাজ্য এখন শত্রুদেশ (দারুল-হার্ব), কারণ পৌত্তলিকতা (কুফর ও শিরক) এখন সর্বত্র অবাধে চালু হয়েছে এবং আমাদের পবিত্র আইন আর কার্যকরী হচ্ছে না। যখনই কোন দেশে অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখন সে দেশটা দারুল-হার্বে পরিণত হয়। পরিস্থিতির সামগ্রিক বিবরণ দেওয়া দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ; কিন্তু সকল আইনশাস্ত্রবিদরা এ বিষয়ে একমত যে, কলকাতা এবং তার অধীনস্থ এলাকাগুলো শত্রুদেশ (দারুল-হার্ব)।"

এই সব সিদ্ধান্ত বাস্তব ফল প্রসব করেছে। ওয়াহাবীরা, জ্ঞানের চেয়ে উৎসাহ যাদের বেশি, ভারত যথার্থই একটি শত্রুদেশে পরিণত হওয়ার বাস্তবতা থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য কর্তব্য। অধিকতর শিক্ষিত মুসলমানরা বর্তমান অবস্থাটা দুঃখের সাথে স্বীকার করে নিয়ে বিদ্রোহ করার সন্তোষজনক পরিবেশ নেই বলে মনে করছে। তারা মনে করে যে, তাদের ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধাটাই শুধু আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেমন, ইসলামী দেশে, যেখানে পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদা বজায় রয়েছে, শুক্রবারে জুমার নামায অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ভারতে শুধু যে, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনেকে জুমার নামায আদায় করে না তাই নয়, এমন কি অনেক মসজিদে জুমার নামায পড়তেই দেওয়া হয় না। কলকাতার দুইজন প্রখ্যাত মুসলমান, মোহামেডান কলেজের পরলোকগত হেড

প্রফেসর[১] এবং সাবেক প্রধান মুসলিম আইন অফিসার[২] শুক্রবারে জুমার নামাযে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা মনে করেন যে, ভারত শত্রুদেশে পরিণত হওয়ায় তাদের উপরোক্ত ধর্মীয় সুযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা বৃটিশ সরকারের অনুগত ও মাননীয় কর্মচারী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। ভারত শত্রুদেশে পরিণত হয়েছে এই মতে বিশ্বাসস্থাপনকারী মুসলমানদের অনেকেই জুমার নামাযে যোগদান থেকে বিরত রয়েছে, কারণ তাদের মতে এসব ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনের যে ক্ষতি হচ্ছে তা যখন বুঝতে পারবে তখন অধিকাংশ মুসলমান ওয়াহাবদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। উত্তর ভারতে আইনশাস্ত্রবিদরা এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সর্বশেষ যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন তা হাজার হাজার ধর্মাত্মা মানুষকে শান্তি প্রদানে সক্ষম হবে।

মুসলমান সমাজে এতদিন ধরে যে বাদানুবাদ চলে আসছে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমাদের শাসনের প্রতি তাদের মৌন সম্মতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু ইসলামের অনমনীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছ থেকে এই মৌন সম্মতি পাওয়াটাই যথেষ্ট। খ্রীস্টান সমাজের মত মুসলমান সমাজেও সম্পূর্ণ স্বাধীন বিবেকের লোক খুব কমই আছে এবং কোন প্রতিষ্ঠিত সরকার কেবলমাত্র দুনিয়ালোভী লোকদেরই সর্বদা নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যে সব তরুণ ভারতীয়, আমাদের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলগুলো থেকে লেখাপড়া শেষ করে বেরিয়ে গেছে, তারা সবাই তাদের বাপ-দাদাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে এশিয়ার বড় বড় ধর্মগুলো অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছে। সন্দেহবাদী এই উদীয়মান বংশধররা ছাড়াও আয়েশী জীবনযাপনে অভ্যস্ত বিত্তবান শ্রেণীও আমাদের পক্ষে রয়েছে, যারা নিয়মিত প্রার্থনা করে মনোরম পোশাকে সজ্জিত হয়ে মসজিদে গমন করে, এবং এতসব ব্যাপার নিয়ে কদাচিৎ মাথা ঘামায়। এই শ্রেণীর মুসলমানরা আমাদের পক্ষে রয়েছে এটা গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু ভারতে আমাদের অবস্থানের জন্য এটা খুবই দুঃখজনক সর্বোত্তম ব্যক্তিরা আমাদের পক্ষে নেই। এতদিন তারা আমাদের ঘোর বিরোধী ছিল, এবং এটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, বিরোধিতা করাকে অপরিহার্য কর্তব্য বলে তারা আর এখন মনে করছে না। বর্তমানে

---

১. মৌলবী মোহাম্মদ ওয়াজিহ ।

২. কাজী-ই-কু্জ্জাত ফজলুর রহমান।

আমরা তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি যা আশা করতে পারি তাহল অপ্রতিরোধ। কিন্তু একটা সৎ সরকারের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা থেকে উৎসারিত উচ্চকণ্ঠ সমর্থনকারীদের চেয়ে বরং ধর্মীয় কর্তব্যের প্রতি অবিচল আস্থাশীল ব্যক্তিদের মৌন সমর্থনের উপর নির্ভর করাই অধিকতর নিরাপদ।[১]

প্রশ্ন

বিজ্ঞ ভদ্রমহোদয়গণ এবং ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাতাবৃন্দ ঃ
নিম্নোক্ত বিষয়ে আপনাদের মতামত প্রদান করুন ঃ

ইংরেজ শাসনে থাকাকালে ভারতের উপর যদি কোন মুসলমান শাসক আক্রমণ পরিচালনা করেন তবে সে অবস্থায় ইংরেজদের 'আমান' প্রত্যাখ্যান করে আক্রমণকারীকে সাহায্য করা ভারতীয় মুসলমানদের কর্তব্য বলে কি আপনি মনে করেন ?

---

[১] সরকার যদি মুসলমান আইনশাস্ত্রবিদদের মতামতের উপর বিষয়টি নিষ্পত্তির ভার অর্পণ করাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন তাহলে নিম্নোক্ত প্রশ্নটি তাদেরকে স্থায়ীভাবে যেকোন পক্ষে ধরে রাখবে। এ ব্যবস্থাটা বর্তমানে সুখকর বলে মনে না হলেও আনুগত্যকে জনসমর্থনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাবার সাথে এটাই হবে সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃটিশ শাসনে ভারতীয় মুসলমানদের অন্যায়

সুতরাং ভারতীয় মুসলমানরা তাদের নিজস্ব আইন অনুসারেই আমাদের শাসনাধীনে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে বাধ্য। কিন্তু কেবল ততক্ষণই এই বাধ্যবাধকতা টিকে থাকতে পারে যখন আমরা চুক্তির ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব পালন করব এবং তাদের অধিকার ও ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধাগুলো মেনে চলব। যখনই আমরা ধর্মীয় বিধানসমূহ পালনে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের নাগরিক ও ধর্মীয় মর্যাদার ("আমান") উপর হস্তক্ষেপ করব তখনই আমাদের প্রতি তাদের কর্তব্যের অবসান ঘটবে। আমরা তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারি কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমরা আর আনুগত্য দাবি করতে পারব না। অবশ্য, ভারতে এটাই ইংরেজদের সুখ্যাতির কারণ যে, পূর্ববর্তী অন্য সকল বিজেতাদের মত সামরিক দখল বজায় রাখার পরিবর্তে জনসাধারণের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এমন একটা বেসামরিক সরকার তারা চালু করছে যার প্রতি জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থন রয়েছে। মুসলমানদের প্রতি গুরুতর কোন অন্যায় করা হলে অনুরূপ সরকারের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমনকি তাদের সাথে ছোটখাটো অবিচার করা হলেও সেটা গুরুতর রাজনৈতিক ভ্রান্তি হয়ে দেখা দিবে ;— ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক যার চূড়ান্ত পরিণতি দাঁড়াবে শাসক-শক্তির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক পাল্টে দেয়া, যাতে করে প্রজা হিসেবে তারা তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং রাজদ্রোহ ও জিহাদের পথ বেছে নিতে পারে।

আমার বিনীত অভিমত হচ্ছে এই যে, ভারত সরকার একাধিকবার অনুরূপ গুরুতর ভুল করেছেন। কিন্তু আমি যেগুলোকে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বলে মনে করি সেগুলোর ওপর আলোকপাত করার আগে এ পার্থক্যটা পরিষ্কার করে, বুঝাতে চাই যে, আমার মতামত শুধু সেই সব মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা শান্তিপূর্ণভাবে বৃটিশ শাসন মেনে নিয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর যে দুটি বিরাট ঘটনার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে তা হল সীমান্তে অবস্থিত বিদ্রোহীদের স্থায়ী শিবির এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবহমান ষড়যন্ত্র। সশস্ত্র রাজদ্রোহীদের সাথে বৃটিশ সরকার কোনরূপ আলাপ

আলোচনা চালাতে পারে না। যারা অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে অস্ত্র দিয়েই তাদেরকে ধ্বংস করতে হবে। শক্তির মাঝেই শান্তি নিহিত— অ্যালপাইনের পল্লীতে হেয় তুপেল সভ্রখের এই উপমাটি ভারত সাম্রাজ্যের বেলায় চমৎকার -ভাবে প্রযোজ্য। এবং অর্থনৈতিক বা অন্য যেকোন কারণেই হোক ইংরেজরা যেদিন এদেশে কোন ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে অগ্রসর হবার শক্তি হারিয়ে ফেলবে সেদিনই তাদেরকে নিকটস্থ বন্দর থেকে জাহাজে উঠতে হবে।

আমাদের এলাকার অভ্যন্তরে রাজদ্রোহীদের বেলায়ও ন্যায়বিচার অবাধে প্রয়োগ করতে হবে; কিন্তু ন্যায়বিচারের নামে ক্ষমা প্রদর্শিত হলে এবং ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে যারা চালিত হয়নি তাদেরকেও ক্ষমার পর্যায়ে টেনে আনা হলে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত লোকেরাও নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী রাজদ্রোহের মনোভাব পোষণ করবে। আইনসভা গ্রেফতারের যে ক্ষমতা শাসন বিভাগের ওপর ন্যস্ত করেছে তা দিয়েই সরকার দোষী ব্যক্তিদের শায়েস্তা করতে পারেন। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেই দলনায়কদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংযত করা যায় এবং তার ফলে স্বধর্মীদের প্রকাশ্য জমায়েত তারা আর খ্যাতির মর্যাদা লাভের সুযোগ পাবে না। এমনকি আদালত যাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে তাদেরকেও সরকার ঘৃণাপূর্ণ অনুকম্পা দৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং এতে করে তারা সাধারণত কয়েক বছর পরেই ওয়াহাবী মতাদর্শের পুরোধা হিসেবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝে আবার ফিরে আসতে পারে। সার্বিক দমননীতি প্রয়োগের দ্বারা ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদের চেষ্টায় পরিণতি দাঁড়াবে ধর্মান্ধদের উৎসাহকে অগ্নিশিখায় পরিণত করে সকল ধর্মভীরু মুসলমানদের সহানুভূতি তাদের দিকে আকৃষ্ট করা। অসন্তোষের সামান্যতম মনোভাব সৃষ্টির আগেই অবাধ্য শ্রেণীকে অবশ্যই আলাদা করে ফেলতে হবে এবং এটা করতে হলে সম্পূর্ণ ভদ্র প্রক্রিয়ায় অথচ সামগ্রিক মুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে।

কিন্তু অবাধ্যতার বিরুদ্ধে কঠোরতা প্রদর্শনের সাথে সাথে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অসন্তোষ সৃষ্টির মত ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ বিদ্যমান না থাকে। বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টির আগেই যদি অনুরূপ অনুসন্ধান সমাধা করা যায় তবে সেটাই হবে অধিকতর সম্মানজনক। প্রচণ্ড ষড়যন্ত্রের মুখে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তার মধ্যে উদারতা বা শুভেচ্ছার মনোভাব কদাচিৎ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা যদি ইতিপূর্বে মুসলমানদের ওপর কোন ব্যাপারে অবিচার করে থাকি তবে বর্তমানে ন্যায়বিচার প্রদর্শনে বিলম্ব

করার অর্থই হবে ক্ষতিকর আত্মম্ভরিতার নীতি আঁকড়ে থাকা। ভারতে বৃটিশ সরকার এখন এত শক্তিশালী যে তাকে আর দুর্বল ভাবার কোন অবকাশ নেই। রাজদ্রোহীদের সকলকেই সরকার কারান্তরালে আটকে রাখতে পারেন ; কিন্তু সমগ্র বিদ্রোহী দলটাকে কোনঠাসা করার আরও একটা মহত্তর উপায় আছে; সেটা হল সাধারণ মুসলমান সমাজ থেকে তাদেরকে আলাদা করে ফেলা। মুসলমানদের মনে অন্যায়বোধের যে পুরনো রোগ বৃটিশ শাসনামলে সৃষ্টি হয়েছে তাকে অপসারণ করেই এটা করা যেতে পারে।

ভারতীয় মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে ফিরিস্তি খাড়া করেছে, যেকোন সরকারের বিরুদ্ধেই তা আনা যথেষ্ট এবং এটা এমনই একটা বাস্তব ঘটনা যার সম্পর্কে আমরা কানে তুলো গুজে বসে থাকলেও কোন লাভ হবে না। তারা অভিযোগ করেছে যে, তাদের ধর্ম প্রচারকদের সম্মানজনক জীবনযাপনের প্রতিটি রাস্তা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তারা অভিযোগ করেছে যে, আমরা এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি যার ফলে তাদের গোটা সম্প্রদায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে এবং তারা ভিক্ষাবৃত্তি ও অবমাননাকর জীবনযাপনের অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তারা অভিযোগ এনেছে যে, তাদের যেসকল আইন অফিসার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্মীয় অনুমোদন দান করতেন এবং স্মরণাতীত কাল থেকে যারা ইসলামী পারিবারিক আইনের ব্যাখ্যা দান ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পালন করে এসেছেন তাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে আমরা হাজার হাজার পরিবারকে শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি। তারা অভিযোগ করেছে যে,ধর্মীয় কর্তব্য পালনের উপায়গুলো থেকে বঞ্চিত করে আমরা তাদের আত্মার' ওপর পীড়ন চালাচ্ছি। সর্বোপরি তারা এই অভিযোগও এনেছে যে, আমরা অসদুদ্দেশ্যে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অপব্যবহার করছি এবং তাদের শিক্ষা তহবিলের বিরাট অংক আমরা আত্মসাৎ করেছি। এই সকল সুনির্দিষ্ট অভিযোগ যা তারা প্রমাণ করতে পারবে বলে দাবি করে— এ ছাড়াও তাদের আরো অনেক ভাবাবেগপূর্ণ অভিযোগ রয়েছে, যেগুলো নির্বিকার বৃটিশ মনের ওপর বড় একটা দাগ না কাটলেও আয়ারল্যাণ্ডবাসীদের মত ভারতীয়দের অন্তঃকরণকে ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলতে পারে। তারা প্রচার করে থাকে যে, আমরাও যারা মুসলিম সাম্রাজ্যের ভৃত্য হিসেবে বাংলার মাটিতে পা রাখবার জায়গা পেয়েছিলাম তারাই বিজয়ের সময় কোনরূপ পরদুঃখকাতরতা দেখাইনি এবং গর্বোদ্ধত রূঢ়তা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের সাবেক প্রভুদের কর্দমে

প্রোথিত করেছি। এক কথায়, ভারতীয় মুসলমানরা বৃটিশ সরকারকে সহানুভূতিহীন, অনুদার ও নিকৃষ্ট তহবিল তছরূপকারী এবং দীর্ঘ এক শতাব্দী ব্যাপী অন্যায়াচারী হিসেবে অভিযুক্ত করে থাকে।

এসব অভিযোগ কতদূর সত্য এবং কতটা সুনিশ্চিত তা আমি খানিকটা খতিয়ে দেখতে চাই। কিন্তু পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ, পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে যাদের অপকর্মের বিবরণ দেয়া হয়েছে, মুসলমানদের প্রতি আমাদের আচরণের পর্যালোচনা পাঠ করার সময় যেন তাদের বিরুদ্ধে কোন তুচ্ছ অসন্তোষ মনে না জাগে। রাজদ্রোহ এবং ধর্মগত বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে বৈদেশিক শাসনের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি এবং ইংরেজরা যতদিন ভারতকে নিজের তাবেদারিতে রাখতে সক্ষম হবে ততদিন তাদেরকে বুঝতে হবে যে কি করে ভেতরের রাজদ্রোহী ও সীমান্তবর্তী বিদ্রোহীদের সমভাবে মোকাবিলা করতে হয়। আমার নিজের অভিপ্রায় হচ্ছে এই যে, যেহেতু আমি মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে যুক্তির অবতারণা করেছি সেহেতু বিপথগামী ওয়াহাবীদের প্রসঙ্গটা আর উত্থাপন করব না। কিন্তু পরে যাতে তাদের সম্পর্কে আমি চুপ থাকতে পারি সে জন্য এখানে তেমন দু'জন ইংরেজের কতিপয় বিবৃতি উদ্বৃত করতে চাইছি যারা মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ এবং মুসলিম রাজদ্রোহের মধ্যেকার সম্বন্ধ নির্ণয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে পারদর্শী। ভারতে নিস্ক্রিয় অসন্তোষ এবং সক্রিয় বিদ্বেষের মাঝে পার্থক্য খুবই ক্ষীণ। বাংলার শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের অভাব-অভিযোগের প্রতি আমাদের উপেক্ষার কারণে এমন একটা দলের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে অন্য সময় হলে যাদেরকে তারা উগ্রপন্থী ও বিদ্রোহী বলে প্রত্যাখ্যান করত।

ওয়াহাবীদের মামলায় সরকার পক্ষের ভারপ্রাপ্ত অফিসার [১] সম্প্রতি লিখেছেনঃ আমার মতে মুসলিম কৃষকদের ওপর ওয়াহাবী মতবাদের বিরাট প্রভাবের মূলে রয়েছে তাদের শিক্ষার প্রতি আমাদের অবহেলা।' আমাদের শাসনে পদমর্যাদা বিপর্যস্ত হওয়ার উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরাও কিরূপে সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে— যাদের শিক্ষার যৎসামান্য ব্যবস্থা আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে—সেসব বিষয়ের ওপরও তিনি আলোকপাত করেছেন। আম্বালা বিচারে ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে।' আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ওসমান আলী বলেছেঃ "তিন বছর হল আমি যশোর গিয়েছিলাম। সেখানে জজকোর্টের প্রধান পেয়াদার সাথে আমার সাক্ষাত

---

[১] মিঃ জেমস ও' কেনীলি, সি, এস,

৯—

হয়। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমি বললাম, আমার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছে। জওয়াবে তিনি বললেন, "তোমার মত একজন শিক্ষিত লোকের তো দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়া উচিত নয়। তুমি যদি আমার কথা মত কাজ কর তাহলে তোমার অবস্থার উন্নতি হবে।" আমি জানতে চাইলাম, 'সেটা কী?' তিনি জওয়াব দিলেন, 'তোমার ধর্মগ্রন্থ হাতে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোয় সফর কর, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ প্রচার কর এবং উৎসাহী লোকদের দেখতে পেলে তাদেরকে জিহাদের পথ অনুসরণের তাগিদ দাও।' তার উপদেশ মোতাবেক পার্শ্ববর্তী জিলাগুলোয় আমি প্রচার চালালাম। অনেকে আমাকে অর্থ প্রদান করলেন। এই লোকটাকে আমি যতদূর জানি তাতে করে বলতে পারি যে, তিনি আংশিক নিজস্ব বিশ্বাসের দরুন এবং আংশিক অর্থের জন্য প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করেন। গোটা দেশ এই জাতীয় লোকে ছেয়ে গেছে। তারা কৃষকদের উত্তেজিত করেছে এবং আম্বালার ঘটনায় দেখা গেছে যে, তাদেরকে খাটো করে দেখা যায় না এবং ভীরু বাঙ্গালীরাও উপযুক্ত পরিবেশে আফগানদের মত ভয়ঙ্কর লড়তে পারে।'

আরো একজন উচ্চতর কর্তা ব্যক্তি[১] লিখেছেনঃ 'এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এমন একটা ব্যবস্থা থেকে তারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে যা মূলতঃ উত্তম হলেও তাদের সংস্কারগুলোকে অনুমোদন দেয়নি এবং তারা যেসব বিষয়কে নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে সেগুলোর কোন ব্যবস্থাও সেখানে রাখা হয়নি। আর এ ব্যবস্থাটা অনিবার্যভাবেই তাদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং তাদের সকল সামাজিক ঐতিহ্যের বিরোধী।

'পুরাতন রীতি-নীতির প্রতি আস্থাবান শিক্ষিত মুসলমানরা দেখতে পাচ্ছে যে, সরকারী ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা এবং আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা কার্যত বঞ্চিত হয়ে পড়েছে, অথচ এসব ইতিপূর্বেই তাদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। তারা দেখতে পাচ্ছে যে, এগুলো সহ জীবনের অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধা এখন ঘৃণিত হিন্দুরা ভোগ দখল করছে। সত্যিকার ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত না হলেও ধর্মবিশ্বাসগত কারণে (পরোক্ষভাবে) তাদের প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়েছে তা থেকে উত্থিত অসন্তোষ উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানদের মন অধিকার করে রেখেছে। তাদের এই ধর্মান্ধতা, যার জন্য প্রচুর তাগিদ কোরআনে দেখতে পাওয়া যায়, ক্রমাগত ফেনিয়ে তোলা হচ্ছে

---

[১] মিঃ ই-সি বেইলী, সি. এস. আই. ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারী যার পাণ্ডিত্য ও সহানুভূতির জন্য মুসলমানরাও ঋণী।

এবং যতক্ষণ পর্যন্ত গোটা মুসলমান সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে অতি দ্রুত একদিকে একটা অজ্ঞ, ধর্মান্ধ, বিদ্রোহী জনসমাজের সৃষ্টি এবং অপর দিকে উচ্চ শিক্ষিত অথচ অত্যন্ত গোঁড়া একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর কর্তৃত্ব সাধারণ অজ্ঞ মুসলমানদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন ধর্মান্ধতায় উসকানী প্রদান অব্যাহত থাকবে।

এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, উচ্চতম অফিসার থেকে নিম্নতর স্তরের সকল সরকারী কর্মচারীর (এবং বর্তমান ভাইসরয়ের মত আর কেউ মুসলমানের অসন্তোষের কারণগুলোর এতটা গভীরে প্রবেশ করেননি) এখন এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, মহামান্যা রাণীর মুসলমান প্রজাদের প্রতি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি। ভারতীয় জনসমষ্টির একটা বিরাট অংশ যাদের সংখ্যা তিন কোটির মত হবে, বৃটিশ শাসনে নিজেদের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছে। তাদের অভিযোগ, মাত্র গতকালই যে দেশে তারা ছিল বিজেতা ও শাসক আজ সে দেশেই ভরণপোষণের যাবতীয় সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের অবস্থার অবনতি সংক্রান্ত এইসব অভিযোগের জওয়াব নীতিগত মনোভাবের ওপর নির্ভরশীল, কেননা তাদের প্রতি আমাদের উপেক্ষা এবং আমাদের রাজনৈতিক অজ্ঞতাই এর অন্যতম কারণ। এদেশে শাসন কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হওয়ার আগে মুসলমানরা এখনকার মত একই ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেছে, একই খাদ্য খেয়েছে এবং মূলতঃ একইভাবে জীবনযাপন করেছে। আজ অবধি কিছুদিন পরপরই তারা পুরনো জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে ; কিন্তু বৃটিশ শাসনে আর সব ব্যাপারেই তারা জাতি হিসেবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

তাদের এই অধঃপতনের জন্য শুধু যে আমরাই দায়ী তা নয়। হিন্দুদের অধিকারের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেই বলা চলে যে, মুসলমানরা আর আগের মত সরকারী চাকরি একচেটিয়াভাবে ভোগ দখল করতে পারে না। সম্পদ আহরণের এই প্রাচীন উপায় এখন বিকল হয়ে পড়েছে এবং মুসলমানদের এখন এমন একটা সরকারের অধীনে চাকরি-বাকরি সন্ধান করতে হবে যে সরকার গাত্রবর্ণ কিংবা ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে কোনরূপ বৈষম্যের ধার ধারে না। ভারতের উদ্ধত ও বেপরোয়া বিজেতা জাতি হিসেবে তারা হিন্দুদের অধঃস্তন পদে নিয়োগ করেছে কিন্তু সকল উচ্চতর পদগুলো নিজেদের দখলে রেখেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, এমনকি আকবরের প্রগতিশীল শাসন সংস্কারের পরেও বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদসমূহ নিম্নোক্ত-

রূপে বন্টন করা হয়ঃ— পাঁচ সহস্রাধিক অশ্বারোহীর অধিনায়কের পদ[১] সহ বারটি উচ্চতর পদে একজন হিন্দুকেও[২] নিয়োগ করা হয়নি। পরবর্তী পদগুলোতে পাঁচ হাজার থেকে পাঁচ শত অশ্বারোহীর অধিনায়কের পদসহ মোট ২৫২ জন অফিসারের মধ্যে মাত্র ৩১ জন ছিল হিন্দু এবং এটা হচ্ছে আকবরের রাজত্বকালের ঘটনা। পরবর্তী উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে একই পদমর্যাদার ৬০৯ জন কমাণ্ডারের মধ্যে মাত্র ১১০ জন ছিল হিন্দু; এমনকি উচ্চতর পদের সর্বনিম্ন সারির পাঁচশ' থেকে দুইশ অশ্বারোহীর ১৬৩ জন কমাণ্ডারের মধ্যে মাত্র ২৬ জন ছিল হিন্দু।

ইংরেজ গভর্ণমেন্টের অধীনে সরকারী চাকরিতে অনুরূপ একচেটিয়া অধিকার ভোগ করা যাবে এ রকম আশা করা মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত অযৌক্তিক হবে। কিন্তু এটাই তাদের প্রতিবেদন বা অভিযোগ নয়। তাদের ওপর থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা যে সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়েছে তা নয়, তবে ক্রমান্বয়ে তারা এই পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জীবন সংগ্রামে তাদেরকে যে হিন্দুদের সমান সুযোগ এখন পেতেই হবে এমন নয়, কিন্তু অন্ততঃ বাংলায় তারা কোন সুযোগ আর পাচ্ছে না। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তারা এমন একটা জাতি যাদের বিরাট ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কোন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নেই। ভারতে এ রকম একটা জাতির লোকসংখ্যা যখন তিন কোটি, তখন তাদেরকে নিয়ে কি করা যায় এ প্রশ্নটা তাদের নিজেদের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, শাসকদের জন্যও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

সারা পূর্ব-বাংলায় কৃষকদের অধিকাংশই হচ্ছে মুসলমান। নদীবহুল ও জলাভূমিতে পূর্ণ ঐসব জেলার আদিবাসীরা ভদ্র হিন্দু সমাজের কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হয়নি। আর্যদের দক্ষিণমুখী অভিযান সমুদ্রোপকূলবর্তী ব-দ্বীপ এলাকার গভীরে তেমন প্রবেশ করেনি, ফলে এ এলাকার আদিবাসীদের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কাজে কাজেই তারা হিন্দু প্রভাব বলয়ের বাইরে থেকে নিম্নতর শ্রেণীর হিসেবে প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের মাছ ধরা ও প্লাবিত জলাভূমিতে ধান চাষাবাদের মত কষ্টসাধ্য জীবিকায় নিয়োজিত থাকে। তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা এবং ধর্মীয় আচার

---

১. মনসব। "মোগল সরকারের অধীনে হিন্দু রাজন্যবৃন্দ" (কলকাতা, ১৮৭১) শীর্ষক প্রফেসর ব্লকম্যান কৃত চিত্তাকর্ষক অথচ সংক্ষিপ্ত বইটি পড়ে দেখুন।

২ শাহজাহানের রাজত্বকালে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এসব সামরিক পদবি বেসামরিক সরকারী কর্মচারীরা ব্যবহার করতেন।

অনুষ্ঠানের কঠোরতা ছিল না[১]। তাদেরকে এতদূর অপবিত্র মনে করা হয় যে, উচ্চবর্ণের কোন ব্রাহ্মণ তাদের মাঝে বসবাস করলে তাকে সমাজচ্যুত হতে হয়;[২] এবং পরবর্তী কয়েক পুরুষের মধ্যে তার বংশধররা আর ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। আবার জাতে উঠতে হলে তাদেরকে পুনরায় উত্তরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতে হয়, যে দিক থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের আগমন ঘটেছিল।[৩] কিন্তু মুসলমানরা অনুরূপ বর্ণবৈষম্যকে আদৌ প্রশ্রয় দেয়নি। কখনও সামরিক শক্তি হিসেবে আবার কখনও ব-দ্বীপ এলাকার জিলাগুলোতে কৃষি খামার গড়ার প্রকল্প নিয়ে তারা এই এলাকায় আসে। এমনকি যশোরের মত একটা পুরনো আবাদী জেলায়ও তারা এসেছিল কৃষি খামার গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে।[৪] ভারতের অভ্যন্তরভাগের প্রাচীন বীর অভিযাত্রীদের যেমন বিরাটকায় পশু বধ করে, দানবাকৃতির উপ-জাতীয়দের বশীভূত করে এবং ঘন বনাঞ্চল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে, তেমনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব-দ্বীপ এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপকদেরও এমন একটা অঞ্চলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে হয়েছে যে এলাকাটা ছিল সামুদ্রিক আগ্রাসনের শিকার।

মুসলমানরা এই ভূখণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে বিরাট এলাকা সংস্কার করে বসতি স্থাপন করে। তারাই পূর্ববঙ্গকে সর্বপ্রথম সমুদ্রের গ্রাস থেকে পৃথক করে বসবাসের উপযোগী করার সুখ্যাতি অর্জন করেছে। তাদের তৈরি বাঁধ ও পাকা রাস্তার ওপর দিয়েই পর্যটকরা এই এলাকায় আসা-যাওয়া করে এবং জঙ্গল পরিবৃত নিভৃত পল্লীর যেখানেই যাওয়া যাক না কেন সেখানেই মুসলমানদের তৈরি মসজিদ, দীঘি এবং সমাধি দৃষ্টিগোচর হবে। তারা যেখানে গিয়েছে সেখানেই তাদের ধর্ম বিস্তার করেছে, কিছুটা অস্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা কিন্তু প্রধানতঃ মানব হৃদয়ের দু'টো সহজাত প্রবণতার ওপর বলিষ্ঠ আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে। হিন্দুরা কখনই ব-দ্বীপ অঞ্চলের কৃষক অধিবাসীগণকে নিজেদের

---

[১] আমি এখানে ব-দ্বীপের সর্বশেষ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এলাকা ঢাকা ও বিক্রমপুরের দক্ষিণে অবস্থিত জিলা সমূহের কথা বলছি।

[২] ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জিলায় এবং সুন্দরবন এলাকায় ব্যক্তিগত অনুসন্ধান চালিয়ে আমি এসব ঘটনার সত্যতা যাচাই করেছি।

[৩] তাদের এহেন দুর্গতির কারণ এই যে, তারা নিম্নশ্রেণীর চণ্ডাল জাতের সঙ্গে বসবাস করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের পুরোহিত হিসেবে কাজ করেছে।

[৪] মিঃ জেমস ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড সি. এস. প্রণীত যশোর জিলার বিবরণ দ্রষ্টব্য (কলিকাতা, ১৮৭১) ভারতীয় ব-দ্বীপ এলাকার জিলাসমূহ সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিবরণের মধ্যে এটিই সর্বোত্তম।

সম্প্রদায়ের অংশীভূত বলে স্বীকার করেনি। কিন্তু মুসলমানরা ব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সকলের সামনেই ইসলামের প্রাথমিক সুবিধাগুলো তুলে ধরে। তাদের অদম্য ধর্মপ্রচারকরা প্রচার করেন ঃ "সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে তোমরা সবাই একইভাবে হাঁটু গেড়ে বস, যে আল্লাহর চোখে সব মানুষ সমান, সকল সৃষ্ট জীবই ধূলিসম নগণ্য। এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর প্রেরিত রাসূল।" যুদ্ধ জয়ের পর পরই সৈনিকের রণহুঙ্কার ধর্মগুরুর উপদেশামৃতে পর্যবসিত হয়।

অদ্যাবধি ব-দ্বীপ এলাকার কৃষকরা সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। দক্ষিণ বাংলায় ইসলাম এত দৃঢ়বদ্ধ হয়ে বসেছে যে, সেখানে একটা ধর্মীয় সাহিত্য রীতির উৎপত্তি এবং নিজস্ব জনপ্রিয় কথ্য ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাষা আর উত্তর ভারতের উর্দুর মাঝে পার্থক্য, হেরাতের ফার্সী ভাষা ও ভারতীয় উর্দুর মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। এসব পল্লীবাসীদের মধ্যে প্রাচীন প্রভাবশালী বংশীয় লোকদের উত্তরাধিকারীদের বিষয়-সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে। একদা শক্তিমান নামজাদা মুসলমান অভিজাতদের ধ্বংসাবশেষ গোটা প্রদেশের সর্বত্র পরিদৃশ্যমান স্মৃতি-স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ দেখেই তাদের কীর্তির বিরাটত্ব আঁচ করা যায়। মুর্শিদাবাদে একটি মুসলিম আদালত এখনও পর্যন্ত তাদের অবলুপ্ত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নকল মহড়া দিয়ে চলেছে এবং প্রতিটি জিলায় সাবেক নওয়াবদের কোন না কোন বংশধর ছাদবিহীন ভগ্ন প্রাসাদে অথবা শেওলাপড়া জীর্ণ দীঘির পাড়ে বসে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে। অনুরূপ পরিবারের অনেকের সাথেই আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। এদের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদগুলো বয়োঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী ও ভাইপো-ভাইঝিতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এই ক্ষুধার্ত বংশধরদের কারো সামনেই আত্মোন্নতির কোন সুযোগই আর নেই। তারা জীর্ণ ছাদযুক্ত ভগ্ন বারান্দায় বসে বসে ধুকছে, তারা ক্রমাগত ঋণের দরিয়ায় ডুবে যাচ্ছে, প্রতিবেশী হিন্দু মহাজনের সাথে ঝগড়া-বিবাদে সর্বস্বান্ত হয়ে শেষ অবলম্বনটিও তার কাছে বাঁধা দিচ্ছে। এভাবেই এই প্রাচীন মুসলিম পরিবারগুলোর শেষ চিহ্ন মুছে যাচ্ছে।

কোন ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত কেউ জানতে চাইলে আমি নগর-এর রাজাদের কথা উল্লেখ করব। বৃটিশরা যখন প্রথম তাদের সংস্পর্শে আসে তখন দুই শতাব্দীর ভ্রান্তি ও অপচয়ের পরেও তাদের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। রাজারা প্রাসাদের গম্বুজ শোভিত দরবারে বসে

ইংলণ্ডের দুটো জিলার সমান বিরাট এলাকার ওপর শাসন চালাতেন। কৃত্রিম হ্রদের এক পাশে মসজিদ এবং অন্য পাশে রাজাদের গ্রীষ্মকালীন প্রমোদ বাংলোগুলো শোভা পাচ্ছিল। এসব সৌধরাজির ছায়া হ্রদের জলরাশির ওপর অতি মনোরম দেখাচ্ছিল। হ্রদের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ফুল বাগিচার শোভিত একখণ্ড দ্বীপ। একটা চমৎকার নৌকা হ্রদের বাঁধানো ঘাট থেকে ঐ দ্বীপটা পর্যন্ত যেন বুক ফুলিয়ে যাতায়াত করছে। দুর্গপ্রাকারে সৈনিকরা পাহারা দিচ্ছে; এবং অস্তগামী সূর্যের নরম আভা অপসৃত হওয়ার সময় বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ের হাস্যধ্বনি ও রাজকীয় বাগানের মধ্যস্থিত ঝর্ণার পেছন থেকে মেয়েদের কলরব ভেসে আসে। বিরাটাকৃতির ফটক ছাড়া দুর্গের আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। ছাদবিহীন মসজিদে দেয়ালগাত্রে খোদিত অলঙ্কারাজি অনেক আগেই ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। কৃত্রিম খাল শোভিত বিরাট বাগানগুলো এখন জঙ্গলে অথবা ধানক্ষেতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাদের যে দীঘিগুলো একদিন মৎস্যরাজিতে পূর্ণ ছিল এখন তা এঁদো ডোবায় পরিণত হয়েছে। তাদের গ্রীষ্মকালীন বাংলো এখন ইটের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। ধ্বসে পড়া দেয়ালের খণ্ড খণ্ড ভগ্নাবশেষ এখানে সেখানে পরিদৃশ্যমান এবং মূল স্থাপত্যরীতি অনুসরণে নির্মিত বিরাটাকৃতির জানালাগুলো নীরব হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু প্রাচীন রাজকীয় হ্রদের বর্তমান অবস্থাটাই হচ্ছে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক। হ্রদের অদূরবর্তী রাজপ্রাসাদ, যা এখন একটা পাতালপুরীর রূপ পরিগ্রহ করেছে, একদিন তার সুদৃশ্য প্রাচীরের মনোরম ছায়া ফেলতো হ্রদের পানির ওপর।[১] কারুকার্যশোভিত নাট্যশালা এখন ভগ্ন পরিত্যক্ত বাড়িতে পরিণত হয়েছে। দুর্দশাকবলিত মহিলারা, যারা এখনও নিজেদেরকে প্রিন্সেস[২] উপাধিতে ভূষিত করেন, এখন আর রাজকীয় হ্রদে সন্ধ্যাকালীন নৌবিহারে গমন করেন না। এককালের রাণীরা এখন আর ছাদের নিচে বসবাস করেন না। একদিন যারা ছিল প্রাসাদের বাসিন্দা, তারা এখন আস্তাবল সদৃশ জীর্ণ কোঠায় বসবাস করছে। নগর রাজাদের বিলীয়মান ঐশ্বর্যের মধ্যে হ্রদের ছোট্ট জলস্রোতটি ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট

---

[১] প্রাসাদ ও দীঘিটার অবস্থা আমি ১৮৬৪ সালে যেমন দেখেছি এখানে তার বিবরণ দিচ্ছি। এর পর আমি শুনেছি দীঘিটার সংস্কার করা হয়েছে এবং প্রাসাদটি প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

[২] রাণী।

নেই। পুরনো এই রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের মাঝে দাঁড়িয়ে পথিকের মনে জেগে ওঠে প্রাচীন রোমের চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্যের অনুরূপ ধ্বংসাবশেষের স্মৃতিঃ-

'টাইবারের ঐশ্বর্য দ্রুত অপসৃয়মান,
নিয়তির লিখন কে পারে খণ্ডাতে ?
বিশ্বকর্মার এ কি পরিবর্তনশীল লীলা!
যা কিছু কঠিন অবশেষে তাই পড়ে ধ্বসে ;
যা কিছু উপযুক্ত তাই টিকে যায় শেষে।[১]

ভগ্ন প্রাসাদরাজির এক কোণায় বসে রাজপরিবারের বংশধররা মজে যাওয়া হ্রদের দিকে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি মেলে নিকৃষ্ট ধরনের মিষ্টান্ন চিবোচ্ছে আর নিজেদের দুঃখ-দুর্গতির কাহিনী আলোচনা করছে। কোন রাজনীতিবিদ যদি বৃটিশ কমন্স সভায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে চান, তাহলে বাংলার যেকোন পুরনো মুসলিম পরিবারের সত্যিকার ইতিহাস বর্ণনা করাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হবে। তাঁকে প্রথমে বর্ণনা করতে হবে পুরনো সেই মহামান্য রাজার কাহিনী যিনি তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক হিসেবে বিরাট জনপদের ওপর শাসন চালিয়েছেন, সারা জীবন যিনি বিভিন্ন মনোরম প্রাসাদে রাজ দরবারের যাবতীয় নিয়ম-কানুনসহ জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং মৃত্যুর পর যার সমাধিসৌধ ঘিরে গড়ে উঠেছে জাঁকালো মসজিদ আর সে সবের দেখাশোনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওয়াক্‌ফ্‌ (ধর্মীয় ট্রাস্ট)। এর পর তাঁকে বর্ণনা করতে হবে বর্তমান সময়ের সেইসব নির্বোধপ্রায় রাজকীয় বংশধরদের কাহিনী, যারা তাদের বাগানে কোন ইংরেজ শিকারীদলের আগমনের কথা শোনামাত্র গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে এবং আগন্তুক মেহমানের প্রতি সম্মান দেখাবার কথা বলে ভৃত্যরা তাদেরকে টেনে বের করে আনলে যারা একঘেয়ে নাকিসুরে বলে চলে যে, ক'দিন আগেই মাত্র কয়েকশ' টাকার জন্য তাদেরই প্রাসাদে একজন ব্যবসায়ীর প্রাণনাশ করা হয়েছে।

আমি বাংলার মুসলমান কৃষক ও মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর কথা মোটামুটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম। কারণ, যে বিশেষ একটা সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে ইংরেজদের সৃষ্টির সামনে প্রকৃত ছবিটা তুলে ধারা প্রয়োজন। আমি আবার উল্লেখ করছি যে, আমার মতামতগুলো কেবলমাত্র দক্ষিণ বাংলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই প্রদেশের ঘটনাবলীর সাথেই আমি বিশেষভাবে পরিচিত এবং

---

[১] বেলী রচিত স্পেন্সারের "রোমের ধ্বংসাবশেষ"।

আমি যতদূর জানি তাতে করে বলা যায় যে, এখানকার মুসলমান অধিবাসীরাই বৃটিশ শাসনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিম্নোক্ত মন্তব্যসমূহ ভারতের সকল মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য এ কথা বিশ্বাস করতে হলে, কিংবা পাঠকদের বিশ্বাস করতে বলা আমার জন্য খুবই দুঃখজনক।

কোন জাতিকে যদি আত্মোন্নতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হয় তবে তারা হচ্ছে দক্ষিণ বাংলার মুসলমান অভিজাত শ্রেণী। তাদের সম্পদ আহরণের পুরনো উপায়গুলো বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিবেশী হিন্দু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট করা; কৃষকদের উপর লুণ্ঠন চালাবার জন্য সৈন্য পাঠানো ; আগন্তুক ব্যবসায়ীদের উপর কর ধার্য করা ; ভূমি রাজস্ব ব্যয় করে বন্ধুর সাহায্যে আদালত থেকে মুক্তি বা অব্যাহতি ক্রয় করা বিবাহ, জন্ম, ফসল কাটা ও গ্রামীণ জীবনের অনুরূপ বহুবিধ ছোটখাটো বিষয়ের উপর কর ধার্য করে অর্থ আদায় করা ইচ্ছামত আবগারী শুল্ক উসুল করা এবং পবিত্র রমজান মাসে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য বিক্রি করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা ইত্যাকারের যাবতীয় সুযোগ ও অধিকারের কাজ তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। রাজকীয় কর আদায় ব্যবস্থাটা ছিল বাংলায় অর্থ উপার্জনের প্রথম বিরাট সুযোগ এবং মুসলমান অভিজাত ব্যক্তিরা এই ব্যবস্থাটা একচেটিয়াভাবে অধিকার করেছে।[১] পুলিশের সকল অফিসার ছিল মুসলমান এবং পুলিশবাহিনী তাদের অর্থোপার্জনের আর একটা বিরাট সূত্র ছিল। আইন-আদালত ছিল অর্থোপার্জনের তৃতীয় বৃহত্তম সূত্র এবং এখানেও মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম ছিল। সর্বোপরি তাদের সেনাবাহিনী ছিল, যার অফিসাররা মোটেও প্রাপ্ত কমিশনের অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে তার সূদের উপর নির্ভরশীল থাকার মত ভদ্রলোক ছিল না বরং এই অফিসাররা ছিল বিজেতা সামরিক ব্যক্তিদের এমন একটা বিরাট সংঘবদ্ধ দল যারা কৃষকদেরকে সেন্যবাহিনীতে তালিকাভুক্ত করে তাদের নামে বেতন বাবদ বিরাট অংকের টাকা রাষ্ট্রীয় খাজাঞ্চি খানা থেকে সংগ্রহ করত। একশ' সত্তর বছর আগে বাংলার কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তানের দরিদ্র হয়ে পড়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু বর্তমানে তার পক্ষে ধনী হওয়াটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, মুসলমান অভিজাত ব্যক্তিরা ছিলেন বিজেতা এবং সেইহেতু সরকারী প্রশাসনের ওপর স্বভাবতই তারা একচেটিয়া অধিকার

---

[১] এটা অধিকতর বিশ্লেষণ সাপেক্ষ ব্যাপার এবং পরে এ প্রসঙ্গে আরো আলোচনা করা হচ্ছে।

দাবি করেছেন। হয়ত কখনও কোন বিত্তবান হিন্দু এবং কদাচিৎ কোন হিন্দু সেনাধ্যক্ষ প্রশাসনযন্ত্রের উপরিস্তরে ঠাঁই পেয়েছে[১]। কিন্তু এরকম ব্যাপার এত কম ঘটেছে যে এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এগুলো ছিল একান্তই বিরল ঘটনা। তিনটি পৃথক সূত্র ধরে অভিজাত মুসলিম পরিবারে অর্থাগম হত-সামরিক অধিনায়কত্ব, রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগীয় অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতা। এগুলোই ছিল তাদের বিরাট অবস্থার আইনানুগ সূত্র, এছাড়াও ছিল দরবারের চাকরি এবং ভাগ্যোন্নতির আরো শত রকমের অজানা সূত্র। শেষোক্ত সূত্রগুলো সম্পর্কে আমি শেষ প্যারার প্রারম্ভে আভাস দিয়েছি এবং এ বিষয়ে অধিক আর কিছু বলব না। কিন্তু সরকারী ক্ষমতার যে তিনটি আইনানুগ ও প্রকাশ্য সূত্রের ওপর তারা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেছে তার মাঝে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেই আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই যে, বৃটিশ শাসনাধীনে দক্ষিণ বাংলার মুসলমান পরিবারগুলোর সামনে ঐ সূত্রগুলোর কিছু আর অবশিষ্ট আছে কিনা।

সূত্রগুলোর প্রথমটি হচ্ছে সেনাবাহিনী এবং সেখানে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান আমাদের কোন রেজিমেন্টে আর প্রবেশ করতে পারে না ; এবং যদিওবা আমাদের সামরিক ব্যবস্থায় তাঁর জন্য কদাচিৎ কোন জায়গা করে দেওয়া যায় তবু সেটা তার জন্য অর্থোপার্জনের কোন সুযোগই আর সৃষ্টি করতে পারে না[২]। আমার

---

১. এরকম ঘটনা যখনই ঘটেছে তখনই তা মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ সৃষ্টি করেছে। অর্থ লগ্নীকারী রাজা টোডরমল এবং সেনাপতি রাজা মানসিংহের ঘটনা হচ্ছে এ সম্পর্কে সর্বাধিক পরিচিত দুটো ঘটনা। তাদের পদোন্নতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সাধারণ মুসলমানরা দিল্লী বাদশাহী দরবারে আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল। কিছু সংখ্যক মুসলমান সেনাধ্যক্ষ রাজা মানসিংহের অধীনে রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। অপেক্ষাকৃত কম সংকীর্ণমনা মুসলমান বাদশাহদের আমলে কতজন হিন্দু উচ্চপদে নিযুক্তির সুযোগ লাভ করে সে হিসেব ইতিপূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি।

নগণ্য সংখ্যক অভিজাত মুসলমান গভর্নর জেনারেলের কাছ থেকে কমিশন লাভ করেছে, কিন্তু আমার জানা মতে, রাণীর কাছ থেকে কমিশন একজনও পায়নি। ভারতীয়রা কেবলমাত্র সাধারণ সৈনিক হিসেবে আমাদের সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করতে পারে এবং কদাচিৎ কারো কোন পদোন্নতি হয়ে থাকলে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না, কারণ স্থানীয়ভাবে কমিশন পেয়েই ও 'রকম পদোন্নতি ঘটেছে। এমনকি যে একটিমাত্র ক্ষেত্রে কোন মুসলমান সম্মানজনক ক্যাপ্টেন উপাধি লাভ করেছেন তিনি হলেন ক্যাপ্টেন হেদায়েত আলী। সিপাহী বিদ্রোহের সময় কর্নেল র‍্যাটারী তাকে সামনে টেনে আনেন-তার সম্পর্কে আমি যা জানি তা হল, শুধুমাত্র নিজের কর্মগুণেই কোন মুসলমান মহামান্যা রাণীর কমিশন লাভ করতে পারেন।

ব্যক্তিগত বিশ্বাস, আজ হোক কাল হোক, অভিজাত ভারতীয়রা কতিপয় বিধিনিষেধের আওতায় বৃটিশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। যেকোন রেজিমেন্টের সৈনাপত্যের দায়িত্ব সব সময় একজন ইংরেজের উপর ন্যস্ত থাকবে। অবশ্য, এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকরী করার আগে এর বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কেননা উত্তর ভারতের সামরিক জাতিগুলো তাদের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের নেতৃত্বে যেকোন সময় ঘুরে দাঁড়াতে পারে অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে তারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। সামরিক বাহিনীতে এদের অন্তর্ভূক্তি সাগ্রহে অনুমোদিত হওয়া উচিত। বর্তমানকালে, রাণী অধীনস্ত সামরিক বাহিনীর কোন কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারের পক্ষে বিরাট সৌভাগ্য গড়ে তোলা সম্ভবপর নয় এবং এ সম্পর্কে মুসলমানরা যথেষ্ট সচেতন রয়েছে। কিন্তু সামরিক বাহিনীতে চাকরির সম্মান ও ভদ্রোচিত জীবনযাপনকে খাটো করে দেখে তারা তীব্রভাবে অনুভব করে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে যে সুযোগ-সুবিধা তাদের পাওয়া উচিত ছিল তা থেকে তারা বঞ্চিত রয়েছে।[১]

অভিজাত মুসলমানদের সৌভাগ্য গড়ার দ্বিতীয় সূত্র ছিল রাজস্ব আদায়। এ ব্যাপারে তারা যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভোগ করেছে তার মূলে ছিল ইসলামের রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন। কর আদায় ছিল জয়ের অনিবার্য চিহ্ন এবং বিজেতারা শুধু যে কর পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন তাই নয়, বরং এটা আদায়ের দায়িত্বও ছিল অত্যন্ত লাভজনক কাজ। আর এ ব্যাপারে তো বিতর্কের তেমন অবকাশ নেই যে, ভারতে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে বিজেতাদের সম্পর্ক রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তে বরং মুসলিম আচরণবিধির দ্বারাই নির্ধারিত হত। গর্বিত বিদেশীরা খুঁটিনাটি কর সংগ্রহ কার্যকে ঘৃণার চোখে দেখত এবং সেজন্য কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি কর আদায়ের দায়িত্ব হিন্দু পেয়াদাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এ ব্যবস্থাটা এতদূর সর্বব্যাপক হয়ে দাঁড়ায় যে, আকবর ঠিক এই কারণটির দৃষ্টান্ত টেনে একজন হিন্দুকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন। সাম্রাজ্যের অর্থমন্ত্রী পদে টোডরমলের নিয়োগের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশের জন্য মুসলমান রাজন্যবৃন্দ বাদশাহর কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। বাদশাহ প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের সম্পত্তির এবং উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত জমিজমার দেখাশুনা কারা করে থাকে '?"

---

[১] এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে আমি বেঙ্গল ক্যাভালরীর ক্যাপ্টেন অসবর্ণের নাম উল্লেখ করব। অতি সম্প্রতি তিনি 'ক্যালকাটা অবজার্ভারে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

"আমাদের হিন্দু কর্মচারীরা"— রাজন্যবৃন্দ জওয়াব দিলেন। আকবর বললেন ঃ "ভাল কথা। তাহলে আমাকেও আমার সম্পত্তি তদারকের জন্য একজন হিন্দুকে নিয়োগ করতে দিন।"

অর্থ সংক্রান্ত ঊর্ধ্বতন পদগুলো মুসলমানদের হাতে থাকলেও কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায়ের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাদের হিন্দু পেয়াদাদের উপর ন্যস্ত করা হয়। এতে করে হিন্দুরা কার্যতঃ একটি অধঃস্তন রেভেনিউ সার্ভিস গড়ে তোলে এবং আদায়কৃত রাজস্ব উপরিওয়ালা মুসলমান কর্তাদের কাছে সমর্পণের আগে তারা তাদের নিজস্ব মুনাফাটা পকেটস্থ করে ফেলতো। শেষোক্ত ব্যক্তিরা বাদশাহর কাছে দায়ী ছিল এবং তারা মুসলিম অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসূত্রে পরিণত হয়। সিভিল কোর্টের মাধ্যমে নয়, বরং সৈনিকের ধারালো তলোয়ারের বলেই তারা ভূমিরাজস্ব উসুল করত। বিভিন্ন জেলায় বকেয়া খাজনা উসুল করার জন্য লুণ্ঠনকারী দস্যুদের নিয়োগ করা হত এবং তারা শেষ পয়সাটা আদায় না হওয়া পর্যন্ত গ্রামবাসীদের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে যেত। কৃষকরা এবং হিন্দু পেয়াদারা সব সময় নির্ধারিত খাজনার চেয়ে কিছু কম আদায় হলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকত; কিন্তু ঊর্ধ্বতন মুসলমান অফিসাররা নির্দিষ্ট অংক অপেক্ষা যতটা সম্ভব বেশি আদায়ের জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালাতেন।[১]

বাংলায় ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় দিল্লীর বাদশাহর প্রধান রাজস্ব অফিসারদের দায়িত্ব লাভের ঘটনার মাধ্যমে। মোটা অংকের উৎকোচ দেয়ার পরিবর্তে তলোয়ারের জোরেই এই নিয়োগ আমরা ক্রয় করেছি। কিন্তু আমাদের পদের নাম ছিল বাদশাহর দেওয়ান বা প্রধান রাজস্ব অফিসার।[২] এ কারণে মুসলমানরা মনে করে যে, মুসলমানদের প্রবর্তিত বিধিব্যবস্থাগুলো যথাযথভাবে মেনে চলতে আমরা বাধ্য; কারণ ঐ বিধিব্যবস্থার প্রশাসনের দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। আমার মতে, এ সম্পর্কে সংশয়ের খুব

---

১. রাজস্ব আদায়ে এই দ্বৈত সংঘাতের চমৎকার বিবরণ যশোর জেলা সম্পর্কিত মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাংলার প্রায় প্রতিটি জিলার মহাফেজ খানায় এই রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

মিঃ আইচিসনের চুক্তিনামায় ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট তারিখের ফরমান অথবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রণীত ১৮১২ সালের কোয়ার্টো তথ্যমালা থেকে (১৬নং ও ২০নং) দেখুন।

কমই অবকাশ আছে যে, চুক্তি রচনার সময় উভয় পক্ষ এটাই বুঝেছিল,[১] যদিও অনুদান ও চুক্তির দ্বারা আমরা একেবারে অধঃস্তন কর্মচারীর পর্যায়ে নেমে যাইনি বলেই আমার ধারণা। ইংরেজরা বেশ কয়েক বছর মুসলমান অফিসারদের স্বপদে বহাল রাখে ; এবং তারা যখন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ার কথা চিন্তা করে তখন যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে ধীরে-সুস্থেই তা' করা হয়। পুরানো ব্যবস্থার ওপর যে প্রচণ্ড আঘাতটা আমরা হেনেছি সেটা বোধকরি শঠতার পর্যায়েই পড়ে এবং ইংরেজরা বা মুসলমানরা কেউই এর পরিণতি তখন উপলব্ধি করতে পারেনি। এটা হচ্ছে লর্ড কর্ণওয়ালিস এবং জনশো'র প্রবর্তিত এক গাদা সংস্কার কার্যক্রম, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে। এই নয়া ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা আমরা সেই সব উচ্চপদস্থ মুসলমান অফিসারের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছি যারা ইতিপূর্বে প্রকৃত কর আদায়কারী কর্তৃপক্ষ ও সরকারের মাঝে যোগসূত্র ছিল এবং যাদের অশ্বারোহী পেয়াদারা ছিল ভূমিরাজস্ব নীতি কার্যকরীকরণের স্বীকৃত বাহিনী। মুসলমান রাজস্ব অফিসার এবং তার সশস্ত্র পেয়াদা বাহিনীর জায়গায় আমরা প্রতি জেলায় একজন করে ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করি। তাদের সাহায্যকারী হিসেবে ছিল গুটিকতক নিরস্ত্র রাজস্ব-পুলিশ এবং এরা তার আদালতের সাধারণ চাপরাশির মতই কাজ করত। ফলে মুসলমান অভিজাতরা ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সাথে তাদের সাবেক সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অথবা জমির আয়ের একটা নির্ধারিত অংশের ভোক্তা হিসেবে নিছক জমির মালিকে পরিণত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এই পরিবর্তন সূচিত না হয়ে এবং এর পরিসমাপ্তিকেই চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে এই ব্যবস্থা অভিজাত মুসলমান পরিবারগুলোর মর্যাদায় মারাত্মক আঘাত হানে। কেননা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মৌল উদ্দেশ্যই ছিল কৃষকদের ওপর তদারকি কার্যে নিয়োজিত অধঃস্তন হিন্দু অফিসারদের জমির মালিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। ১৭৮৮—১৭৯০ সালের এম-এস সেটেলমেন্ট রিপোর্টটি আমি সযত্নে পড়ে দেখেছি; এবং ১৭৯৩ সালের আইনে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সম্পর্কে যে ব্যবস্থাই থেকে থাক না কেন, আমার কাছে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা

---

[১] ওয়াহাবী মামলায় সরকার পক্ষের ভারপ্রাপ্ত অফিসার লিখেছেনঃ"কতকটা প্রতিশ্রুতি আকারে তৎকালে প্রচলিত মুসলমানী বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম এবং তা' আমরা আজো পরিণত করি।'

পড়েছে যে, আমাদের তদানীন্তন রাজস্ব অফিসারদের দৃষ্টি পূর্ববর্তী ব্যবস্থার মাত্র তিনটি যোগসূত্রের উপর নিবদ্ধ ছিল—রাষ্ট্র, স্থানীয় এজেন্ট বা জমিদার যারা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত এবং কৃষক যারা জমি চাষ করত। পুরনো ব্যবস্থার এই তিনটি বিষয়ই শুধু আমাদের নয়া পরিকল্পনায় বহাল থাকে এবং মুসলমান আমলে রাজস্ব ব্যবস্থার বাদবাকী সব যোগসূত্রগুলোকে হয় বাতিল করা হয় অথবা বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বতন্ত্র তালুকদার বা অধঃস্তন ভূস্বামীদের পৃথকীকরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাটির কথা উল্লেখ করা যায়। এই তালুকদারবা উর্ধ্বতন মুসলিম জমিদারদের কাছ থেকে জমির স্থায়ী দখলীস্বত্ব লাভ করে ভূমি রাজস্ব সরাসরি রাষ্ট্রকে প্রদান করত এবং তারা অনেক মুসলমান অভিজাত পরিবারের প্রভাব প্রতিপত্তির শিকারে পর্যবসিত হয়। এই পরিবারগুলো তাদের জমিদারী কোন বিশেষ এলাকা স্থায়ী ভিত্তিতে খামার হিসেবে পত্তনী দিলেও তারা অধঃস্তন ভূস্বামীদের উপর সর্বদাই খবরদারী চালাত এবং প্রয়োজনমত তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর কিংবা যেকোন ছুতানাতায় অর্থ আদায় করত। যে অফিসারটি মুসলমানদের অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি লিখেছেনঃ "যেসব হিন্দু কর আদায়কারী ঐ সময় পর্যন্ত নিম্নপদের চাকরিতে নিযুক্ত ছিল, নয়া ব্যবস্থার বদৌলতে তারা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হয়। নয়া ব্যবস্থা তাদেরকে জমির উপর মালিকানার অধিকার এবং সম্পদ আহরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে, অথচ মুসলমানরা নিজেদের শাসনামলে এই সুযোগ-সুবিধাগুলোই একচেটিয়াভাবে ভোগ করেছে।[১]

অতএব এটাই হচ্ছে প্রথম সাধারণ অন্যায়, যার জন্য অভিজাত মুসলমানরা বৃটিশ সরকারকে প্রকাশ্যে দোষারোপ করে থাকে। তাদের অভিযোগ হল, আমরা এই শর্তে মুসলমান বাদশাহ্‌র কাছ থেকে বাংলার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব লাভ করি যে, মুসলমানদের প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলো আমরা বহাল রাখব ; কিন্তু নিজেদেরকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করা মাত্রই আমরা সে শর্তগুলো লঙ্ঘন করেছি। এ অভিযোগের জওয়াবে আমাদের বক্তব্য হল বাংলায় মুসলমানদের প্রশাসনিক কার্যকলাপ তদারকের দায়িত্ব লাভ করার পর আমরা দেখতে পেলাম যে, তাদের অনুসৃত বিধি ব্যবস্থাগুলো এতদূর পক্ষপাতিত্বমূলক, এত দুর্নীতিদুষ্ট এবং মানবিকতার প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে এতটা

---

[১] মিঃ জেমস ও কিনীলি।

দুঃখজনক যে, সেগুলো বহাল রাখলে আমরা সভ্যতার কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হব। প্রতিটি জেলার রেকর্ডপত্র থেকে আমরা এটা প্রমাণ করতে পারি যে, মুসলমান সরকারের লোলুপদৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুই ছিল রাজস্ব। "প্রশাসনের প্রায় সমুদয় কাজের চাপ একত্রিত হত ভূমি-রাজস্ব আদায়কারীদের উপর এবং এরা প্রয়োজনমত রাজস্ব আদায় করে দিতে পারলে নিজেরাও যথেষ্ট সম্পদ আহরণ করতে পারতো। ভূস্বামীরা ইচ্ছামত খাজনা আদায় করতো এটা যেমন ছিল জনসাধারণের দুর্দশার কারণ, তেমনি ভূস্বামীদের কর্মচারীরাও তাদেরকে সর্বস্বান্ত করে উপরি পাওয়া উসুল করে দিত। অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা ছিল নিরর্থক। অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করা বা না করা ছিল ভূস্বামী এবং তার কর্মচারীদের খেয়াল-খুশীর ব্যাপার। অভিযোগকারী কদাচিৎ প্রতিকার আশা করতে পারত, কেননা অত্যাচারীদের প্রায় সকলেই ছিল ভূস্বামীর কর্মচারী এবং কোন সময় তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হলেও লুণ্ঠনকারীই ছিল ভূস্বামীর প্রকৃত বন্ধু।"[১]

আসল সত্য এই যে, মুসলমানদের সরকারী প্রশাসন ছিল মুষ্টিমেয় লোকের বিত্তশালী হওয়ার যন্ত্রমাত্র, অধিকাংশের স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ার নয়। বিপুল সংখ্যক কৃষক খালি গায়ে গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ হয়ে এবং শরতের বৃষ্টিতে ভিজে কী কষ্টের মধ্যে যে জমি চাষ করে সেটা কখনও শাসকদের হৃদয় স্পর্শ করতে বা বিবেকে দংশন সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না, কেননা এদেরই দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে প্রতি জিলায় মুষ্টিমেয় পরিবার বিলাসবহুল জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছে। আমরা যখন শর্ত লংঘন করে পুরনো ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু করলাম কেবল তখনই জনসাধারণের অস্তিত্ব রক্ষার পথ তৈরি হয়। অভিজাত মুসলমানদের প্রতি যে বিরাট অন্যায় কাজটা আমরা করেছি সেটা হচ্ছে তাদের অধিকারের

---

[১] মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ডের যশোর জিলার বিবরণ; ৬৭ পৃষ্ঠা। অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও আমার নিজের 'পল্লী বাংলার ঘটনাবলী' থেকে বারংবার উদ্ধৃতি দেয়া থেকে আমি বিরত থাকছি এবং এখানে শুধু এটুকুই বলে রাখছি যে, বাংলার ঘটনাবলী ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের গোচরে না আনা পর্যন্ত ভারত সরকার বৃটিশ জাতির অবমাননার দায়ে হতে থাকেন। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের পতনের মত এদেশেও এক বিরাট রাজশক্তিকে অধিকতর তীব্রতার সাথে বিধ্বস্ত করতে পেরেছে এমন একটি সরকার নির্যাতিত ও বিধ্বস্ত ভারতীয় জাতির মাঝে একটি সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হওয়ায় তারা উক্ত অপরাধ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে, কারণ বৃটিশ জাতির লিখিত গৌরব ইতিহাস থেকে এটা কিছুটা। স্বতন্ত্র কৃতিত্বের দাবি রাখে।

সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া। এটা না করা পর্যন্ত তাদের অধিকারের কোন স্থায়ী ভিত্তি যেমন ছিল না, তেমনি তার কোন সীমারেখাও টানা ছিল না। শাসকশক্তির স্বীকৃত দাবি বরবাদ করার বিনিময়ে আমরা তাদেরকে জোতজমি ভোগদখলের স্থায়ী সুযোগ দান করেছি ; কিন্তু সেই সাথে দখলী অধিকারের সীমারেখাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যে জাতি কয়েক শতাব্দী ধরে লুণ্ঠনের অবারিত অধিকার ভোগ করে এসেছে, তারা গভর্নর জেনারেলের সামান্য একটা কলমের খোঁচায় সম্পাদিত ব্যবস্থা অনুসারে নিজ নিজ জোত-জমি পরিচালনার শান্তিপূর্ণ কলাকৌশলের শিক্ষা রপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। পল্লীবাসীদের উপর উৎপীড়ন চালাবার মুসলমানী একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হয়েছে, এবং তার ত্রিশ বছর পরে পুনর্গ্রহণ আইন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের সৌভাগ্য রবিও চির অস্তমিত হয়েছে। এই আইনগুলো সম্পর্কে আমি পরে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করব; তবে এখানে শুধু এটুকু বলে রাখছি যে, সম্পত্তির দলিল প্রণয়নের ব্যাখ্যার কঠোর বিধিবিধান আরোপ করার এই সব আইনের দ্বারা রাষ্ট্র লাভবান হয়েছে—কিন্তু মুসলমানরা তাদের বাদশাহদের শাসনামলে এসব বিধিবিধানের সাথে আদৌ পরিচিত ছিল না। বিগত পঁচাত্তর বছরে বাংলার অভিজাত মুসলমান পরিবারগুলো হয় ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা আমাদের শাসনের ফলে সৃষ্ট নতুন সমাজ বিন্যাসের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে–এরা হল উদ্ধত, প্রগল্ভ ও অলস, কিন্তু সর্বশেষ রাজপুরুষদের বংশধররূপে তারা এখনও পরিচিত।

সুতরাং সেনাবাহিনী এবং রাজস্ব বিভাগের উচ্চতর পদ মুসলমানদের অর্থ সঞ্চয়ের এই দু'টি প্রাথমিক বিরাট সূত্র সম্পর্কে আমরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি তার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে, কিন্তু আমাদের এ ব্যবস্থার ফলে বাংলার মুসলমান পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অভিজাত মুসলমানদের জন্য সেনাবাহিনীতে প্রবেশের দরজা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি কারণ আমাদের নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে বাইরে রাখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করেছি। প্রশাসনের সবচেয়ে লাভজনক পদ থেকে আমরা তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিনষ্ট করেছি কারণ জনকল্যাণ ও ন্যায়বিচারের স্বার্থেই এটা করা প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু এই সকল কারণ যতই যুক্তিযুক্ত হোক না কেন, বৃটিশ শাসনে বিপন্ন প্রাচীন অভিজাতরা তা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সেনাবাহিনীতে ঢুকতে না দেওয়াটা মুসলমানদের দৃষ্টিতে একটা বিরাট অন্যায় কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং তাদের পুরনো রাজস্ব ব্যবস্থা আমরা পরিত্যাগ করায় তারা এটাকে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা বলেই গণ্য করছে।

তাদের বিরাট অবস্থার তৃতীয় সূত্র ছিল বিচার বিভাগে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, এক কথায় বেসামরিক চাকরিতে তাদের একচেটিয়া অধিকার ভোগ। পরিবর্তিত পরিবেশের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা অন্যায় হবে, কিন্তু এটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ভারতীয়দের মধ্যে যে কয়জন উচ্চতর সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের কিংবা হাইকোর্টের বিচারকের আসনে বসার সুযোগ পেয়েছে তাদের একজনও মুসলমান নয়। কিন্তু এদেশের শাসন কর্তৃত্ব আমাদের করায়ত্ব হওয়ার পরে কিছুদিনের জন্য প্রশাসনের সর্বত্র মুসলমানরা স্বপদে টিকে ছিল। মুসলমান কালেক্টররাই ভূমিরাজস্ব আদায় করেছে; মুসলমান 'ফৌজদার' ও 'ঘাটওয়ালারা' পুলিশ বাহিনীর অফিসার হিসেবে কাজ করেছে। একটা বিরাট মুসলিম ডিপার্টমেন্ট, যার সদর দফতর ছিল মুর্শিদাবাদের নিজাম প্রাসাদে, এবং প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় বিস্তৃত একটা প্রশাসনিক কাঠামো ফৌজদারী আইনের শাসনকার্য নির্বাহ করেছে। বাংলার সকল জেলা-কয়েদীর কাছ থেকে মুসলমান জেলাররা ঘুষ আদায় করেছে। কাজী অথবা মুসলমান আইনশাস্ত্রবিদরা সিভিল কোর্ট এবং পারিবারিক আইন আদালতে বিচারকের আসনে উপবেশন করেছে। এমনকি ন্যায়বিচারের স্বার্থে আমরা যখন সুশিক্ষিত ইংরেজ অফিসারদের আদালতে নিয়োগ করি তখনও মুসলমান আইনজ্ঞরা আইনের ব্যাখ্যাতা হিসেবে কাজ করার জন্য তাদের পাশে আসন গ্রহণ করেছে। ইসলামী আইন সারা দেশের আইন হিসেবে বহাল থাকে এবং সরকারী প্রশাসনের অধঃস্তন পদগুলোতে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার তখনও টিকে ছিল। কেবল তারাই সরকারী ভাষায় কথা বলতে পারত এবং ফার্সীতে হাতে লেখা সরকারী রেকর্ড পত্রের পাঠোদ্ধার কেবল তাদের দ্বারাই সম্ভব ছিল।[১] কর্নওয়ালিশ বিধি এই একচেটিয়া অধিকার ভেঙ্গে দেয় এবং এতে বিচার বিভাগের ওপর শ্লথ গতিতে হলেও রাজস্ব ব্যবস্থার ওপর তীব্রতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোম্পানির শাসনের প্রথম পঞ্চাশ বছর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার সিংহভাগটি মুসলমানরাই পেয়েছে । কোম্পানির ক্ষমতা লাভের একশ' বছরের শেষ অর্ধাংশে স্রোতের গতি উল্টে যায়, প্রথমে আস্তে আস্তে কিন্তু পরে অপেক্ষাকৃত তীব্রতর গতিতে, কারণ সাবেক মুসলমান বিজেতাশক্তির উত্তরপুরুষদের বিদেশী ভাষার পরিবর্তে স্থানীয় জনসাধারণের মাতৃভাষায় সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার অনিবার্য দায়িত্ব তখন সরকার উপলব্ধি করেন। এই সময় হিন্দুরা মঞ্চে প্রবেশ করে এবং ক্রমান্বয়ে সকল স্তরের সরকারী চাকরি সম্পূর্ণভাবে তাদের দখলে এসে যায়। এমনকি দক্ষিণ বাংলায়,

---

[১] 'শিকাস্তা' নামীয় এক ধরনের সাংকেতিক ভাষা।

যেখানে পুরনো রীতিতে সরকারী কাজকর্ম চালানো এখনও কিছুটা সম্ভব, সেখানেও জেলা কালেক্টরেটগুলোতে অতি নগণ্য সংখ্যক তরুণ মুসলমান অফিসার দেখতে পাওয়া যাবে।[১] যে কয়জন পুরনো মুসলমান কর্মচারী এখনও টিকে আছে তাদের দাড়ী সাদা হয়ে গেছে কিন্তু তাদের কোন উত্তরাধিকারী নেই। এমনকি দশ বছর আগেও মুসলমান নাজিররা অবসর গ্রহণের সময় তাঁদের পরিত্যক্ত পদে স্বধর্মীয়দের বসিয়ে যেতে পেরেছে; কিন্তু এখন কেবল জেলখানায় দু' একটা অধঃস্তন চাকরি ছাড়া আর কোথায়ও ভারতের এই সাবেক প্রভূরা ঠাঁই পাচ্ছে না। বিভিন্ন অফিসে কেরানীর চাকরি আদালতের দায়িত্বশীল পদে, এমনকি পুলিশ সার্ভিসের উর্ধ্বতন পদগুলোতে সরকারী স্কুলের উৎসাহী হিন্দু যুবকদের নিয়োগ করা হচ্ছে।[২]

নন-গেজেটেড পদের মত সাধারণ চাকরি থেকে শুরু করে উচ্চতর পদগুলো পর্যন্ত এই প্রশ্নটা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের দ্বারা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি পরিসংখ্যানের হিসেবেও সন্দেহাতীতভাবে ধরা পড়বে। বছর দু'য়েক আগে অনেকগুলো প্রবন্ধে[৩] আমি দেখিয়েছি যে, বাংলায় বিচার ও রাজস্ব বিভাগের চাকরি থেকে মুসলমানদের কিভাবে বাদ দেয়া হয়েছে। এই দুইটি বিভাগের চাকরি যেমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তেমনি এতে নিয়োগের সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্ন যথেষ্ট সতর্কতার সাথে বিচারবিবেচনা করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধগুলো পত্রিকায় প্রকাশের পরপরই ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়, এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় এ সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনাও হয়। কলকাতার মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার হার তদন্তের জন্য বাংলা সরকার একটা কমিশন নিয়োগ করেন। কিন্তু এসবের শেষ ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যা বরাবরের মত বর্তমানেও প্রতি বছর হ্রাস পাচ্ছে।

নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান থেকে আমার এ মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। সরকারী চাকরির উচ্চতম স্তরের বেলায় মুসলমানদের অভিযোগের বড় একটা কারণ নেই, কেননা (১৮৬৯ সালের এপ্রিলে যেখানে আনুপাতিক হার ছিল

---

[১] 'আমলা'।

[২] এই মন্তব্য বঙ্গ প্রদেশের সব জায়গাতেই প্রযোজ্য; তবে সকল জেলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হলেও ভাগলপুর ও পাটনা বিভাগের জেলাগুলোতে এর ব্যতিক্রম রয়েছে।

[৩] উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নেতৃস্থানীয় পত্রিকা 'পাইওনিয়ার'এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলো আমি আলোচ্য পরিচ্ছেদে অবাধে কাজে লাগিয়েছি।

মুসলমান একজন আর হিন্দু দুইজন; আর বর্তমান হার হচ্ছে মুসলমান একজন, হিন্দু তিনজন। দ্বিতীয় স্তরে ঐ সময়ের হার ছিল মুসলমান দুইজন আর হিন্দু নয় জন ; এখনকার হার হচ্ছে মুসলমান একজন আর হিন্দু দশজন। তৃতীয় স্তরের চাকরিতে ঐ সময়ের হার ছিল মুসলমান চার জন এবং হিন্দু ও ইংরেজ মিলে সাতাশ জন; আর বর্তমানে তিনজন মুসলমান এবং হিন্দু ও ইংরেজ মিলে চব্বিশ জন। অধঃস্তন স্তরে ১৮৬৯ সালে মুসলমান চারজন আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের মিলিত সংখ্যা ছিল ত্রিশ জন ; আর বর্তমানে এই হার দাঁড়িয়েছে মুসলমান চারজন অন্যান্য সম্প্রদায় উনচল্লিশ জন। শিক্ষানবিশী পর্যায়ে ঐ সময়ের হার ছিল মোট আটাশটির মধ্যে মাত্র দুইজন মুসলমান ; আর বর্তমানে সেখানে একটিও মুসলমান নেই।

অপেক্ষাকৃত মর্যাদাসম্পন্ন ডিপার্টমেন্টগুলোতে মুসলমানদের অবস্থাটা এতই করুণ যে, বাংলার রাজনৈতিক দলসমূহ এদিকে তেমন একটা ভ্রূক্ষেপ করেনি। এই বিভাগগুলোতে চাকরির আনুপাতিক হার ১৮৬৯ সালে নিম্নরূপ ছিলঃ এ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্ণমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের তিনটি গ্রেডে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৪, মুসলমান একজনও নয়; শিক্ষানবিশী পর্যায়ে হিন্দু চার জন ও ইংরেজ দুইজন, কিন্তু মুসলমান একজনও নয়। সাব-ইঞ্জিনিয়ার গণ-পূর্ত বিভাগের সুপারভাইজার পদে হিন্দু চব্বিশ জন আর মুসলমান একজন, ওভারসিয়ার পদে মুসলমান দুইজন আর হিন্দু তেষট্টি জন। এ্যাকাউন্টস অফিসার পদে হিন্দু পঞ্চাশজন কিন্তু মুসলমান একজনও নয়; এবং আপার সাবর্ডিনেট ডিপার্টমেন্টে হিন্দু বাইশজন, কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা শূন্যের কোঠায়।

কিন্তু বেসামরিক চাকরির তালিকায় যে বাস্তব অবস্থা বিরাজমান তা বাড়িয়ে দেখাবার কোন প্রয়োজন করে না। এমন একটা গেজেটেড চাকরির তালিকা আমি প্রণয়ন করেছি যেখানে ইংরেজ, মুসলমান ও হিন্দুরা নিয়োগের সমান সুযোগ পাবার অধিকারী। তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ

বাংলায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্টনের খতিয়ান ঃ এপ্রিল, ১৮৭১

	ইউরোপীয়ান	হিন্দু	মুসলমান	মোট
চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস (মহামান্যা রানী কর্তৃক ইংলণ্ড থেকে নিয়োগপত্র প্রদত্ত)	২৬০		০	২৬০
রেগুলেশন বহির্ভূত জেলাসমূহে[1] বিচার বিভাগয় অফিসার	৪৭	০	০	৪৭
এক্সট্রা এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার	২৬	৭	০	৩৩
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	৫৩	১১৩	৩০	১৯৬
ইনকামট্যাক্স এসেসর	১১	৪৩	৬	৬০
রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট	৩৩	২৫	২	৬০
স্মল কজ কোর্টের জজ এবং সাব-অর্ডিনেট জজ	১৪	২৫	৮	৪৭
মুন্সেফ ...		১৭৮	৩৮	২১৬
পুলিশ বিভাগ, সকল গ্রেডের গেজেটেড অফিসার	১০৬	৩	০	১০৯
গণপূর্তবিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং এস্টাবলিশমেন্ট	১৫৪	১৯	০	১৭৩
গণপূর্তবিভাগ, সাব-অর্ডিনেট এস্টাবলিশমেন্ট	৭২	১২৫	৪	২০১
গণপূর্ত বিভাগ একাউন্ট, এস্টাবলিশমেন্ট...	২২	৫৪	০	৭৬
মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, মেডিক্যাল কলেজে, জেলখানায়, দাতব্য চিকিৎসালয়ে, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও রোগ প্রতিষেধক বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারী এবং জেলা মেডিক্যাল অফিসার ইত্যাদি, ইত্যাদি..	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
জনশিক্ষা বিভাগ	৩৮	১৪	১	৫৩
শুল্ক, নৌ-চলাচল, জরিপ, আফিম নিয়ন্ত্রণ[2] ইত্যাকারের বিভিন্ন বিভাগ	৪১২	১০	০	৪২২
মোট	১,৩৩৮	৬৮১	৯২	২,১১১

---

১. এরা এবং এর পরবর্তী গ্রেডের কর্মচারীরা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত।

২. ঊর্ধ্বতন অফিসারদের ধরা হয়নি। আফিম বিভাগের কিছু সংখ্যক অফিসার গেজেটেড নয়।

একশ' বছর পূর্বে রাষ্ট্রীয় চাকরির সকল পদ মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। শাসকশক্তি কদাচিৎ কখনও অনুগ্রহ বিতরণ করলে হিন্দুরা তাই গ্রহণ করে কৃতার্থ হত এবং সামান্য দু'একটা জায়গায় কিংবা দু'চারটে কেরানী পদে ইউরোপীয়ানদের মুখ দেখা যেত। কিন্তু উপরের হিসেবে দেখানো হয়েছে যে, পরবর্তী সময়ে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের আনুপাতিক হার দাঁড়িয়েছে এক-সপ্তমাংশেরও কম। ইউরোপীয়ানদের তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে অর্ধেকেরও বেশি। ইউরোপীয়ানদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক-পঞ্চমাংশের কম। এক শতাব্দী পূর্বে সরকারী প্রশাসনে যে জাতির একচেটিয়া অধিকার কায়েম ছিল, বর্তমানে তাদের আনুপাতিক হার মোট সংখ্যার তেইশ ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে। এটাও আবার শুধুমাত্র গেজেটেড চাকরির বেলায় প্রযোজ্য, যেখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্টনের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রেসিডেন্সী শহরের অপেক্ষাকৃত সাধারণ চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিয়োগ প্রায় সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গিয়েছে। ক'দিন আগে দেখা যায় যে, কোন একটা বিভাগে এমন একজনও কর্মচারী নেই যে মুসলমানদের ভাষা পড়তে জানে; এবং বস্তুত কলকাতায় এখন কদাচিৎ এমন একটা সরকারী অফিস চোখে পড়বে যেখানে চাপরাশী ও পিয়ন শ্রেণীর উপরিস্তরে একজনও মুসলমান কর্মচারী বহাল আছে।

এ রকম হওয়ার কারণ কি এই যে, মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা অধিকতর যোগ্য এবং তারাই শুধু সুবিচার পাবার দাবি রাখে? অথবা ব্যাপারটা কি এই যে, বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে মুসলমানদের এত বেশি সুযোগ রয়েছে যে, সরকারী চাকরি গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক এবং তাই চাকরির জায়গাটা তারা হিন্দুদের এখতিয়ারে ছেড়ে দিয়েছে? হিন্দুরা নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট মেধার অধিকারী, কিন্তু সরকারী কর্মক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার জন্য যে রকমের সার্বজনীন ও অনন্য মেধা থাকা দরকার বর্তমানে তা তাদের নেই এবং তাদের অতীত ইতিহাসও একথার পরিপন্থী। বাস্তব সত্য হল এই যে, এদেশের শাসন কর্তৃত্ব যখন আমাদের হাতে আসে তখন মুসলমানরাই ছিল উচ্চতর জাতি ; এবং শুধুমাত্র মনোবল ও বাহুবলের বেলাতেই উচ্চতর নয়, এমনকি রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনায় দক্ষতা এবং সরকার পরিচালনায় বাস্তব জ্ঞানের দিক থেকেও তারা ছিল উন্নততর জাতি। এ সত্ত্বেও মুসলমানদের জন্য এখন সরকারী চাকরি এবং বেসরকারী কর্মক্ষেত্র এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মর্যাদাবান মুসলমানদের জন্য বর্তমানে যে একটিমাত্র লৌকিক কর্মক্ষেত্র খোলা আছে তা' হল আইন আদালত। চিকিৎসা ক্ষেত্র একটা ভিন্ন রকমের পেশা এবং সে সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করব। এমনকি আইনের জায়গাতেও মুসলমানদের প্রবেশের সুযোগ বর্তমান সরকারী চাকরির চেয়ে অধিকতর কঠোরতার সাথে বন্ধ হয়ে পড়েছে। বঙ্গীয় হাইকোর্টে মহামান্যা রাণী কর্তৃক নিযুক্ত বিচারকদের মধ্যে এখন দু'জন হিন্দু[১] রয়েছেন কিন্তু মুসলমান একজনও নেই। একদা যে জাতির লোকেরা গোটা বিচার বিভাগের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভোগ করেছে তাদের মধ্য থেকে হাইকোর্টে একজনও বিচারক নিয়োগের প্রশ্ন বর্তমানে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও হিন্দুদের জন্য সমান অকল্পনীয়। ১৮৬৯ সালে আমি যখন ভারতীয় চাকরিসমূহের সর্বশেষ পরিসংখ্যান প্রণয়ন করি তখন বিচার বিভাগের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ ঃ

মহামান্যা রাণীর নিযুক্ত মোট ছয়জন আইন অফিসারের মধ্যে চারজন ইংরেজ ও দুইজন হিন্দু ছিল, কিন্তু মুসলমান একজনও ছিল না ; হাইকোর্টের উচ্চতর গেজেটেড পদে মোট একুশজন অফিসারের মধ্যে সাতজন ছিল হিন্দু কিন্তু মুসলমান একজনও ছিল না। ব্যারিস্টারদের মধ্যে তিনজন ছিল হিন্দু (এই সংখ্যা বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমার ধারণা), কিন্তু মুসলমান একজনও ছিল না।

কিন্তু হাইকোর্টে উকিলের পদে (নিম্নতর ব্যারিস্টারী ধরনের পেশা) নিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকাটা সর্বাধিক করুণ ইতিহাসের পরিচায়ক। বর্তমানে যারা জীবিত তাদের সকলেরই মনে আছে যে, আইনের এই পেশাটা সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদেরই করায়ত্ত্ব ছিল। বর্তমান তালিকাটা ১৮৩৪ সালের অবস্থা অনুসারে তৈরি হয় এবং ঐ সময়কার উকিলদের মধ্যে যারা ১৮৬৯ সালে জীবিত ছিল তাদের মধ্যে ইংরেজ একজন, হিন্দু একজন এবং মুসলমান দু'জন ছিল। ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা ইংরেজ ও হিন্দুর সম্মিলিত সংখ্যার প্রায় সমান ছিল আনুপাতিক হিসেবে ইংরেজ ও হিন্দু সাত আর মুসলমান ছয় জন। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে উকিল হিসেবে সনদ প্রাপ্তদের মধ্যে যারা ১৮৬৯ সালে জীবিত ছিল তাদের সবাই মুসলমান। এমনকি ১৮৫১ সালেও যারা সনদ পেয়েছে তাদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ইংরেজ ও হিন্দুর সম্মিলিত সংখ্যার সমান। এরপর থেকেই এ পেশায় নতুন ধরনের লোকদের সমাগম ঘটতে থাকে। ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে

---

[১] এরা সরকারী চাকরির প্রথম গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত। এদের বেতন বছরে ৫,০০০ পাউণ্ড।

যোগ্যতা যাঁচাই শুরু হয়ে যায় এবং তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৫২ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত মোট সনদ প্রাপ্ত দুইশত চল্লিশ জন ভারতীয়দের মধ্যে দুইশত উনচল্লিশ জনই হিন্দু, আর মুসলমান মাত্র একজন।

আইন ব্যবসায়ের পরবর্তী গ্রেডে, অর্থাৎ হাইকোর্টের এটর্নী, প্রক্টর ও সলিসিটর[১] পদে ১৮৬৯ সালে হিন্দু সংখ্যা ছিল সাতাশ কিন্তু মুসলমান একজনও ছিল না। শিক্ষানবিশ হিসেবে কর্মরত উদীয়মান আইনজীবীদের মধ্যেও হিন্দুর সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ, কিন্তু মুসলমান সেই শূন্যের কোঠায়। এই পেশার যেকোন বিভাগের দিকেই দৃষ্টি ফিরাই না কেন, সবখানেই একই অবস্থা পরিদৃষ্ট হচ্ছে। হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার অফিসে ১৮৬৯ সালে গেজেটেড পদমর্যাদাসম্পন্ন মোট ১৭ জন কর্মচারীর মধ্যে ৬ জন ছিল ইংরেজ অথবা ইস্ট ইণ্ডিয়ান, আর হিন্দু ছিল ১১ জন কিন্তু একজনও মুসলমান ছিল না। রিসিভার অফিসে মোট ৪ জনের মধ্যে দুইজন ইংরেজ ও দুইজন হিন্দু ছিল, কিন্তু মুসলমান একজনও ছিল না। আইনের সকল শাখাপ্রশাখায় একাউন্ট অফিসে, শেরিফের অফিসে, করোনারের অফিসে এবং দোভাষীদের অফিসে মোট ২০ জনের মধ্যে ইংরেজ ৮ জন ও হিন্দু ১১ জন, আর মুসলমান মাত্র ১ জন ছিল। তালিকার এই একটিমাত্র মুসলমানই গোটা মুসলমান জাতির একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বিরাজমান; তিনি হচ্ছেন একজন দুর্দশাগ্রস্ত 'মওলা'[২] যার বেতন সপ্তাহে মাত্র ছয় শিলিং।

এরপর থাকছে চিকিৎসা পেশার কথা। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে, ভারতীয় ডাক্তাররা যে ধরনের চিকিৎসায় অভ্যস্ত তা' উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে কদাচিৎ পেশা হিসেবে পরিগণিত হতে পেরেছে। মুসলমান ভদ্রলোকদের জন্য দু'জন করে চিকিৎসক প্রয়োজন হয়। একজন হচ্ছেন সত্যিকার চিকিৎসক, তার উপাধি 'তিব্বি', ইংরেজ লেখকরা যাদেরকে ' হাকিম' বলে উল্লেখ করে থাকেন। এরা রোগীর কাছ থেকে উত্তম পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। অপরটির নাম 'জাররাহ', সহজ ইংরেজিতে যার মানে ক্ষৌরকার। ক্ষৌরকর্ম থেকে শুরু করে অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ পর্যন্ত যাবতীয় অস্ত্রোপচারের কাজ এরাই করে থাকে। আবার ঔষধের চিকিৎসক এবং অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসকের মাঝে ব্যবধানটা এত তীব্র যে, একজন যশস্বী 'তিব্বি' কারো ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাধতেও অস্বীকার করবে। এটা অস্ত্রোপচারকারী ক্ষৌরকারের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত

---

[১] অরিজিন্যাল সাইডের আওতায়।

[২] আইন-অফিসার।

বিষয়। চিকিৎসার প্রায় সমগ্র ক্ষেত্রটাই কার্যত এদের এখতিয়ারভুক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রকৃত মুসলমান চিকিৎসকরা বর্তমানে একটা ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীতে পর্যবসিত হয়েছে। উত্তর ভারতের বড় বড় শহরে তাদেরকে হয়ত এখনও দেখা যাবে, কিন্তু বাংলার জেলাগুলোতে এদের কোন নাম নিশানাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। চিকিৎসা পেশা এখন সম্পূর্ণভাবে অশিক্ষিত মুসলমান ক্ষৌরকার এবং হিন্দু ডাক্তারদের[১] একচেটিয়া অধিকার চলে গেছে।

এতদসত্ত্বেও উত্তর ভারতের যেখানেই টিকে থাক না কেন, মুসলমান চিকিৎসকদের পাণ্ডিত্য ও সাধু স্বভাব বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সক্রিয় চিকিৎসকের জীবনের চেয়ে এরা বরং নিঃসঙ্গ জীবনযাপনই বেশি পছন্দ করে। এরা ফার্সী ও আরবী কিতাব থেকে চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করেছে এবং আমাদের ইংরেজি চিকিৎসাবিদ্যাকে ক্ষৌরকার-অস্ত্রোপচারকারীর সমপর্যায়ে বলে গণ্য করে। ফলে বাংলায় কোন ভদ্রবংশজাত মুসলমান কদাচিৎ চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে চাইবে—যদিও সেখানে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র অত্যন্ত প্রশংসনীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। সেখানে গরীব মুসলমান ছেলেরা বড় জোর কম্পাউণ্ডারী করার জন্য যতটুকু চিকিৎসা জ্ঞান থাকা দরকার তার বেশি শিখতে চাইবে না। এক কথায় বলা যায় যে, তারা ঠিক পরবর্তী ক্ষৌরকার-অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসকদের মতই; উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের কাছে তাদের কোনই মর্যাদা নেই এবং মুষ্টিমেয় যে কয়জন মুসলমান চিকিৎসক এখনও টিকে আছে তারা এদেরকে আদৌ স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়। যাদের কাছ থেকে এরা চিকিৎসাবিদ্যা শিখেছে তাদের প্রতিও তারা অকৃতজ্ঞ এবং খুব একটা বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। কিন্তু বহু সংখ্যক হিন্দু ডাক্তারের সাথে আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশে দেখেছি যে, নিষ্ঠা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে তারা এই মহৎ পেশার উপযুক্ত বলে নিজেদেরকে গণ্য করতে পেরেছে। কিন্তু অনুরূপ একজনও মুসলমান ডাক্তার আমার চোখে পড়েনি। হয়ত উত্তর ভারতে তারা থাকতে পারে, কিন্তু বাংলায় এমন একজনও মুসলমান ডাক্তার নেই যে নাকি চিকিৎসা বিদ্যায় স্বীকৃত কোন একটা শ্রেণীর গণ্ডিতে পড়তে পারে। ১৮৬৯ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছেঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

[১] হিন্দু ডাক্তারদের মধ্যেও দুটো শ্রেণী আছেঃ কবিরাজ, যারা প্রাচীন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে এবং যাদেরকে হাতুড়ে বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইংরেজদের কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ চিকিৎসক।

ঔষধ বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েট উপাধিপ্রাপ্ত মোট চারজন ডাক্তারের মধ্যে তিনজন হিন্দু ও একজন ইংরেজ, কিন্তু মুসলমান একজনও নেই। মেডিসিনে ব্যাচেলর ডিগ্রীপ্রাপ্ত মোট ১১ জনের মধ্যে হিন্দু ১০ জন আর ইংরেজ একজন। এল-এম-এফ উপাধিধারী মোট ১০৪ জনের মধ্যে ইংরেজ ৫ জন, হিন্দু ৯৮ জন এবং মুসলমান মাত্র একজন। সম্প্রতি সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট দুইজন ভারতীয় চিকিৎসককে 'বাহাদুর' উপাধি দান করেছেন। রাজনৈতিক প্রশ্ন বিবেচনা করে ঠিক করা হয় যে, উপাধি দু'টির একটি একজন হিন্দুকে এবং অপরটি একজন মুসলমানকে দেওয়া উচিত, এবং এটা সুবিদিত যে, এ ধরনের উপাধিকে মুসলমানরা কত মূল্যবান বলে মনে করে। এ সত্ত্বেও আমি জানতে পেরেছি যে, উক্ত উপাধি প্রদানের জন্য যে মুসলমান ভদ্রলোককে বাছাই করা হয় তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও উক্ত উপাধি তাঁকে তাঁর নিজ দেশবাসীর মধ্যে যথোপযুক্ত সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, আমাদের মেডিক্যাল স্কুলে যে চিকিৎসাবিদ্যা শিখানো হয় মুসলমানরা তাকে ভদ্রলোকের পেশা বলে গ্রহণ করতে পারেনি। তা'ছাড়া সামাজিক কুসংস্কারের দরুন এই পেশার দরজা অন্যান্য পেশার মতই মুসলমান পরিবারের ছেলেদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুদের আধিক্য ও প্রাধান্যের জন্য সরকারী চাকরির দরজাও তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

বাংলার মুসলমানদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির অধিকতর করুণ কোন বিবরণ আমি কদাচিৎ পড়েছি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি ফার্সী পত্রিকা[১] সম্প্রতি লিখেছেঃ "উচ্চস্তরের বা নিম্নস্তরের সকল চাকরি ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার সকল শ্রেণীর প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য; তথাপি এমন সময় এসেছে যখন মুসলমানদের নাম আর সরকারী চাকরিয়াদের তালিকায় প্রকাশিত হচ্ছে না; কেবল তারাই চাকরির জায়গায় অপাংক্তেয় সাব্যস্ত হয়েছে। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনারের অফিসে কতিপয় চাকরিতে লোক-নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিন্তু অফিসারটি সরকারী গেজেটে কর্মখালীর যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন তাতে বলা হয় যে, এই শূন্য পদগুলোতে

---

[১] 'দূরবীন' জুলাই, ১৮৬৯।

কেবলমাত্র হিন্দুদের নিয়োগ করা হবে।[১] মোট কথা হল, মুসলমানদের এখন এতটা নিচে ঠেলে দেয়া হয়েছে যে, সরকারী চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও সরকারী বিজ্ঞপ্তি মারফত এটা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের জন্য কোন চাকরি খালি নেই। তাদের অসহায় অবস্থার প্রতি কারো দৃষ্টি নেই এবং এমনকি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতেও রাজি নয়।"

উড়িষ্যার মুসলমানদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি কমিশনারের[২] কাছে পেশকৃত একটি আবেদনপত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। এতে তাদের ব্যবহৃত ভাষার রুঢ়তা হয়ত হাসির উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু এই প্রদেশের এককালীন বিজেতারা যে এখন পেটের দায়ে অশুদ্ধ ইংরেজিতে দয়া ভিক্ষা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা সত্যিই তাদের দুঃখজনক নীরবতার পরিচায়কঃ "মহামান্যা দয়াবতী রাণীর অনুগত প্রজা হিসেবে দেশের সরকারী চাকরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার আমাদেরও আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, উড়িষ্যার মুসলমানদের ক্রমাগত নিচে চেপে রাখা হচ্ছে এবং তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার আর কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণকারী এসব মুসলমান বর্তমানে চাকরির অভাবে দরিদ্র হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের অবস্থাটা ঠিক ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত করুণ হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের এই করুণ অবস্থার কথা আপনার সামনে এই আশায় তুলে ধরছি যে, উড়িষ্যা বিভাগে মহামান্যা রাণীর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে আপনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর প্রজার প্রতি সুবিচার করবেন। সরকারী চাকরি থেকে বঞ্চিত হবার কারণেই আমরা আজ কপর্দকহীন হয়ে পড়েছি। আমাদের অবস্থা আজ এতই শোচনীয় যে, আমরা দুনিয়ার যেকোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে রাজী আছি তা সে হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত চূড়াই হোক কিংবা সাইবেরিয়ার জনমানবহীন প্রান্তরই হোক—যদি জানতে পারি যে, অনুরূপ ভ্রমণের ফলে সপ্তাহে মাত্র দশ শিলিং বেতনের কোন চাকরিতে আমাদের নিয়োগ করা হবে।"

---

[১] ফার্সী পত্রিকাটিতে প্রকাশিত আলোচ্য সংবাদের সত্যতা সরকারীভাবেই যাঁচাই করার মত কোন উপায় এখন আমার হাতে নেই; কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে, এ পর্যন্ত এই সংবাদটির প্রতিবাদ কেউ করেনি।

[২] মিঃ ই. ডবলিউ. মলোনী সি.এস, যার কাছ থেকে একটা কপি পাওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

এটা কি করে সম্ভব যে, সরকারী চাকরি এবং স্বীকৃত সকল পেশার দরজা মুসলমানদের জন্য রুদ্ধ হেয় গেল? বাংলার মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তির অভাব নেই, এবং দারিদ্র্যের চাপে তারা সব সময়ই ভাগ্যোন্নতির জন্য একটা কিছু করার চেষ্টায় আছে। সরকার বাংলায় অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর অনেক জেলাই মুসলমান অধ্যুষিত। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হতে পারে এবং যেকোন পেশায় ঢোকার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এমন কৃতি মুসলমান ছাত্র তৈরি করতে ঐ সব সরকারী স্কুল ব্যর্থ হয়েছে। অথচ প্রতি বছর ঐ সব স্কুল থেকে দলে দলে এমন সব সুশিক্ষিত, উচ্চাভিলাষী ও মেধাবী হিন্দু যুবক বেরিয়ে আসছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করে অর্থ রোজগার ও ভদ্র জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্র অধিকার করে বসছে।

আসল সত্য এই যে, আমাদের প্রবর্তিত জনশিক্ষা ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের ধর্মের কাছে ঘৃণার্হ আমাদের শাসনে যেমন মুসলমানদের শাসনামলেও ঠিক তেমনিভাবে হিন্দুরা নিজেদের ভাগ্যকে বরণ করে নিয়েছিল। বর্তমানে ইংরেজি জানা লোকদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে এবং হিন্দুরা ইংরেজি শিখছে। ইতিপূর্বে ফার্সী জানা লোকদের অগ্রাধিকার দেয়া হত এবং তখন হিন্দুরা ফার্সী শিখত সুদূর অতীতে, ১৫০০ খ্রীস্টাব্দেও তারা ফার্সী ভাষায় বই-পুস্তক রচনা করেছে। সেকালের একজন হিন্দু লেখকের ফার্সী কাব্যগ্রন্থ আজও টিকে আছে। পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুসলমান যুবকদের শিক্ষকতা করার জন্য সরকারী লেকচারার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। আকবরের সময় দিল্লীর দরবারে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরাও সমাদৃত হতেন এবং একজন বিশিষ্ট ফার্সী কবি সেখানে বিশেষ সম্মানজনক আসন লাভ করেন। তবে ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন লাভজনক হওয়ার পরই শুধু সাধারণ হিন্দুরা ফার্সী শিখতে এগিয়ে এসেছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে ভারত সাম্রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যিনি নিজেই একজন হিন্দু, এই মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, অতঃপর সরকারী হিসেব সংরক্ষণের যাবতীয় কাজ ফার্সী ভাষায় সম্পাদিত হবে এবং রাজস্ব বিভাগের অধঃস্তন হিন্দু অফিসাররা তাড়াতাড়ি ফার্সী ভাষা শিখে নেয়।

সুতরাং আমরা যখন সরকারী কাজে ইংরেজি চালু করলাম, নমনীয় হিন্দুরা তখনই ইংরেজি শিখে নিয়েছে, কারণ তারা উপলব্ধি করে যে, ইংরেজি না জানলে জীবনে কৃতকার্য হওয়া যাবে না। মুসলমান আমলের সরকারী ভাষা এবং আমাদের আমলের সরকারী ভাষা উভয়ই হিন্দুদের কাছে বিদেশী ভাষা। তাদের কাছে উভয় ভাষাই সমান অনাদৃত, কিন্তু জীবনে সাফল্য লাভের জন্যই তারা তা শিখেছে। তবে আমাদের সরকারী স্কুলসমূহে ইংরেজি শিক্ষার ব্যয় পূর্ববর্তী আমলের তুলনায় অর্ধেক হওয়ায় হিন্দুরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সমাদরের সাথে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু মুসলমানদের বেলায় ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। এ দেশ আমাদের হাতে আসার আগে তারা শুধুমাত্র ভারতের রাজনৈতিক কর্তাই ছিল না, বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রটাও তাদের অধিকারে ছিল। তাদেরকে ভাল করে জানেন এমন একজন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিবিদের[১] ভাষায় বলতে হয় ঃ "তারা এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থায় অভ্যস্ত যা আমাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থার তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও মোটেই অবজ্ঞার বিষয় নয় এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তি ও আদব-কায়দা প্রশিক্ষণের জন্য সে ব্যবস্থাটা যথেষ্ট উপযুক্ত ছিল। প্রাচীন ভাবধারায় চালিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা যে নীতির দ্বারা চালিত হত তা সম্পূর্ণ দোষযুক্ত ছিল না এবং তৎকালীন ভারতে প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষা পদ্ধতির তুলনায় তাদেরটা ছিল সিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। সে ব্যবস্থার গুণেই বুদ্ধিবৃত্তি ও অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রে তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে এবং সরকারী ক্ষমতার সামান্য যা কিছু অংশ হিন্দুরা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে তাও ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা রপ্ত করার বদৌলতে।"

আমাদের শাসনের প্রথম পঁচাত্তর বছর প্রশাসন কার্য পরিচালনার যোগ্য অফিসার সৃষ্টির জন্য আমরা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কাজে লাগিয়েছি। কিন্তু ইত্যবসরে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করি এবং নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু লোক সৃষ্টি হওয়ার পর মুসলমানদের পুরনো ব্যবস্থাটা আমরা বর্জন করেছি : ফলে মুসলমান যুবকদের সামনে রাষ্ট্রীয় কর্মের প্রতিটি রাস্তা রুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বুদ্ধিমান হলে মুসলমানরা পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে তদনুসারে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলত। কিন্তু একটা প্রাচীন বিজেতা জাতির পক্ষে তাদের স্বর্ণযুগের ঐতিহ্য রাতারাতি বিসর্জন দেয়া সম্ভবপর নয়। বাংলার

---

[১] মিঃ ই. সি. বেইলী. সি. এস. আই।

মুসলমানরা যে জাতির ওপর এতকাল শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে এসেছে, যাদেরকে তারা মূর্তিপূজক হিসেবে ঘৃণা এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ হিসেবে অবজ্ঞা করে এসেছে, সেই জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে না এমন একটা ব্যবস্থা মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছে। নয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সৃষ্ট জনমতের পক্ষে ধর্মবিশ্বাস সহায়ক হয়েছে এবং কোন মুসলিম বালক নিজের আত্মার অধঃপতন না ঘটিয়ে আমাদের সরকারী স্কুলে ভর্তি হতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবত সংশয় বিরাজমান ছিল। আমরা যদি ইংরেজ শিক্ষকদের মাধ্যমে আমাদের ব্যবস্থা চালু করতাম, অথবা রাষ্ট্রীয় কাজে এদেশের ভাষা সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধু যদি ইংরেজি চালু করতাম, তাহলে হয়ত ধর্মীয় কারণে তাদের অসুবিধাগুলো বহুলাংশে লাঘব হয়ে যেত। কেননা মুসলমানরা এটা স্বীকার করে যে, তাদের পয়গম্বর কর্তৃক প্রবর্তিত পূর্ণ সত্যের কাছে খ্রীষ্ট ধর্ম অসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেটা মানবজাতির কাছে নাজেলকৃত অন্যতম আসমানী ধর্ম। কিন্তু তাদের কাছে হিন্দু ধর্ম হচ্ছে একটা আদিম অন্ধবিশ্বাস এবং ভূতপ্রেত ও মূর্তিপূজার এমন একটা আজগুবি মতবাদ, একেশ্বরবাদের ধারণার স্পর্শ মাত্রই যা অবলুপ্ত হয়ে যাবে না।[১] দক্ষিণ বঙ্গে আমাদের স্কুলসমূহে যে ভাষায় শিক্ষা দেয়া হয় সেটা হিন্দুদের ভাষা এবং শিক্ষকরাও হিন্দু-মুসলমানরা সর্বসম্মতভাবে পৌত্তলিক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পৌত্তলিক ভাষায় প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

এই বিরূপ মানসিকতা যুগের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন ভাবধারার সৃষ্টি করেছে। আমাদের স্কুলগুলোকে অপছন্দ করার পক্ষে সৃষ্ট সাধারণ জনমত প্রথম দিকে ধর্ম কর্তৃক সমর্থিত হয়, কিন্তু পরে ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। বর্তমান যুগের সর্বাধিক বিজ্ঞ আইন বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত, যা এই বইতে ইতিমধ্যেই একাধিকবার উদ্ধৃত করেছি, ইংরেজি শিক্ষার সপক্ষে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রখ্যাত অধ্যাপকটি ইতিমধ্যেই ইংরেজদের অধীনে চাকরি গ্রহণের সমর্থনে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কতিপয় সরকারী চাকরি প্রয়োজনীয়, কতিপয় অবাঞ্ছিত আবার কতিপয় চাকরি পাপাত্মক। ইংরেজরা যদি মুসলমানদের প্রশংসনীয় পদে নিয়োগ করে—যেমন ইসলামী বিধিবিধান মোতাবেক আইন অফিসারের পদ, রাস্তা তদারককারী ওভারসিয়ার,

---

১. বলাবাহুল্য যে, এই মতের আমি সম্পূর্ণ বিরোধী; যদিও কিছু সংখ্যক নিরপেক্ষ খ্রীষ্টান এখনও এই মতের সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। বিজিত জাতির ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানার পরিণাম অবশ্য মুসলমানরা ইতিমধ্যেই ভোগ করেছে।

গরীব ভ্রমণকারীদের পান্থনিবাস তদারকের কাজ, সম্পত্তির অছি, অথবা চোর ডাকাত দমনের কাজ তাহলে সেসব চাকরি গ্রহণ করা ভাল। কারণ একইভাবে পয়গম্বর যোসেফ মিসরের নাস্তিক রাজার কোষাধ্যক্ষ ও পুলিশ প্রধানের পদ গ্রহণ করেছিলেন, এবং মূসাকে দুধ পান করাবার উদ্দেশ্যে মহামান্যা মুসী ফেরাউনের অধীনে চাকরি নিয়েছিলেন। কিন্তু কোন সরকারী পদ যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মহীন করে তোলে তবে সে পদ গ্রহণকারী মুসলমান গোনাহগার হয়ে যাবে।

একই ভাবে যখন শিষ্যরা প্রশ্ন করেন যে, যুক্তিশাস্ত্র অথবা ইংরেজি শিখা শাস্ত্রসম্মত কিনা, তখন অধ্যাপক জওয়াব দেন, বেঁছে থাকার জন্য যুক্তিশাস্ত্র অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় নয়, কিন্তু একটা ভাষা শিখার জন্য ব্যাকরণ যেমন সাহায্য করে, বেচে থাকার জন্যও তেমনি যুক্তিশাস্ত্র সহায়তা করে। যদি কেউ ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এটা শিখে তবে সে গোনাহগার প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্য শিখলে তাতে দোষের কিছু নেই। বই পড়া, চিঠিপত্র লেখা এবং শব্দে অন্তর্নিহিত অর্থ আয়ত্ত করার জন্য ইংরেজি শিখলে তা সমর্থন করতে আপত্তি নেই। জাইদ ইবনে সাবিত পয়গম্বরের নির্দেশে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের ভাষা ও শব্দকোষ শিখেছিলেন, কারণ ইহুদী ও খ্রীস্টানরা পয়গম্বরের কাছে যে সকল চিঠিপত্র পাঠাত তার জওয়াব দেয়ার জন্য তাদের ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু কেউ যদি ইংরেজদের সাথে মেলামেশা করার জন্য কিংবা নিছক সখ করে ইংরেজি শিখে তবে সে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে। এমনকি লোহার তৈরি অস্ত্র সম্পর্কেও বলা যায় যে, কেউ যদি চোর ডাকাত তাড়ানো কিংবা তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র নির্মাণ করে তবে সেটা হবে পুণ্যের কাজ ; কিন্তু চোর ডাকাতের পক্ষে লড়ার জন্য যদি কেউ অস্ত্র নির্মাণ করে তবে সেটা নিঃসন্দেহে পাপকার্য বলেই বিবেচিত হবে।

অবশ্য, অধিকতর বিদ্বেষপরায়ণ মুসলমানরা আমাদের সরকারী স্কুলসমূহে প্রদত্ত শিক্ষাকে আইনানুগ বলে মেনে নিতে পারেনি। পার্থিব মনোভাবাপন্ন মুসলমানরা যখন এই ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়েছে, ধর্মান্ধরা তখন এই ব্যবস্থা থেকে আরও দূরে সরে গেছে। গত চল্লিশ বছরে পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা ও অন্যান্য বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাথে তাদের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ; ঠিক মুসলমানী শাসনামলের মত তারা এখনও হিন্দুদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সচেষ্ট। এমনকি ১৮৬০—৬২ সালেও আমাদের স্কুলসমূহে প্রতি দশজন হিন্দু ছাত্রের মধ্যে মাত্র একজন

মুসলমান ছাত্র ছিল এবং তারপর থেকে মুসলমান ছাত্রের হার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও সেটা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলের বেলায়ই প্রযোজ্য। সরকারী জেলা স্কুলগুলোতে অবস্থা আগের মতই রয়ে গিয়েছে। ইংরেজি স্কুলগুলোতে তাদের ছাত্র সংখ্যা বাড়েনি। ওয়াহাবী মামলায় সরকার পক্ষের যে ভারপ্রাপ্ত অফিসারটির তথ্যের ভিত্তিতে আমি এসব কথা লিখছি এবং পূর্ব বাংলার সাথে যার ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে তিনি জানিয়েছেন, মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা এত কম যে, মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় তা অতি নগণ্য।

প্রকৃত সত্য এই যে, আমাদের জনশিক্ষা ব্যবস্থা তিনটি কারণে মুসলমানদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়নি। প্রথমত, এই ব্যবস্থায় বাংলাভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, যাকে শিক্ষিত মুসলমানরা বিজাতীয় ভাষা বলে মনে করে ; এবং হিন্দু শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষা দান, যে হিন্দুকে গোটা মুসলমান সম্প্রদায় ঘৃণার চোখে দেখে। বাঙ্গালী শিক্ষক নিজের মাতৃভাষায় এবং বিকৃত উর্দুতে শিক্ষাদান করে ; আমাদের মত তার কাছেও উর্দু বিদেশী ভাষা। অধিকন্তু শান্ত ও নম্র মেজাজের জন্য তার পক্ষে মুসলমান ছেলের ওপর শৃংখলা আরোপ করা সম্ভব নয়। জনৈক মুসলমান কৃষক সম্প্রতি একজন ইংরেজ অফিসারের কাছে বলেছে, "পৃথিবীর কোন প্রলোভনই আমার ছেলেকে কোন বাঙ্গালী শিক্ষকের কাছে পাঠাতে আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারবে না।" দ্বিতীয়ত, জীবনের সম্মানজনক স্থান অধিকার করা এবং স্বীয় ধর্মীয় কর্তব্য পালনের জন্য যে ভাষা শিক্ষা করা দরকার, আমাদের স্কুলগুলোতে তা শিখার সুযোগ মুসলমান ছাত্ররা কদাচিৎ পেয়ে থাকে। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরই কিছুটা ফার্সী জানা চাই কিন্তু আমাদের উচ্চশ্রেণীর জেলা স্কুলগুলোতেও ফার্সী শেখার কোন সুযোগ নেই। ফার্সী[১] ও আরবী হচ্ছে মুসলমানদের পবিত্র ভাষা এবং কৃষক থেকে রাজবংশজাত যেকোন মুসলমানের নামায আদায় করার জন্য এই দুই ভাষার যেকোন একটি জানা প্রয়োজন ; কিন্তু এই দুটো ভাষা আমাদের স্কুলগুলোতে স্বীকৃতি পায়নি। অতি সম্প্রতি এ বিষয়টা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয় যে, মুসলমান যদি নির্ধারিত ভাষায় নামায না পড়ে তবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হয় না। তৃতীয়ত, আমাদের সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমান ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ নেই। এই বাস্তব অবস্থাটা খতিয়ে দেখা হয়নি যে, স্মরণাতীতকাল থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষাদানের

---

[১] বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে ফার্সী প্রায় ধর্মীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে, কারণ এই ভাষাতেই ইসলামী বিধিবিধান ও শাস্ত্রীয় শিক্ষা তারা লাভ করছে।

জন্য একটা বিশেষ যাজক শ্রেণী রয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অনুরূপ কোন পৃথক যাজক শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের কর্তা ব্যক্তিটির ধর্মীয় শিক্ষায় পারদর্শী হতে হয় এবং তিনিই হচ্ছেন তার পরিবারে ধর্মীয় যাজক। অবশ্য, সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানসমূহ মসজিদে হয়ে থাকে কিন্তু ইসলামের মহত্ত্ব এই যে, তার প্রার্থনার জায়গা মানুষের তৈরি নাহলেও চলে—আল্লাহর আদমের যেকোন স্থানে কিংবা আল্লাহর আসমানের নিচে যেকোন জায়গায় মুসলমানরা প্রার্থনা করতে পারে। খাঁটি লৌকিক শিক্ষা খুব কম জাতির কাছেই গ্রহণীয় হয়ে থাকে। অনেক চিন্তাশীল লোকের মতে, এই ব্যবস্থা আয়ারল্যাণ্ডে ব্যর্থ হয়েছে এবং মুসলিম বাংলার অশিক্ষিত ও ধর্মান্ধ কৃষকদের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সুতরাং বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন এমন একজন রাষ্ট্রনীতিবিদের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলতে হয় ঃ " মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি কোনরূপ অনুগ্রহ দেখায়নি কিংবা তাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নেই এবং তাদের স্বার্থ ও সামাজিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী একটি ব্যবস্থা থেকে মুসলমানরা সরে দাঁড়িয়েছে এতে বিস্মিত হবার কি আছে ?

প্রতিটি মানুষের ঘরে আমরা যে শিক্ষা পৌছে দেয়ার চেষ্টা করেছি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃটিশ অফিসারদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারছে, মুসলমানরা এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করায় তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে—এটাই হল এ সমস্যার দুটি বিপরীত দিক। হিন্দুদের মন বিদ্বেষমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদেরকে নিয়ে এত বাড়াবড়ি কেন করবে তা আমরা বুঝতে অক্ষম। কিন্তু আসল যে সত্যটি তাদেরকে আলাদা করে রেখেছে যা আমাদের চোখে ধরা পড়েনি, সেটা হল, ধর্মীয় অনুভূতির মতই পুরনো একেশ্বরবাদ ও বহু দেবতাবাদের সেই প্রশ্নটি যা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতিকে পৃথক করে রেখেছে। বহু দেবতাবাদ তার অনুসারীদের বিচিত্র উপাসনা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসকেও বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করেছে। একদা গিবন গ্রীকদের সম্পর্কে যে চমৎকার কথাটি বলেছিলেন তা বর্তমানকালের হিন্দুদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য ঃ "সকল ধর্ম বিশ্বাসীদের মন জুড়ে রয়েছে যে অবিভাজ্য নিয়মিত পদ্ধতি, তার ব্যতিক্রম

ঘটিয়ে এক সহস্র অবিন্যস্ত ও পরিবর্তনশীল ধারণার ওপর ভিত্তি করেই গ্রীক উপাখ্যান গড়ে উঠেছে, এবং এখানে দেবতাদের ভক্তরাই তাদের ধর্ম বিশ্বাসের ধরন ও মাত্রা ঠিক করে নিতে পারে।"[১] এরকম স্বাধীনতা মুসলমানদের নেই। শাস্ত্র তাদের কাছে সম্পূর্ণ প্রাণবন্ত, এবং এমনকি প্রশ্নাতীত আনুগত্য দাবি করে। সেই জন্য কোন জনশিক্ষা ব্যবস্থায় যদি ধর্মীয় নীতির প্রতিফলন না ঘটে তবে ইসলামের গোড়া ভক্তরা তাতে আদৌ সন্তুষ্ট হবে না।

খ্রীস্টান সরকার হিসেবে আমাদের নীতি বিসর্জন না দিয়ে এ ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি আমরা কতটা ন্যায়বিচার করতে পারব সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব। ইত্যবসরে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আমরা সকল শ্রেণীর কাছ থেকে নির্বিচারে যে কর আদায় করি, তা বাংলায় কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্য প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যয় করা হচ্ছে বলে মুসলমানরা যে অভিযোগ তুলেছে তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ এটা নয়। আমাদের প্রবর্তিত জনশিক্ষা ব্যবস্থা যেমন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি, তেমনি আবার তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যে আর্থিক সাহায্য এতকাল তারা পেয়ে আসছিল সেটাও আমরা বিনষ্ট করেছি। বাংলার প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে এমন একটা পৃথক তহবিলের ব্যবস্থা ছিল যার ফলে ঐ পরিবারের ছেলেরা ছাড়াও আশেপাশের গরীব ঘরের ছেলেরাও বিনা খরচায় লেখাপড়া শিখতে পারত। প্রদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলোর ভাগ্যাবনতি ঘটার সাথে সাথে এই সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং কার্যদক্ষতাও কমে যেতে লাগল। অবশ্য, আমাদের শাসনের দ্বিতীয় অর্ধশতকের আগে পর্যন্ত আমরা তাদের বিরুদ্ধে বৃটিশ আইনের অনিবার্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিনি। স্মরণাতীতকাল থেকে ভারতের দেশীয় নৃপতিরা তরুণদের শিক্ষা এবং দেবতাদের পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য জমি দান করে আসছেন। এ ব্যাপারে তৎকালীন শাসকদের হাতে প্রশ্নাতীত ও সীমাহীন ক্ষমতা ছিল। মোগলদের ত্রুটিপূর্ণ শাসনে, এবং পরবর্তীকালের গোলযোগপূর্ণ বিশৃংখলার মধ্যে এই ক্ষমতার কতকটা প্রাদেশিক শাসকদের কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসকরা এই ক্ষমতার বেশিরভাগই নিজেদের হাতে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। সুদূর পূর্ববাংলায় কি ঘটছে তা নিয়ে দিল্লীর দরবারে তেমন

---

[১] রোমান এম্পায়ার ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ৩৬০ ; ১৭৮৬ সালের কোয়ার্টো সংস্করণ।

একটা মাথা ব্যথা ছিল না ; তাঁরা শুধু প্রদেশের রাজস্ব পেয়েই খুশী ছিলেন। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের বিলাসপ্রিয় শাসনকর্তাও একইভাবে জেলা প্রশাসনের বিস্তারিত বিষয়ের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন। প্রত্যেক বড় ভূস্বামী নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব পরিশোধ করতে পারলে তার অধীনস্থ জমি নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারত। সে তার নিজের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মন্দির বা মসজিদের জন্য নিষ্কর জমি বন্দোবস্ত দিতে পারত এবং সারা জীবনের শোষণ, পীড়ন ও নিষ্ঠুরতা শেষ বয়সের বদান্যতা দিয়ে সবাই কাটাবার চেষ্টা করে।

আমরা যে সময় বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ করি তখনকার সর্বাধিক কর্মদক্ষ রাজস্ব অফিসার[১] হিসেব করে দেখেন যে, গোটা প্রদেশের এক-চতুর্থাংশ জমিই সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস এই বিরাট প্রতারণা প্রত্যক্ষ করেন ; কিন্তু তখন ঐ সব জমির রাজস্ব সরকারী অধিকারে আনার বিরুদ্ধে এত তীব্র মনোভাব বিরাজ করছিল যে, কোনরূপ সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস অননুমোদিতভাবে বণ্টিত সকল নিষ্কর জমির উপর সরকারের প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব আরোপের কথা পুনরায় জোরের সাথে উল্লেখ করেন ; কিন্তু অধিকতর শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন সরকার এ বিষয়ে কোন বাস্তব পদক্ষেপ নিতে সাহস পায়নি। আরো পঁচিশ বছর বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায় এবং তারপর ১৮১৯ সালে সরকার পুনরায় নিজের অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ; কিন্তু সক্রিয় কর্মব্যবস্থা গ্রহণে এবারও দ্বিধান্বিত হন। কেবলমাত্র ১৮২৮ সালে আইনসভা এবং শাসন বিভাগ একতাবদ্ধ হয়ে এ ব্যাপারে বিরাট উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বহু সংখ্যক বিশেষ আদালত বসানো হয় এবং পরবর্তী আঠারো বছর গোটা প্রদেশ গুপ্ত সংবাদ সরবরাহকারী, ভুয়া সাক্ষী এবং বিবর্ণ চেহারার রিজামশান অফিসারে ছেয়ে যায়।

পুনরুদ্ধারকৃত জমির উপর ৮ লক্ষ পাউণ্ড আয়ের হিসাব ধরা হয় এবং রাষ্ট্রে বার্ষিক ৩ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের নিশ্চিত সুযোগ লাভ করে ; আর এটা ছিল ৬০ লক্ষ স্টার্লিং-এর পাঁচ শতাংশের সমান মূলধন।[২] মুসলমানদের বা মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহের দখলে যেসব নিষ্কর জমি ছিল সেখান থেকেই উপরোক্ত অর্থের বেশিরভাগ আদায় হয়। যে ভীতি ও ঘৃণা

---

[১] মিঃ জেমস গ্রান্ট।

[২] ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকার ১৮৪৬ সালের ৩০ শে এপ্রিল সংখ্যা দ্রষ্টব্য। রাজস্ব বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটির হিসাবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এতকাল ধরে চলে আসছিল, এখন তা পল্লী বাংলার জমির দলিলে স্থায়ী স্বাক্ষর এঁকে দিল। শত শত প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল এবং নিষ্কর জমির আয়ের উপর নির্ভর করে মুসলমানদের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছিল তা মরণ আঘাত প্রাপ্ত হল। আঠারো বছরের[১] গড়িমসির ফলে মুসলমানদের মধ্যে যেসব শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তারাও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। যেকোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক এই ধারণা পোষণ করবেন যে, পুনরুদ্ধার আইনের দ্বারা আমাদের সংরক্ষিত অধিকার বলবৎ করা হলে এই আইনের প্রয়োগ মূলত ঃ চরম হয়রানিমূলক এবং ভারতীয় জনমতের বিরোধী বলে গণ্য হবে। প্রকাশ্য আইনের মোকাবিলায় অন্য কোন ব্যবস্থা টিকতে পারে না। আমাদের পুনরুদ্ধারকারী অফিসাররা দয়া-মায়া বলতে কিছু জানত না ; তারা নিশ্চিত মনে আইন কার্যকরী করে। সে সময় যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় তার স্মৃতি আজও অম্লান রয়েছে এবং এটা আমাদের তিক্ত ঘৃণার উত্তরাধিকারী করে রেখেছে।[২] দেশীয় নৃপতিদের শাসনামলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে মর্যাদা ও অর্থ রোজগারের সুযোগ পেতেন, পুনরুদ্ধার আইন প্রয়োগের পর বাংলায় তার অবসান ঘটে।

মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; কারণ এই কাজে দান হিসেবে প্রাপ্ত সম্পত্তির দলিল-দস্তাবেজ উপস্থিত করার ব্যাপারে ভারতের সাবেক শাসকশক্তির বংশধররা গর্বোদ্ধত ঔদাস্য প্রদর্শন করে তাদের এহেন ব্যবহার চতুর হিন্দুদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নিষ্কর সম্পত্তির সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থিত করতে বলা হয় ; কিন্তু তৎকালীন প্রকৃত সম্পত্তি আইনের অনিশ্চিত অবস্থায় তারা তাদের স্বীকৃত ব্যক্তিগত ভূমি মালিকানার সমর্থনে অনুরূপ প্রমাণপত্র হাজির করতে পারেনি। প্রবল প্রতিবাদের মুখে পঁচাত্তর বছর ধরে আমরা একটা বিরাট জালিয়াতি-পূর্ণ ব্যবস্থা সহ্য করে এসেছি এবং তার পুঞ্জিভূত কুফল একটি জেনারেশনের উপর নিপতিত হয়। ইতিমধ্যে বড় বড় দখলকারীরা দান হিসেবে প্রাপ্ত ঐসব সম্পত্তি নিয়ে নানা অনাচারে লিপ্ত হয় এবং স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত দলিলে তাদের দাবি সমর্থিত হয়। এ বিষয়ে কদাচিৎ কোন সন্দেহ থাকতে পারে যে, আমাদের অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধারের পুনরুদ্ধার আইন যথেষ্ট ছিল না ; তেমনি এতেও

---

[১] পুনরুদ্ধার কর্মসূচী প্রথম দিকে তীব্র আকারে কার্যকর করা হয় এবং তারপর কয়েক বছরের ঢিলেমীর পর ১৮৪৬ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখের সরকারী নির্দেশ বলে এ কার্যক্রম বাতিল হয়ে যায়।

[২] ঢিলেমীর পর ১৮৪৬ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখের সরকারী নির্দেশ বলে এ কার্যক্রম বাতিল হয়ে যায়।

কোন সন্দেহ নেই যে, পুনরুদ্ধার আইন প্রয়োগের সময় থেকেই মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের সূচনা হয়। ওয়াহাবী মামলায় সরকার পক্ষের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অফিসারের মতে এই ঘটনাটি হচ্ছে বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বিলুপ্তির দ্বিতীয় প্রধান কারণ।

এ সত্ত্বেও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থার ন্যায্যতা স্বীকার করা যেতে পারে ; কিন্তু শিক্ষা তহবিল সম্পূর্ণ তসরূপ করা হয়েছে বলে মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছে তা ধোপে টিকে না। তবে এটা গোপন করা ঠিক হবে না যে উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তি যদি আমরা তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে পারতাম তাহলে বর্তমানে বাংলায় মুসলমানরা অতি মহৎ ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতির একটা শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হত। ১৮০৬ সালে হুগলী জেলার একজন ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান মৃত্যুর সময় তার বিরাট জমিদারী সৎকার্যে ব্যয়ের জন্য দান করে যান। পরে তাঁর দুইজন ট্রাস্টীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। ১৮১০ সালে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সম্পত্তি অপব্যবহারের অভিযোগ আনলে সংকট গভীরতর হয়, এবং জেলার ইংরেজ কালেক্টর আদালতের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সম্পত্তির দখল নিয়ে নেন। ১৮১৬ সাল পর্যন্ত মোকদ্দমা চলতে থাকে এবং তখন উভয় ট্রাস্টীকে বরখাস্ত করে উক্ত জমিদারীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করে। একজন ট্রাস্টীর জায়গায় সরকার নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জায়গায় নতুন একজন ট্রাস্টী মনোনীত করা হয়। পরের বছর নির্ধারিত রাজস্ব প্রদানের শর্তে সকল সম্পত্তি ইজারা দেওয়া হয়। মামলা চলাকালীন বকেয়া পাওনাসহ ইজারা বাবদ প্রাপ্ত মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৫,৭০০ স্টার্লিং পাউণ্ড ;[১] এছাড়াও জমিদারীর বার্ষিক আয় থেকে এ পর্যন্ত ১২,০০০ স্টার্লিং পাউণ্ডের অধিক উদ্বৃত্ত রয়েছে।

আগেই বলেছি যে, জমিদারীর আয় বিভিন্ন সৎ কাজে ব্যয় করার জন্য ট্রাস্ট গঠিত হয়। উইলে যেসব সৎ কাজে ব্যয় করার কথা বলা হয় তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংরক্ষণ, ইমামবাড়ী বা হুগলীর বড় মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং একটি গোরস্তান, কতিপয় বৃত্তি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ যোগান দেওয়া ট্রাস্ট গঠনের উদ্দেশ্যে আওতায় আসে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছানুসারে সেটাকে মুসলমানদের রীতি মাফিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে হবে। মুসলিম দেশগুলোতে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করাকে ধর্মীয় কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু তহবিলের অর্থ কোন অ-মুসলিম কলেজের

---

[১] এই আয় থেকেই কলেজ বিল্ডিং-এর মূল্য পরিশোধ করা হয়।

কাজে ব্যয় করা উইলকারীর ইচ্ছার ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হবে এবং সেটা ট্রাস্টীদের ক্ষমতার গুরুতর অপব্যবহার হিসেবেই গণ্য হবে। কিন্তু কোন মুসলমানের দানের সাথে ধর্মীয় উদ্দেশ্য এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে যে শিয়া সম্প্রদায়ের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রবর্তিত ট্রাস্টকে সুন্নী মুসলমানদের শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করার বৈধতা সরকারকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

সুতরাং এই তহবিলের টাকা একটি ইংরেজি কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করায় মুসলমানরা কিরূপ ক্রোধের সাথে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তহবিল তসরূপকারীর অভিযোগ আনতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কার্যত হয়েছেও তাই। কেবলমাত্র ইসলামী ধর্মীয় কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সম্পত্তির টাকা দিয়ে সরকার এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে যেখানে ইসলামের নীতিবিরোধী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যে প্রতিষ্ঠান থেকে মুসলমানদের কার্যত বাদ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ একজন ইংরেজ ভদ্রলোক যিনি ফার্সী বা আরবী ভাষার একটি বর্ণও জানেন না। মুসলমানরা ঘৃণা করে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই অধ্যক্ষ কেবলমাত্র মুসলমানদের কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত তহবিল থেকে বছরে ১,৫০০ স্টার্লিং পাউণ্ড বেতন পেয়ে থাকেন। অবশ্য এটা ঐ অধ্যক্ষের কোন অপরাধ নয় ; এজন্য অপরাধী হচ্ছে সরকার যে নাকি ঐ দায়িত্বে তাকে নিযুক্ত করেছে। গত পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ সরকার এ বিরাট শিক্ষা তহবিলের অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে তসরূপ করে আসছে। সরকার নিজের গুরুতর বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ ঢাকা দেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস হিসেবে ইংরেজি কলেজটির সাথে একটা ছোট মুসলমান স্কুলকে সংশ্লিষ্ট করে কলেজের বিল্ডিং নির্মাণের জন্য উক্ত তহবিলের বিরাট অংকের টাকা তসরূপ করা ছাড়াও কলেজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তহবিল থেকে বার্ষিক ৫,০০০ স্টার্লিং পাউণ্ড ব্যয় করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থাটা হচ্ছে এই যে, তহবিলের ৫,২৬০ স্টার্লিং পাউণ্ড আয়ের মধ্যে সরকার মাত্র ৩৫০ স্টার্লিং পাউন্ড উক্ত ক্ষুদ্র মুসলিম স্কুলের জন্য ব্যয় করছে। এবং ট্রাস্টের মৌল বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ হিসেবে এই ক্ষুদ্র মুসলিম স্কুলটিই শুধু টিকে আছে।

এই তসরূপের অভিযোগ নিয়ে বাদানুবাদ করা খুব কষ্টকর ব্যাপার, কারণ এ অভিযোগ খণ্ডন করা সম্ভবপর নয়। মুসলমানরা অভিযোগ করে বেড়াচ্ছে যে, মুসলমানদের এই বিরাট ধর্মীয় সম্পত্তির মালিকানা দখলের

অসদুদ্দেশ্যে বিধর্মী ইংরেজ সরকার সম্পত্তির মুসলিম ট্রাস্টীদের অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছে ; এবং তারপর দাতার পবিত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যের বরখেলাপ করে সরকার মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন, যার ফলে সরকারের কৃত অপরাধ অধিকতর গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, কয়েক বছর আগে আলোচ্য ইংরেজি কলেজের মোট তিনশ ছাত্রের মধ্যে এক শতাংশও মুসলমান ছিল না ; এবং তারপর এই অবমাননাকর বৈষম্য হ্রাস পেলেও অবিচারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অসন্তোষ এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন এমন একজন সিভিলিয়ান লিখেছেন ঃ "এই বিষয়ে বৃটিশ সরকার নিজের কাজের দ্বারা যে ঘৃণা ও অবমাননা কুড়িয়েছেন তাকে অতিরঞ্জিত করে দেখা অসুবিধাজনক বলে আমি মনে করি। আমার মন্তব্যের ভাষা কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি যে ভারতে আমার আটাশ বছর বসবাসকালে আমি বিষয়টির সত্যাসত্য যাচাই করে দেখেছি (এদেশে প্রথম আগমনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি হুগলী সফর করি) এবং আমি বলতে পারি যে, তখন এদেশীয় বা ইউরোপীয় কারো কাছ থেকেই অন্য কিছু আমি শুনিনি। যথার্থ হোক বা না হোক মুসলমানরা মনে করে যে, এ ব্যাপারে সরকার তাদের প্রতি অন্যায় ও সংকীর্ণমনা আচরণ করেছে ; এবং তাদের কাছে এটা একটা স্থায়ী তিক্ত অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়েছে ।"

ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা যেসব অন্যায় ব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করছে এখানেই তার শেষ নয়। তাদের অভিযোগ শুধু এই নয় যে, আমরা তাদেরকে আত্মোন্নতির যাবতীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছি। বরং এ অভিযোগও তারা তুলেছে যে, আগামীতেও তাদের কল্যাণের যাবতীয় পথ আমরা রুদ্ধ করে ফেলেছি। সব মহৎ ধর্মের অনুসারীরাই তাদের ধর্মীয় উপাসনার জন্য বিশেষ বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছে। কোন বৈদেশিক বিজেতা যদি ঘোষণা করে যে, রবিবার আর ছুটির দিন বলে গণ্য হবে না, তাহলে ইংরেজদের মনে যে ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হবে তা সহজেই অনুমেয়। নিজেদের ধর্মীয় পর্ব সম্পর্কে মুসলমানদের মনেও একই ভাবালুতা বিদ্যমান। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে জনসাধারণের এই মনোভাবের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি। কিন্তু পূর্ববাংলায় মুসলমানরা সম্প্রতি এতদূর দৃষ্টির অন্তরালে তলিয়ে গেছে যে, তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তার প্রতি আমরা ক্রমাগত উপেক্ষা ও পরে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে সব শেষে

একেবারে অস্বীকার করেছি। গত বছর হাইকোর্টের মুসলমান উকিলরা এ বিষয়ে দুইটি স্মারকলিপি পেশ করেছে। তারা উল্লেখ করেছে যে, খ্রীস্টান ও হিন্দুদের বেলায় যথাক্রমে বাষট্টি ও বায়ান্ন দিন করে ছুটি মঞ্জুর করা হলেও মুসলমানদের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে মাত্র এগার দিন। ইতিপূর্বে মুসলমানদের জন্যে একুশ দিন ছুটি বরাদ্দ ছিল ; এবং আবেদনকারীরা বর্তমানে শুধু এই প্রার্থনাই পেশ করেছে যে, তাদের ছুটির দিন কমাতে কমাতে যে এগারো দিনে এনে ঠেকানো হয়েছে, সেখান থেকে আর যেন কমানো না হয়। এই আবেদনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ জারি করা হয় যে, নেটিভদের জন্য অন্যান্য সরকারী অফিসে ছুটির যে সুযোগ প্রচলিত আছে হাইকোর্টেও যেন তা পালন করা হয়। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, অন্যান্য সরকারী অফিসে মুসলমানদের পর্ব উপলক্ষে কোন সরকারী ছুটি আদৌ মঞ্জুর করা নেই। বিভাগীয় প্রধানরা ইচ্ছা করলে তাদের অধীনস্থ মুসলিম কর্মচারীদের ছয়টি বড় মুসলমানী পর্বসহ বছরে মোট বারো দিন পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করতে পারে ; কিন্তু ঐ সব দিন অফিস খোলা থাকবে এবং স্বাভাবিক কাজকর্মও চলতে থাকবে।

মুসলমান উকিলরা উল্লেখ করে যে, অনুমতি নিয়ে ছুটি ভোগ করার এই ব্যবস্থায় কিছুতেই সরকারী আদালতের ছুটির চাহিদা পূরণ হতে পারে না। এই সব আদালতকে শুধু কর্মচারী ও আইনজীবীদের প্রয়োজন বিবেচনা করলেই চলবে না, মামলাকারী জনসাধারণের প্রয়োজন ও বিবেচনায় আনতে হবে। তারা উল্লেখ করে যে, মুসলিম আইনজীবীর সংখ্যা হ্রাস পেলেও রেল যোগাযোগের সুবিধার ফলে মুসলিম মামলাকারীদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলমানী ছুটির দিন মুসলমান আইনজীবীদের অবকাশ ভোগের সুযোগ দেওয়া হলেও ঐদিন আদালত খোলা থাকলে তারা নিশ্চিন্তে ছুটি ভোগ করতে পারবে না ; কারণ সে অবস্থায় তাদের মক্কেলদের মোকদ্দমা হিন্দু বা ইংরেজ আইনজীবীদের হাতে চলে যাবে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, উপরোক্ত সরকারী নির্দেশ মুসলমানদের যাবতীয় ধর্মীয় পর্বের দিন ছুটি বিলোপ করার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের ধর্মীয় পর্বের দিন ছুটির যে রেওয়াজ গত সাতাশ বছর যাবত আদালতে চালু ছিল, উক্ত নির্দেশে তাকে অকেজো করে ফেলা হয়েছে। হিন্দু ও খ্রীস্টানদের যদি তাদের ধর্মীয় পর্ব উপলক্ষে ছুটির সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আপনার আবেদনকারীদের প্রার্থনা এই যে, মুসলমানদেরও তাদের ধর্মীয় পর্বের দিনগুলোতে ছুটি ভোগ করার সুযোগ

থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।”[১] তাদের কষ্ট আরো বেড়েছে এ কারণে যে, দু'টি ধর্মোৎসব (ঈদুল ফিতরের তিনদিন এবং ঈদুজ্জোহার একদিন) ছাড়া মুসলমানদের অন্যান্য পর্বগুলো দুঃখ ও বেদনার স্মৃতিবাহী হওয়ায় ঐ সব দিন প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মানুষের পক্ষে দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

যে সম্প্রদায়ের লোকেরা আগে সারা ভারত জুড়ে আইন বিভাগের চাকরিতে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেছে, তাদের অবস্থা আজ এতদূর নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে। তবে আনন্দের বিষয়, অন্ততঃ এই অবিচারটি কার্যকরী হতে দেয়া হয়নি। সর্বোচ্চ সরকার কর্তৃপক্ষ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে মুসলমানদের ছুটির কতিপয় দিন আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অবশ্য, মুসলমানরা যতদিনের ছুটি দাবি করেছিল তার সব পূরণ হয়নি বটে ; তাহলেও সরকারী কাজকর্ম সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা ক্ষুণ্ন না করে যতটা সম্ভব, বিশেষ করে তাদের প্রধান প্রধান ধর্মোৎসবের দিনগুলোকে ছুটির দিন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আরেকটা অভিযোগ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। মুসলমানরা অভিযোগ করেছে যে, আমাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থায় তারা শুধু যে আইন ব্যবসায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাই নয়, এমনকি আমাদের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত একটি বিধান তাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ধর্মীয় পদের বিলুপ্তি সাধন করেছে। এই পদের বিলুপ্তির ফলে পারিবারিক ও ধর্মীয় আইন-কানুনের সুযোগ থেকে মুসলমানরা বঞ্চিত হবে। ক্রিমিনাল সিভিল এবং ধর্মীয় আইনের অনেক বিষয়ের বিচার কাজী সম্পন্ন করে থাকে। প্রথম যখন আমরা এদেশের কর্তৃত্ব লাভ করি তখন বিচারের যাবতীয় দায়িত্ব কাজীর উপর ন্যস্ত রাখাই আমরা সঙ্গত বলে মনে করেছিলাম। আমাদের প্রাথমিক বিধিবিধানে এই পদের গুরুত্ব স্বীকার করে তা বহাল রাখা হয় এবং ভারতীয় সংবিধান পুস্তকে কাজীর দায়িত্ব বর্ণনা করে পঁচিশটি রেগুলেশনের যে দীর্ঘ তালিকা সন্নিবেশিত হয় তা আজও পড়ে দেখা যেতে পারে।[২] মুসলমানদের

---

[১] অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ও সহযোগী বিচারপতিদের কাছে পেশকৃত হাইকোর্টের মুসলমান আইনজীবীদের স্মারকলিপির ৩য় অনুচ্ছেদ।

[২] বেঙ্গল কোড- রেগুলেশন ৪, ১৭৯৩ খৃঃ; রেগুলেশন ১২, ১৭৯৩ খৃঃ; রেগুলেশন ১৭৯৩ খৃঃ; রেগুলেশন ৮, ১৭৯৫ খৃঃ; রেগুলেশন ৯, ১৭৯৫ খৃঃ; রেগুলেশন ৩৯. ১৯, ১৭৯৫ খৃঃ; রেগুলেশন ২, ১৭৯৮ খৃঃ; রেগুলেশন ৩, ১৮০৩ খৃঃ; রেগুলেশন১১, ১৮০৩ খৃঃ রেগুলেশন ১৭, ১৮০৩ খৃঃ; রেগুলেশন ১০, ১৮০৬ খৃঃ; রেগুলেশন ৮, ১৮০৯ খৃঃ; রেগুলেশন ১৮, ১৮১৭ খৃঃ; রেগুলেশন ২১, ১৮২৬ খৃঃ।

পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য কাজীর প্রয়োজনীয়তা এরূপ অপরিহার্য যে, মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদরা সিদ্ধান্ত করেন যে, কাজীর পদ যতদিন বহাল থাকবে ততদিন ভারত ইসলামী দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে, কিন্তু এই পদের অবলুপ্তির সাথে সাথে ভারত শত্রুদেশে রূপান্তরিত হবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কেবলমাত্র অতি সম্প্রতি আমরা মুসলমানদের মনোভাবের সাথে পরিচিত হয়েছি ; তাও মুসলমানদের বৈরী মনোভাবের জন্যই আমরা বাধ্য হয়েছি তাদের সমস্যা জানতে। ১৮৬৩ সালে একজন প্রাদেশিক গভর্নর কাজী নিয়োগ অব্যাহত রাখার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠান। গভর্নরটি ধারণা করেছিলেন যে, মুসলমানরা নিজেরাই হয়ত কাজী পদে লোক নিয়োগের কর্তৃত্ব পেয়ে যাবে। বোম্বাই থেকেও কাজী বহাল রাখার বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে। প্রশ্নটা নিয়ে আরো কিছু আলোচনার পর এতদসংক্রান্ত সকল পূর্ববর্তী আইন রহিত করা হয় এবং সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কাজী পদে লোক নিয়োগ প্রথা বিলুপ্ত করেন।[১]

গত সাত বছর যাবৎ বিপুল সংখ্যক মুসলমান, যাদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, বিয়ে শাদী ও পারিবারিক প্রয়োজনে অন্যান্য অপরিহার্য কাজকর্ম সম্পাদনে কাজীর সাহায্য থেকে বঞ্চিত রয়েছে। নতুন আইনের ক্ষতিকর দিকটা অনেক পরে ধরা পড়ে। কারণ পুরনো কাজীরা থেকে যায় ; এবং কেবলমাত্র কেউ পরলোকগমন করলে বা অবসরগ্রহণ করলে শূন্যস্থান পূরণের প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় সে ক্ষেত্রেই শুধু আইন কার্যকরী হয়। প্রথমদিকে বিষয়টি বর্তমান বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; কিন্তু ১৮৭০ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্ট এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত এ সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। বিচারপতি কলেটের সিদ্ধান্ত[২] ঘোষিত হওয়ার পর আর কোন সন্দেহ থাকল না যে, একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারই কাজী নিয়োগ করতে পারে।

রেগুলেশন ১৮২৭ খৃঃ ; রেগুলেশন ৩, ১৮২৯ খৃঃ ; মাদ্রাজ কোড- রেগুলেশন ২১, ১৮০২ খৃঃ ; রেগুলেশন ৩, ১৮০৮ খৃঃ ; রেগুলেশন ৭, ১৮২২ খৃঃ ; রেগুলেশন ৩, ১৮২৮ খৃঃ; বোম্বাই কোড রেগুলেশন ২, ১৮২৭ খৃঃ ; রেগুলেশন ২৬, ১৮২৭ খৃঃ ; এ্যাক্ট ২৭, ১৮৬৩ খৃঃ ; এ্যাক্ট ৭, ১৮৪৩ খৃঃ ; এবং এ্যাক্ট ৫, ১৮৪৫ খৃঃ।

[১] পুরনো যে সব রেগুলেশনের বলে কাজী পদে লোক নিয়োগ করা হত, ১৮৬৪ সালের ২১ নং আইন বলে তা রহিত করা হয়। পরে ১৮৬৮ সালের ৮ নং আইনের তফসিল অনুসারে এই পদ পুরোপুরি বিলুপ্ত করা হয়।

[২] ১৮৬৯ সালের অরিজিন্যাল স্যুট নং ৪৫৩ মোহাম্মদ আবুবকর বনাম মীর গোলাম হোসেন আরো একজনের মধ্যেকার মামলা।

এবং সরকার কাউকে নিয়োগ না করলে সে ক্ষেত্রে মনোনয়ন দানের কোন ক্ষমতা মুসলমানদের নেই। অতএব ১৮৬৪ সালেরই আইন মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় বিধান কার্যকরী করার অপরিহার্য অফিসারের সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে হস্তান্তর দলিলের মুসাবিদা প্রণয়ন ও সত্যায়িত করণ, বিবাহ উৎসব এবং আরো কতিপয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করা ছিল কাজীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। ফলে বর্তমানে সমতল বাংলায় যে জটিল সমস্যা ম্যাজিস্ট্রেটদের বিব্রত করে ফেলেছে সেটা হল মুসলমানদের বিবাহ সংক্রান্ত মোকদ্দমা। যেকোন কারণে হোক, বিবাহের শর্তাবলীর কঠোরতা ইদানিং শিথিল হয়েছে। বদ্বীপ অঞ্চলের জিলাগুলোতে ফৌজদারী দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত ব্যভিচার বা অপহরণের অভিযোগ ক্রমাগত আদালতে দায়ের হচ্ছে। এবং দশটির মধ্যে নয়টি মামলাতেই বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করা কঠিন। কাজী পদে সরকারীভাবে লোক নিয়োগ বন্ধ হওয়ার দু' বছর আগে ১৮৬২ সালে পূর্ব বাংলার দুটি বিভাগে অনুরূপ মামলার সংখ্যা ছিল ৫৬১টি, কিন্তু সরকারীভাবে কাজী নিয়োগ বন্ধ হওয়ার দু'বছর পরে ১৮৬৬ সালে এই মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯৮৪-টিতে এসে দাঁড়ায়। তারপর থেকে ফৌজদারী দণ্ডবিধির আওতায় এই ধরনের মামলার সংখ্যা হ্রাস পেলেও দেওয়ানী আদালতে তা সমানে রুজু হতে থাকে।[১]

ওয়াহাবী মামলার ভারপ্রাপ্ত জনৈক অফিসারের গুরুত্বপূর্ণ নোট থেকে উপরের তথ্যগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। কিন্তু কাজী পদে লোক নিয়োগ সরকারীভাবে রহিত করার রাজনৈতিক ক্ষতিকর দিকটি বর্ণনা করে অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন আরেকজন অভিজ্ঞ অফিসার লিখেছেন ঃ " আমার মতে, ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কাজী পদ বিলুপ্তির দুটি ক্ষতিকর দিক রয়েছে। বিদ্বেষপরায়ণ অর্ধশিক্ষিত[২] লোকের জীবিকার কোন বিকল্প উপায় খুঁজে না পেয়ে বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগে অশিক্ষিত মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে রাজদ্রোহমূলক প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেছে। কিন্তু এর আরো একটি সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর দিকে রয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কর্মরত কাজীর অবর্তমানে

---

১. ভারতীয় দণ্ডবিধির কার্যকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়াই বিবাহ সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাকে আমরা ফৌজদারী দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত করায় বিবাহ আইন সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত অসময়ে আমরা মুসলিম বিবাহ অফিসারের পদ বিলোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এই শ্রেণী থেকে কাজী নিয়োগ করা হত এবং তারা এই পদকেই তাদের আত্মোন্নতির উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

কোন মুসলমানের জীবন তার ধর্মীয় বিধিবিধান মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানেই যে কেবল কাজীর অনুমোদন প্রয়োজন তাই নয়, এমনকি আরো অনেক ছোটখাটো ধর্মীয় ব্যাপারে কাজীর অবর্তমানে মুসলমানদের কাজ চালানো কঠিন, কারণ এসব ব্যাপারে কেবল কাজীই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। সুতরাং এহেন অফিসারের পদ বিলুপ্ত হলে সরকারের অবাধ্য যেকোন লোক জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলার অবাধ সুযোগ পেয়ে যাবে এবং তারা মুসলমানদের কাছে এ কথা বুঝাবে যে, এই সরকারের অধীনে মুসলমানদের বসবাস করা আর সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সরকার নিযুক্ত কাজীকে ব্যবহার করা ও স্বীকার করে নেয়ার অর্থ হল সরকারের কর্তৃত্ব ও আইনসঙ্গত অস্তিত্ব মেনে নেয়া।"

ভারতীয় আইনসভায় যতগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপিত হয়েছে, এটা তার অন্যতম। কোন স্বীকৃত সামরিক দখলের অধীনে, যেমন আলজিরার্সে কাজী পদে সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এটাই প্রমাণ করে যে, বৃটিশ ভারতের মত একটি রাষ্ট্রে যেখানে স্থিতিশীল বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে, সেখানে অনুরূপ পদে সরকারী অনুমোদন ও স্বীকৃতি থাকা প্রয়োজন। বিষয়টি বিতর্কমূলক, কিন্তু ইতিমধ্যে মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত কাজী পদের মর্যাদা ও আইনানুগ কর্তৃত্বকে বাতিল করে দিয়েছে। বিপদমুক্তভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হলে বিষয়টির সকল দিকগুলো গভীরভাবে খতিয়ে দেখা এবং ভারতের দশটি প্রাদেশিক সরকারের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করা প্রয়োজন। তবে বড়লাট যে সদিচ্ছাপ্রণোদিত মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং পূর্ববর্তী ভ্রান্তি সংশোধন করে যেকোন মূল্যে মুসলমানদের প্রতি ন্যায়বিচার করার যে দৃঢ় সংকল্প সরকার নিয়েছেন, তাতে করে আশা করা যায় যে, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযোগের তালিকা থেকে আলোচ্য বিষয়টিও প্রত্যাহৃত হবে।

পূর্ববাংলার মুসলমানদের প্রতি বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে যে উপেক্ষা ও অপমানজনক ব্যবহার প্রদর্শিত হয়েছে, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেও তার প্রমাণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। আমাদের সকল ওরিয়েন্টাল জার্নাল ও লাইব্রেরী থেকে এবং আত্মোন্নতির অন্যান্য সকল ক্ষেত্র থেকেই পূর্বাঞ্চলের এই সাবেক বিজেতাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। পুরানো কোর্ট অব ডাইরেক্টরবৃন্দ মুসলমান হিন্দুদের মধ্যে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা সমভাবে বন্টন করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন ; এবং বাইবেলের পূর্ববর্তী ভারতীয় সংস্করণগুলোতে আরবী ও ফার্সী

ভাষার যে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য প্রতিফলিত হয়েছে তা এই রাজনৈতিক সুবিচারেরই পরিচায়ক। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় সাহিত্যাঙ্গন থেকে হিন্দুরা মুসলমানদের সমভাবে বহিষ্কৃত করেছে। বাংলায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার একদেশদর্শী নীতির মত বাইবেলের ভারতীয় সংস্করণের জন্য কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স-এর বরাদ্দকৃত বার্ষিক ৬০০ পাউণ্ডের অনুদানও পক্ষপাতমূলকভাবে বন্টিত হয়েছে। ডক্টর রোয়ারের আমলে ১৮৪৭ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে আরবী ফার্সী ও সাহিত্যকর্মের জন্য কদাচিৎ দু'একটি বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ডক্টর স্প্রেঙ্গারের স্বল্পমেয়াদী কার্যকালে দুটি বড় রকমের রচনা কার্য শুরু করা হলেও তা সম্পূর্ণ করা হয়নি।

ডক্টর হোরেস হাইম্যান উইলসনের প্রবর্তিত অতি উৎসাহমূলক সংস্কৃত স্কলারশিপ আরবী সাহিত্যকর্মের উপরে ভারতীয় সাহিত্যকে অগ্রগণ্য করার একটা নিকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে দেখান যেতে পারে। তার দ্বারা উৎসাহিত হয়েই কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন যে, অতঃপর বাইবেলের ভারতীয় সংস্করণ শুধুমাত্র ভারতীয় বিষয়াবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বার্ষিক ৬০০ পাউণ্ডের অনুদান প্রত্যাহারের দুঃখজনক সিদ্ধান্তও তারা গ্রহণ করেন। চরিত্রবল ও নিজের বিষয়সমূহের উপর গভীর দক্ষতাসম্পন্ন এই ব্যক্তিটি বেশিদিন এই দায়িত্বে বহাল থাকেননি। ডক্টর এইচ, উইলসন আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষার মূল ভিত্তি রচনা করনে এবং তার উপর ভিত্তি করেই ম্যাক্সমুলার বর্তমানে কারুকার্যময় সৌধ রচনায় ব্যাপৃত আছেন। ইতিমধ্যে গোল্ড স্ট্যাকার আউফ্রেট ফিজ-এডওয়ার্ড হল এবং মুর ভিত্তিটাকে এমনভাবে মজবুত করে তুলেছেন যাতে করে এই সুন্দর সৌধটি চিরকাল টিকে থাকতে পারে।

কিন্তু সেমিটিক স্কলারদের একটা ক্ষুদ্রদল এখনও সংঘবদ্ধভাবে শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স কোন অভারতীয় পরিকল্পনায় সাহায্য না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেমিটিক পণ্ডিতরা এই ব্যাপারটা নিয়ে লড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং বাধ্য হয়ে তারা আরবী সাহিত্যকর্মের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। তারা মুসলমান সাম্রাজ্যের ফার্সী সাহিত্যকর্মের মধ্যেই শুধু তাঁদের কর্মসূচী সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। স্যার হেনরী ইলিয়ট অবিচলিতভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। মিঃ থমাস, মিঃ হ্যামণ্ড স্যার উইলিয়াম মুর এবং আরো কতিপয় সিভিলিয়ানের একটা চমৎকার গ্রুপ দূরবর্তী কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সুযোগ-সুবিধাগুলো স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে সমর্থ হন। ১৮৫৫ সালে উত্তর-

পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফার্সী এম, এস, এস, সংগ্রহের জন্য সরকারী তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। প্রথম উদ্যোগেই ৬৭-টি গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। মিঃ থমাসের প্রশংসনীয় সম্পাদনায় স্যার হেনরী ইলিয়টের নিবন্ধগুলো প্রকাশিত হওয়ায় প্রফেসর ডাউসন এবং মিঃ বীমশ ব্যাপকতর ক্ষেত্রে কার্যরত রয়েছেন। এদিকে লক্ষ্ণৌর মুসলমান ছাপাখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের বই ছেপে বেরুচ্ছে। কর্নেল নাসাউ লেস তার সকল প্রভাব ও জ্ঞান এই কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং ইণ্ডিয়া অফিসের নবনিযুক্ত লাইব্রেরীয়ান ডক্টর রোস্টের সহযোগিতায় প্রাচ্যদেশীয় ভাষাবিদরা একটা অতি উল্লেখযোগ্য বৃত্তি লাভ করছেন। ভারতেও শুভ সূচনা দেখা দিয়েছে এবং এখানে মিঃ ব্লকম্যানের মত একজন কর্মোৎসাহী পণ্ডিত ব্যক্তি প্রাচ্য দেশীয় সাহিত্যকর্মে ইতিমধ্যে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন।

মুসলমানদের দরখাস্ত এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করলাম। তহবিল তসরূপ এবং অবিচারের যে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তারা এনেছে, তার সমাধানের দায়িত্ব সরকারের। গত দু'বছরে সরকার অসন্তোষ নিরসনের এবং অসন্তোষের কারণসমূহ দূরীকরণের জন্য আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের যে সাধারণ ও সাময়িক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে। অভিযোগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আমাদের প্রবর্তিত অসম শিক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে তাদের ক্ষোভের মূল কারণ। এই শিক্ষায় সুশিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলার মুসলমানরা জীবনে উন্নতি সাধন কিংবা সরকারী চাকরিতে ন্যায্য অংশ লাভের আশা করতে পারে না। কিন্তু আমাদের স্কুলসমূহে মুসলমানী শিক্ষার প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণে তারা এগিয়েও আসবে না। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনটা, আমার মতে, অত্যন্ত সহজ এবং ব্যয়মুক্ত। তবে সে বিষয়ের অবতারণার আগে ইতিমধ্যেই আমরা এতদসংক্রান্ত বিরাট উদ্যোগ নিয়েছি সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। ভারতে মুসলমানদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে ইংরেজরা ব্যর্থ হয়েছে ; কিন্তু দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করতে গিয়ে তারা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে কেবল সেগুলো আলোচনা করাই সঙ্গত হবে।

ঠিক নব্বই বছর ধরে রাষ্ট্রীয় খরচায় কলকাতায় মুসলমানদের একটি কলেজ চালিয়ে আসা হচ্ছে।[১] জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে

---

[১] বাংলায় এই কলেজটি মাদ্রাসা নামে পরিচিত।

ওয়ারেন হেষ্টিংস যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এটি তাদের অন্যতম। মুসলমানদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য বঞ্চিত পরিবর্তনটি ১৭৮১ সালে বড়লাটের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এবং তাদেরকে তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করতে থাকেন। বড় বড় মুসলমান পরিবারগুলোর আর্থিক সঙ্গতি বিনষ্ট হওয়ায় তাদের সন্তানদের উপরি স্তরের সরকারী চাকরির উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার সামর্থ্য তারা হারিয়ে ফেলে। তাদের অনুকূলে সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংস রাজধানীতে একটা মোহামেডান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার স্থায়ী ব্যয় নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিলের একটা অংশ বরাদ্দ করেন। মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে কলেজটির পরিচালনার দায়িত্ব তিনি মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করেন। সরকারী চাকরির জন্য ফার্সী ও আরবীর প্রয়োজনীয়তা রহিত হওয়ার দীর্ঘকাল পরেও কলেজটিতে শিক্ষার একমাত্র বাহন হিসেবে আরবী ও ফার্সী চালু রাখা হয়। প্রাপ্ত সুযোগে বড় রকমের অপব্যবহার ঘটার পর ১৮১৯ সালে কলেজটিতে একজন ইউরোপীয় সেক্রেটারী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮২৬ সালে একটি ইংরেজি ক্লাস চালু করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই সেটা বন্ধ করতে হয়। তিন বছর পর অধিকতর প্রয়োজনীয় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু তাতেও প্রয়োজনীয় সুফল পাওয়া যায়নি। পরবর্তী পঁচিশ বছর কলেজটির ভাগ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাগ্যের মতই অপরিবর্তিত থাকে। কলেজটির কথা দৃষ্টির অগোচরে চলে যায় এবং স্থানীয় সরকার এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন।

১৮৫১ থেকে ১৮৫৩ সালের মধ্যে কর্তৃপক্ষ অনুভব করেন যে, শোচনীয় অবস্থায় পতিত এই প্রতিষ্ঠানটির সংস্কারের জন্য কিছু করা দরকার। এ সম্পর্কে উত্থাপিত প্রস্তাবের[১] ফলাফল দু'রকমের হয়। কলেজটিকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। নিম্নতর বিভাগের মধ্যম মানের[২] উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই বিভাগের নাম রাখা হয় এ্যাংলো পার্শিয়ান শাখা। উচ্চতর বিভাগে কেবলমাত্র আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিকল্পনার ত্রুটি অনতিকাল মধ্যে ধরা পড়ে। ছাত্ররা উচ্চতর

---

[১] ফার্সী ও আরবীতে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন এবং মুসলমানদের আস্থাভাজন সিভিলিয়ান মিঃ জে, আর, কলভিন প্রস্তাবটি পেশ করেন। মিঃ থমসনের মৃত্যুর পর তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় আগ্রা দূর্গে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[২] বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার সমান মান।

বিভাগের আরবী শাখায় প্রবেশের পর নিম্নতর বিভাগে বিভিন্ন ভাষায় প্রাপ্ত শিক্ষা ভুলে যেতে থাকে। এই ব্যবস্থার ফলাফল বর্ণনা করে ১৮৫৮ সালে বলা হয় : মুষ্টিমেয় কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি এখান থেকে শিক্ষা পেয়ে বেরিয়ে যান; তাঁদের বিশিষ্ট সংকীর্ণ গণ্ডীতে তারা সুশিক্ষিত, কিন্তু সরকারী চাকরি পাওয়ার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার যোগ্যতা তারা অর্জন করতে পারেননি। ফলে তারা আড়ম্বরী, আত্মনির্ভর, হতাশ এবং অবাধ্য না হলেও অসন্তুষ্ট একটা শ্রেণীতে পর্যবসিত হন।[1]

কলেজটির সংস্কারের জন্য আরো একবার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং তাতে মাত্র দু' এক বছরের জন্য কিছুটা সুফল পাওয়া যায়।[2] কিন্তু শীঘ্রই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায় এবং কলেজটির অবনমিত অবস্থা তদারকের জন্য ১৮৬৯ সালে বাংলা সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করেন, যার কাজ এখনও শেষ হয়নি। বাস্তব অবস্থা এই যে, এই মোহামেডান কলেজটি তার ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেনি। বর্তমান সময়ের সর্বাধিক প্রথিতযশা মুসলিম সংস্কারকের[3] ভাষায় : সমগ্র ব্যবস্থাটি ছাত্রদের শুধু মাঝ পথে অবতরণ করাতে পারে। ছাত্ররা প্রথম স্তরে যে যৎসামান্য ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে, পরবর্তী স্তরের কেবলমাত্র আরবী শিক্ষার ফলে তা কোন কাজে আসে না ; কারণ ইংরেজি শিক্ষা অব্যাহত রাখার কোন ব্যবস্থা কলেজটিতে নেই। নিচের স্তরে যে সামান্য ইংরেজি জ্ঞান তারা লাভ করে, উচ্চতর স্তরে গিয়ে সেটুকুও তারা ভুলে যায়।

একটা চমৎকার উদ্যোগের ফল কেন এ রকম শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো সে সম্পর্কে দু' একটি কথা বলতে চাই। প্রথম বলা দরকার যে, কলেজটির কাজকর্ম তদারকের ব্যবস্থা আশানুরূপ নয়। অতি অল্প সময়ের মেয়াদে একজন ইংরেজি প্রিন্সিপ্যাল থাকলেও তিনি নামমাত্র কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। তার উপর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সরকারী দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল

---

১. মিঃ ই, সি, বেইলীর নোট থেকে সংগৃহীত। আলোচ্য অধ্যায়ের অনেক কিছু মাল-মশলা সংগ্রহের জন্য আমি তার কাছে ঋণী।

২. কলেজের অনারারী প্রিন্সিপ্যাল কর্ণেল নাসাউ লীসের সুপারিশক্রমে গৃহীত ব্যবস্থা। (তিনি এখন ভারতে নেই এবং এ সম্পর্কে কিছু বলতেও পারবেন না।) তিনি পুনঃ পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং পরে এ সম্পর্কে যে সুপারিশের কথা আমি বলবো তা কয়েক বছর আগে তিনিই বলে গিয়েছিলেন।

৩. মৌলবী আব্দুল লতিফ খান বাহাদুর।

এবং বাংলায় আমাদের প্রতিষ্ঠিত এই বিরাট মোহামেডান কলেজটির অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মাত্র অবৈতনিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। অন্যান্য কাজের জন্য যে বেতন তিনি পেতেন, কলেজটির প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে তার চেয়ে মাত্র সামান্য কিছু বেশি তাঁকে দেওয়া হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমান প্রিন্সিপ্যালের মূল চাকরি হল সেক্রেটারী টু দি বোর্ড অব একজামিনার্স । তাঁর হাত দিয়েই প্রেসিডেন্সী বিভাগের সকল মিলিটারী অফিসাদের চাকরির জন্য পাস করে বেরোতে হয় এবং সিভিলিয়ানদের মধ্যে যারা ভারতীয় ভাষায় অনার্স কোর্সে পড়েছেন তাদেরকেও এই ভদ্রলোকের হাত দিয়ে পাস করে বেরোতে হয়। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের অস্থায়ী এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ও অনুবাদকের দায়িত্বে তিনি নিযুক্ত আছেন। এ ছাড়াও সরকারের আরো অনেক খুঁটিনাটি কাজের দায়িত্বও তাঁর উপর চাপানো আছে। এই সকল দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মোহামেডান কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজটিও তাঁর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে এবং তার যতই কর্মোৎসাহ থাকুক না কেন, এত অসংখ্য দায়িত্ব পালনের পর কলেজটির মান উন্নয়নের জন্য তিনি আর কতটুকুইবা করতে পারেন। কলেজের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা তো আরও শোচনীয়। নিম্নতর বিভাগের অধ্যক্ষ একজন কর্মদক্ষ পন্ডিত ব্যক্তি; কিন্তু উচ্চতর বিভাগে যেখানে আরবী পড়ানো হয় সে পর্যন্ত তাঁর কর্তৃত্ব পৌঁছুতে পারে না। এই বিভাগটির উপর গোটা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও গোটা কতক নেটিভ মৌলবীর উপরই শুধু তার পরিচালনভার ন্যস্ত রয়েছে। এদের মধ্যে হেড মৌলবী পদবাচ্যের একজন কর্মকর্তা আছেন বটে ; কিন্তু তাঁর কর্তৃত্বের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, ফলে অধীনস্ত শিক্ষকরা তার কাছে দায়ী নন এবং তাঁকে কখনও নিজের ক্লাশরুমের বাইরে দেখতে পাওয়া যায় না।[১] মাসিক বা ত্রৈমাসিক পরীক্ষা গ্রহণের কোন ব্যবস্থা নেই; এবং শ্রেণীসমূহের পড়াশুনা দৈনিক বা সাপ্তাহিক তদারকির কোন ব্যবস্থাও করা হয়নি। এটা স্পষ্ট যে এ ধরনের ব্যবস্থায় কোন সুফল আশা করা যায় না। অন্য কাজ থাকায় প্রিন্সিপ্যাল কলেজের কাজ তদারকের সময় পান না। হেড মৌলবী তদারকের চেষ্টা করেননি এবং এর বাস্তব ফল যা হয়েছে সে তো আমরা দেখেছি।

---

[১] পরিস্থিতি তদন্তের জন্য গঠিত কমিশন সংস্কারের উদ্দেশ্যে কোন প্রস্তাব প্রণয়ন করেছেন কিনা তা আমি জানি না । কিন্তু কমিশন নিয়োগের সময় কলেজটির বাস্তব অবস্থা যেরূপ ছিল তার সঠিক ও যথার্থ বর্ণনা আমি এখানে লিপিবদ্ধ করেছি।

এই উপেক্ষা বাংলার মুসলমান যুবকদের কত যে ক্ষতি করেছে তা অতিরঞ্জিত করে দেখান অসম্ভব। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এক পুরুষ আগে আমরা যখন হুগলী অনুদান তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ করেছি, তখন কলকাতা কলেজটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারলে মুসলমানরা উচ্চস্তরের শিক্ষা আশা করতে পারত। প্রায় একশ' জনের একদল মুসলমান যুবক প্রাচ্য দেশীয় একটি কর্মচঞ্চল রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমায়েত হয়ে ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশে সাত বছর অতিবাহিত করে। তাদের আচরণবিধির উপরে কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না; সম্মানজনক দক্ষতার কোন দৃষ্টান্তও তাদের সামনে ছিল না; এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত যোগ্য শিক্ষা ছাড়াই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। তাদের শতকরা প্রায় আশিজন এসেছে পূর্বাঞ্চলে ধর্মান্ধ জিলাসমূহ[1] থেকে। ইংরেজি বর্জিত এই শিক্ষা গ্রহণ করে ভাল বেতনের আর্কষণীয় চাকরি পাওয়া সম্ভব নয় বলেই বাংলার অপেক্ষাকৃত রাজানুগত জিলাগুলো থেকে ছাত্ররা এই কলেজে আসতে চায়নি। সরকার-বিদ্বেষী পরিবেশে ছাত্রদের বাল্যকাল কেটেছে। তাদের অনেকেই গরীব এবং কলকাতায় এসে তারা ইংরেজ ভদ্রলোকদের খানসামাদের[2] আতিথ্য গ্রহণ করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই খানসামারাই বেশ অর্থবান এবং তারা তাদের প্রভুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে স্বধর্মীয় দরিদ্র যুবকদের পোষকতা করে থাকে। ছাত্রদের অধিকাংশের বয়স ষোল বছরের উপরে, অনেকের বিশের উপরে; এবং আমাকে জানানো হয়েছে যে অনেকের বয়স আবার তিরিশের উপরে। এদের আশ্রয়দাতা খানসামারা এটাকে একটা ধর্মীয় কাজ মনে করেই ক্ষান্ত থাকে না, মোটা যৌতুকসহ তারা তাদের কন্যাদের এদের সাথে বিয়ে দিয়ে থাকে। অবশিষ্ট ছাত্ররা ক্ষুদে ভূস্বামী পরিবারের ছেলে। ইংরেজি বা বিজ্ঞান পড়ার কোন প্রায়াজনীয়তাই তারা অনুভব করে না। কিছুটা ফার্সী এবং খানিকটা আরবী গ্রামার ও আইন শিখতে পারলেই তারা যথেষ্ট মনে করে। বাড়িতে তারা জমি চাষ ও নৌকা চালিয়ে কাটাত। তারা বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষকদের উচ্চারণভঙ্গীতে কথা বলে এবং কলিকাতার মুসলমানদের কাছে তাদের উচ্চারণ দুর্বোধ্য ঠেকে।

---

[1] বেশির ভাগ ছাত্র এসেছে চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ ও শাহবাজপুর থেকে।

[2] ধর্মীয় কাজ বিবেচনা করে খানসামারা দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করে এই ধরনের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাকে জায়গীর বলা হয়। মুসলিম সাম্রাজ্যের সামরিক শাসনকর্তাদের 'জায়গীরদার' পদবীর সাথে এই নামের মিল লক্ষণীয়।

এরাই হচ্ছেন নবাগত ছাত্র । কয়েক বছরের মধ্যে তাদের গেঁয়ো অভ্যাস পরিবর্তিত হয় দাঁড়ী ছেটে তারা মুসলিম আইনের তরুণ অধ্যাপক সেজে বসে। দয়াবান সরকার একশ' জনের মধ্যে আটাশটি বৃত্তি মঞ্জুর করেন যাতে করে প্রতিটি আবেদনকারী ছাত্র দু'দিন আগে বা পরে বৃত্তি পেতে পারে। তাদের মধ্যে লেখাপড়ায় অমনোযোগী অথচ করিৎকর্মা যারা, তারা অল্পদিনের মধ্যে ছোটখাটো ব্যবসায় ফেঁদে বসে। যারা উপরি ক্লাসের ছাত্র তারা তো আত্মগর্ভে বুক ফুলিয়ে হাঁটে। তারা যে গরীব বৃত্তিভোগী ছাত্র একথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বড় বড় বই-কেতাব বোগলে চেপে তারা কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর আশ্রয়দাতা খানসামাদের কাছে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সমান মর্যাদা পাবার আকাঙ্খা পোষণ করে। আমরা কাজীর পদ বিলোপ করায় এদের জন্য সেটা শাপে বর হয়েছে । কারণ ইসলামী পারিবারিক আইন ব্যাখ্যার দায়িত্ব এখন এদেরই এখতিয়ারে এসে গেছে। এই কলেজের ছাত্ররা এখন নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের বিবাহানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করে এবং হিদায়াত ও জামি-উর-রুমুজ মোতাবেক সিদ্ধান্ত বিক্রি করে ।

এদেশের যুবকদের মধ্যে এই মোহামেডান কলেজটির ছাত্রদের জন্যই উত্তম অভিভাবকত্ব সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তারা কি ধরনের অভিভাবকত্ব পেয়ে থাকে সে কথা আগেই বর্ণনা করেছি। আমাদের কাছ থেকে যে শিক্ষা তারা পেয়ে থাকে তাতে নিজস্ব সংকীর্ণ শিক্ষা পদ্ধতির উপর তাদের আস্থা দৃঢ়মূল হয়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত যোগ্যতা তারা অনেক কম অর্জন করতে পারে; এবং আমাদের সরকারের প্রতি তাদের অবাধ্যতা বৃদ্ধি পায়। কোন ইংরেজকে দেখামাত্র ঘৃণায় তাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। এই অবনতি সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় কলেজটিতে একজন আবাসিক ইংরেজ অধ্যাপক[১] নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিন্তু তাকে রাতের অন্ধকারে চুপিসারে কলেজে ঢুকাতে হয়। নব্বই বছরের অধিককাল যাবত কলেজটি পাঠ্যসূচীতে কাফেরদের বিরুদ্ধে পবিত্র জিহাদের পাঠ অগ্রাধিকার লাভ করে এসেছে; এবং আমার যতটা মনে পড়ছে ১৮৬৮ বা ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত ছাত্রদের পরীক্ষায় জিহাদের ফতোয়ার উপর নিয়মিত প্রশ্নপত্র দেয়া হত। কলেজের প্রায় চৌহদ্দীর মধ্যে বিদ্রোহীদের

---

[১] বর্তমানে মিঃ ব্লকম্যান এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আরবী ও উচ্চতর বিভাগের উপর আবাসিক ইংরেজ অধ্যাপকের কোন কর্তৃত্ব নেই।

একটা মসজিদ[১] গজিয়ে উঠেছে, এবং ছাত্ররা প্রায়ই কলকাতার বিভিন্ন মসজিদে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করে বেড়ায়। বর্তমান হেডমাস্টারের পিতা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে এবং রাজদ্রোহমূলক কাজের শাস্তি হিসেবে ভারত মহাসাগরে একটা দ্বীপে তাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দন্ডিত করা হয়। এই শিক্ষিত রাজদ্রোহীর লাইব্রেরীটি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়, কিন্তু সেখানকার বইগুলো এখন কলকাতার আলোচ্য কলেজেই স্থান লাভ করেছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে আবাসিক ইংরেজ অধ্যাপক কলেজের সীমানা থেকে এমন একজন আরব মুসাফিরকে বহিষ্কার করেছেন যিনি ধর্ম প্রচারের নামে এমন এক মতবাদ প্রচার করছিলেন যার দরুন আমাদেরকে তিনটি সীমান্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে এবং যে প্রচারণার ফলশ্রুতিতে গোটা সাম্রাজ্যব্যাপী বিদ্রোহের চক্রান্তজাল বিস্তৃত হয়েছে।

সাত বছর ধরে এই জাতীয় শিক্ষা লাভ করার পর এই সব মুসলমান যুবকদের আমরা পূর্বাঞ্চলের ধর্মান্ধ জিলাগুলোতে ফেরত পাঠাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় অধিকতর দুঃখজনক ঘটনাগুলো এখনও বলা হয়নি। গত দু'বছরের ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছু বলিনি, কারণ বিশেষ কমিশন ঐ দু'বছর যাবত কার্যরত রয়েছে। কিন্তু এটা প্রমাণের মত যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে যে, অতি সম্প্রতি ছাত্ররা তাদের অসতী উপ-পত্নীদের কলেজে নিয়ে আসে।[২]

তাদের ছাব্বিশ জনেরই নিজস্ব কামরা আছে এবং সরকার কর্তৃক বরাদ্দ ছাত্রাবাস এভাবে লাম্পট্যগিরির আখড়ায় রূপান্তরিত হয়। কারলাইল যাদেরকে ভ্রষ্টা নারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং খ্রীস্টান ধর্ম যে পাপ ব্যবসাকে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করেছে, সেই ব্যবসায় ভারতের প্রতিটি বড় শহরে বেশ জেঁকে বসেছে। গত পাঁচ বা ছয় বছরের কলেজে ছাত্রদের মধ্যে অনুরূপ তিনটি ঘটনা ধরা পড়েছে; কিন্তু আদতে কতটা ঘটনা যে ঘটেছে তা জানা যায়নি।

এমনকি এমন অল্প সংখ্যক ছাত্র আছে যারা নিজেদের চেষ্টাতেই ভাল ফল দেখাতে পারে, কিন্তু তাদেরকে ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। প্রথমত, প্রতিদিন খুব অল্প সময় তাদেরকে পড়ানো হত। ক্লাশ নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় ছিল সকাল দশটা থেকে দুপুর দু'টো পর্যন্ত।

---

[১] ফারায়েজী মসজিদ।

[২] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কলেজের নন-রেসিডেন্ট প্রিন্সিপ্যাল কর্নেল লীস এ ঘটনার জন্য মোটেই দায়ী ছিলেন না। উপ-পত্নী আনার ঘটনা ধরা পড়ার পর তিনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে করে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এর মধ্যে আবার শিক্ষক ও ছাত্রদের হুকা টানার (ধূমপান) জন্য প্রায় বিশ মিনিট চলে যেত (কলেজে এই হুকাকে তামাসা করে মূসার ডান্ডা নামে অভিহিত করা হয়)। তারপর রোলকল করার জন্য আধঘন্টা ব্যয়িত হত—রোজ দু'বার করে রোলকল্ করা হত, কারণ বহু ছাত্র বারোটার পর ক্লাশ ছেড়ে চলে যেত। কিছুসংখ্যক অধ্যবসায়ী ছাত্র আবার কলেজের অপর্যাপ্ত পড়া পুষিয়ে নেয়ার জন্য বাইরের বেসরকারী মুসলমান স্কুলে গিয়ে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করত। হাদিস, মুসলমানী আইনশাস্ত্র ও মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধমূলক কিতাব পড়ার জন্যই এসব ছাত্র বাইরের প্রাইভেট স্কুলে গিয়ে থাকে এবং এতে করে কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়েও সংকীর্ণ মতভেদ দানা বেঁধে ওঠে। ইংরেজ আবাসিক অধ্যাপক সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় টহল দেয়ার সময় ছাত্রাবাসে হট্টগোল শুনতে পান। 'তোমার ধর্মীয় জ্ঞান ভ্রান্ত'[১] এই জাতীয় পারস্পরিক নিন্দাবাদ চারদিক থেকে উঠছিল । তিনি দ্রুত ছাত্রদের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, নামায পড়ার সময় দু'পায়ের গোঁড়ালি যুক্ত থাকবে কিনা সে সম্বন্ধে ছাত্ররা তুমুল বাদানুবাদে রত হয়েছে।

কলেজের একজন শিক্ষক আমাকে জানিয়েছেন যে, পড়ার জন্য তিন ঘন্টা সময় নির্দিষ্ট করা হলেও প্রকৃতপক্ষে আড়াই ঘন্টার বেশি কদাচিৎ ক্লাশ হয়ে থাকে। বাড়ি থেকে পড়া তৈরি করে আনার কোন বিষয়ই এখানে প্রচলিত নেই এবং এটা মুসলমানদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা ব্যাপার। প্রত্যেক শিক্ষক এক এক লাইন আরবী পড়ে শব্দগুলোর অর্থ ছাত্রদের শুনায়। উৎসাহী ছাত্ররা শিক্ষকের কাছ থেকে শ্রুত শব্দের অর্থগুলো তার মূল আরবী কিতাবের প্রতিটি লাইনের নিচে টুকে নেয় এবং তারপর নিজের পছন্দমত ব্যাখ্যা জুড়ে নেয়। বাড়িতে বসে কি করে অভিধান থেকে শব্দের অর্থ খুঁজে বের করতে হয় অথবা প্রতিটি পঙক্তির ব্যাখ্যা কিভাবে নির্ণয় করতে হয়, এসব বিষয় তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ; সম্ভবত তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কাছে এ পদ্ধতি বিপজ্জনক। সাত বছরের পড়া শেষ হওয়ার পর ছাত্ররা তাদের পাঠ্যপুস্তকের অনেক কিছু মুখস্থ বলতে পারে। কিন্তু ঐ সংকীর্ণ গন্ডীর বাইরের কোন বিষয় উপস্থিত করা হলে তারা লা-জওয়াব হয়ে যায়। এ ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকরা তাদের পাঠ্য তালিকার বহির্ভূত কোন বিষয়ের সম্মুখীন হলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে আরবী ব্যাকরণ . আরবী আইন.

---

[১] তুমহারা ইমান ঠিক নেহি।

আরবী সাহিত্য এবং আরবী ন্যায়শাস্ত্র ছাড়া দুনিয়ার বুকে আর যা কিছু আছে সবই বাজে। তারা শিখেছে যে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য হচ্ছে আরব দেশ ; তারপরেই হল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া ; এবং সবচেয়ে বড় শহর হচ্ছে মক্কা, মদীনা ও কায়রো এবং তারপরেই হচ্ছে লণ্ডন। তারা আরো শিখেছে যে, ইংরেজরা হচ্ছে কাফের এবং পরকালে তারা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা। এই বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের পর আর কি-ইবা অবশিষ্ট থাকতে পারে। জনৈক ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ তাদের পাঠ্যসূচীতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান (তাও তাদেরই উর্দু ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করলে ছাত্ররা তাঁকে ইট মেরে নাজেহাল করে কি ঠিক কাজ করেনি ?

মুসলমানদের প্রকৃত সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার বর্তমানে সচেতন হয়েছেন বলেই আমি কলেজটির অভ্যন্তরীণ অবস্থার দুঃখজনক দিকগুলোর ওপর বিশদ আলোকপাত করলাম। কলকাতা মোহামেডান কলেজটির পরিচালনার দায়িত্ব কেবলমাত্র মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং তাদের ব্যবস্থাপনাতেই প্রতিষ্ঠানটির এহেন শোচনীয় অধঃপতন দেখা দিয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাগ্যাবনতি সম্পর্কে আমাদের সরকারের উপেক্ষা ও অমনোযোগী নীতির ফলেই কলেজটির মান দ্রুত অবনতি হয়ে পড়া সত্ত্বেও মানোন্নয়নের জন্য সরকার এতদিন কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নি। একশ' বছর ধরে কলেজের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেটিভদের হাতে থাকার কারণেই মুসলমানরা সেখানে কেবল কুশিক্ষাই পেয়েছে ; মুসলমানদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর কোন শিক্ষাই সেখানে কেউ পায়নি। এই মোহামেডান কলেজের পরিচালন ভার শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা একটা মস্ত ভুল করেছি। ১৮১৯ সালেই সরকার এটা উপলব্ধি করেন, কিন্তু সরকার আশা করেন যে, একজন ইউরোপীয় সেক্রেটারীর মামুলী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাই যথেষ্ট হবে। হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছা প্রকাশের কারণেই গত বিশ বছরের সকল সংস্কারমূলক উদ্যোগ ভেস্তে গেছে। শেষ পর্যন্ত একজন প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হয় বটে, কিন্তু তাঁর দায়িত্ব ছিল সাময়িক ও অবৈতনিক। অবশেষে একজন আবাসিক অধ্যাপক নিয়োগ করা হলেও নিজের বিভাগের দায়িত্ব পালনের মধ্যেই তাঁর কর্তৃত্ব সীমিত রাখা হয়।

একটি রাষ্ট্রীয় পত্রিকায় সম্প্রতি অভিযোগ করে বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র উত্তর ভারতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ও অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারে মুসলমানরা ভাল অবদান রাখতে পেরেছে। এ অভিযোগের জওয়াব

অতি পরিষ্কার। বাংলায় ধর্মপ্রাণ ও ধনী মুসলমানরা (যেমন কলকাতার 'নাখোদা' সম্প্রদায়) ফার্সী ও আরবী পড়ানো হয় না এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মোটেও আগ্রহশীল নয় ; এবং তারা মনে করে যে, এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাফের হিন্দু শিক্ষকদের হাতে তাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মবিশ্বাস বিনষ্ট হয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের আমাদের স্কুলে পাঠায়, কিন্তু বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা অতি নগণ্য। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও পৌঁছাতে পারেনি, যদিও রেভারেণ্ড জেমস লং-এর মত মিশনারীদের স্কুল তাদের ছেলে-পেলের ভর্তি এটা আমি দেখেছি। পূর্ববাংলার ধর্মান্ধ মুসলমান কৃষক সমাজে ইংরেজি শিক্ষা বা ইংরেজ প্রভাবের বাইরে রয়ে গেছে।

তবু আমার বিশ্বাস, সরকারী তহবিলের সামান্য একটা অংশ ব্যয় করে সকল শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য একটি কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। অনুরূপ ব্যবস্থায় নিম্ন শ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী এবং উচ্চ শ্রেণীর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রথম শ্রেণীর জন্য বর্তমান সাহায্য ব্যবস্থা ও নিয়ম-কানুন সামান্য রদবদল করলেই চলবে। বেশি অর্থের প্রয়োজনের চেয়ে বরং মুসলমানদের বিশেষ চাহিদা পূরণ করাই বেশি দরকার, সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন যে পাঁচ মাইলের মধ্যে দুইটি স্কুলে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে না কারণ তাহলে সরকারী অর্থের বিনিময়ে বেহুদা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যান্য সকল ব্যাপারের মত এই ব্যাপারেও চতুর হিন্দুরা আগে মাঠে নেমেছে। তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাবার মত করে সারা দেশে স্কুল গড়ে তুলেছে ; কিন্তু তাদের স্কুল মুসলমানদের কোন প্রয়োজন মিটাতে পারে না। সুতরাং পাশে হিন্দু স্কুল থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা যাতে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার সুবিধার জন্য 'পাঁচ' মাইলে নিয়ম শিথিল করতে হবে। পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রয়োজন নেই সেসব ক্ষেত্রে বর্তমান হিন্দু স্কুলে একজন মুসলিম শিক্ষক নিয়োগ করে সরকার মুসলমানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারেন। সপ্তাহে পাঁচ শিলিং বেতনের বিনিময়ে অনুরূপ মুসলমান শিক্ষক পাওয়া যেতে পারে।

পূর্বাঞ্চলে ধর্মান্ধ জিলাগুলোর মুসলমান কৃষকদের মধ্যে পৌঁছাবার জন্য সরকার একটা বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলে বেশ সুফল পাওয়া যাবে। হিন্দুদের জন্যও একবার অনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা

দিয়েছিল। যেসব জিলায় স্বনির্ভর শিক্ষার কোন চাহিদা নেই সেখানে শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে লর্ড হার্ডিঞ্জ বহু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৮৬৬ সালে আমি যে সময় কর্মরত ছিলাম তখন বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের অধীনে অনুরূপ স্কুলের আটত্রিশটি টিকেছিল। এদের জন্য সরকারকে বার্ষিক ১১০০ পাউন্ড খরচ বহন করতে হয়েছে। এছাড়াও স্কুলগুলোর ফিস্ বাবদ আয় হত ২৬৭ পাউন্ড, কিন্তু তা মোটেই স্বনির্ভরতার পরিচায়ক নয়। কিন্তু এই সব স্কুলের দ্বারা যে কল্যাণ হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। যেখানেই কৃষকরা ছিল অজ্ঞ দরিদ্র ও কুসংস্কারে ঢাকা, সেখানেই অনুরূপ একটি হার্ডিঞ্জ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। প্রথম দিকে গ্রামবাসীদের শিক্ষার জন্য কোন পয়সা খরচ করতে হয়নি। কিন্তু পরে শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় স্কুলগুলোতে ছাত্র বেতন প্রবর্তিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই স্বনির্ভরতার সৃষ্টি হয়ে উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং হার্ডিঞ্জের সস্তায় শিক্ষাদান পদ্ধতি তখন দেশের অধিকতর অনগ্রসর অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় এভাবেই শিক্ষার প্রসার ঘটানো হয়েছে।[১]

আমার মতে বর্তমানে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতেও উক্ত একইপদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের সরকারের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মানসিকতাসম্পন্ন জনসাধারণের মধ্যে গ্রান্ট-ইন-এইড পদ্ধতি পৌছাতে পারবে না। কিন্তু সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠিত এবং অল্প বেতনের মুসলমান শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত পঞ্চাশটি সস্তা স্কুল এক পুরুষের মধ্যেই পূর্ববাংলার জনমতে পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। এই ব্যবস্থায় প্রথম দিকে কম সাফল্য পাওয়া গেলেও ক্রমান্বয়ে তা শুধু মুসলমান কৃষক সন্তানদেরই আকর্ষণ করবে তাই নয়[২] এমনকি মুসলমান শিক্ষকদেরও যথেষ্ট উপকার করবে। মুসলমান শিক্ষকদের জীবিকার ব্যবস্থা বর্তমানে বেশ শোচনীয়, কিন্তু সরকারী তহবিল থেকে সপ্তাহে অতিরিক্ত পাঁচ শিলিং করে পেলে তা' তাদের স্বাধীনভাবে ভাগ্যোন্নতির পথ খুলে দেবে। এভাবে এমন একটা শ্রেণীকে আমরা আমাদের

---

[১] ১৮৬৫-৬৬ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম মোট ২৮৩টি স্কুলে ১৪.০৪৩ জন ছাত্র ছিল।

[২] দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগে মোট ২৮৩টি স্কুলে ১৭.০৪৩ জন ছাত্র ছিল।

সাথে পেয়ে যাব যারা বর্তমানে আমাদের ঘোর বিরোধিতা করে বেড়াচ্ছে।[১]

মুসলমানদের জন্য নিম্নস্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে এতক্ষণ বলা হল। তাদের মধ্যম স্তরের শিক্ষার জন্য পরিবর্তন আরো কম প্রয়োজন হবে ; ওয়াহাবী মামলায় সরকারী ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি ইতিপূর্বেই প্রত্যেক সরকারী জিলা স্কুলে একজন করে মুসলমান শিক্ষক (মৌলবী) নিয়োগের প্রস্তাব করেছেন, এবং এটাই যথেষ্ট হবে। এই শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব শাখায় উর্দুর মাধ্যমে শিক্ষা দেবেন। উর্দুর পর কিছুটা ফার্সী ও আরবী তাঁরা শিখাবেন। বর্তমান সরকারী জিলা স্কুলগুলোতে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

উপরোক্ত পরিবর্তনের জন্য সরকারী ব্যয় খুব সামান্য হবে, কিন্তু মুসলমানদের জন্য উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষা প্রবর্তনে সরকারী তহবিলের একটি পয়সাও ব্যয় করার দরকার হবে না। কলকাতা মোহামেডান কলেজের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস যে তহবিল আলাদা করে রেখেছেন সেটা এবং হুগলী ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিস্তর আয় সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো হলে তা দিয়েই এই ব্যয় সংকুলান হয়ে যাবে। একটি ইংরেজি কলেজের ব্যয় নির্বাহের জন্য যে তহবিলের অর্থ আমরা বর্তমানে তসরূপ করছি, দাতার ইচ্ছা মোতাবেক তা সৎভাবে ব্যয়িত হওয়া উচিত। দু'টি কলেজের পরিবর্তে একটিমাত্র ভাল কলেজ থাকা উচিত কিনা, অথবা কলেজটি কলকাতায়, না হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত হবে (যাদের দূরত্ব রেলপথে মাত্র বিশ মাইল), সেই সব বিস্তারিত বিতর্কে আমি এখন যেতে চাই না। অধিকাংশ বিষয়ের শিক্ষার দায়িত্ব বর্তমানের মত মুসলমান শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত করতে হবে ; তবে প্রতি কলেজে একজন করে আবাসিক ইউরোপীয় প্রিন্সিপাল থাকতে হবে এবং তাঁর আরবী জ্ঞান এবং ছাত্রদের উপর কর্তৃত্ব খাটাবার যোগ্যতা থাকতে হবে। এই পদের জন্য বার্ষিক ১২০০ পাউণ্ড থেকে ১৫০০ পাউণ্ড পর্যন্ত বেতন দেওয়া হলে বৃটিশ ও জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বহু পণ্ডিতের জন্যই তা আকর্ষণ সৃষ্টি করবে।

বর্তমান কলকাতা কলেজটির মত নিম্ন ও উচ্চস্তরের শিক্ষার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি না করে সুবিন্যস্ত পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে নিম্ন ও উচ্চতর শ্রেণীর

---

[১] দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগের ৩৮ টি 'হার্ডিঞ্জ ও মডেল স্কুলের' ছাত্রসংখ্যা ১৮৬১-৬২ সালের ১৪২১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৬৫-৬৬ সালে ২০৩৪ হয়। ঐ বছরই আমি আমার রিপোর্ট প্রণয়ন করি। উক্ত একই সময় প্রতি ছাত্র বাবদ ব্যয় ১২ শিলিং থেকে হ্রাস পেয়ে ৮ শিঃ ৪ পেঃ হয়।

মধ্যে সুষ্ঠু যোগসূত্র বজায় রাখতে হবে। বর্তমান উচ্চতর বা আরবী বিভাগকে ইঙ্গ-আরবী বিভাগে রূপান্তরিত করতে হবে এবং নিম্নতর শ্রেণী অর্থাৎ ইঙ্গ-ফার্সী বিভাগের সাথে তার সুসামঞ্জস্য যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। এভাবে পুনর্বিন্যাস করা হলে মুসলমান ছাত্ররা জিলা সরকারী স্কুল থেকে পাস করে সহজেই কলেজের দুইটি বিভাগ অতিক্রম করে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারবে। মুসলমানী আইনশাস্ত্র আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিয়মিত পড়ানো হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু এটাকেই শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়া ঠিক হবে না। মুসলমানী আইন মানে মুসলমান ধর্ম, এবং পাঠ্যসূচী থেকে এটাকে সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেয়া বুদ্ধিমানের পরিচায়ক হবে না। কারণ সম্পূর্ণ উঠিয়ে দিলে এই কলেজ বর্তমান মুসলমান বংশধরদের কাছে আকর্ষণীয় হবে না। তথাপি এটা মনে রাখতে হবে যে, যোগ্য মুসলমান আইন অফিসার সৃষ্টির যে মৌল উদ্দেশ্যে প্রথম দিকে আমরা মুসলমানী আইন অধ্যয়নকে উৎসাহিত করেছি, তার প্রয়োজনীয়তা এখন আর নেই। সরকারী চাকরি বা ব্যক্তিগত আত্মোন্নতি, কোনটির জন্যই বর্তমানে আর এটা শিখে লাভ নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পদ্ধতিতে হিন্দু আইন শিখানো হয় সেইরূপ পৃথক বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানী আইনশাস্ত্র ভালভাবেই শিখানো যেতে পারে। বর্তমানে ইসলামী বিধি মোতাবেক প্রাত্যহিক ড্রিলের পরিবর্তে আরবী ও ফার্সী সাহিত্য এবং উর্দুর মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পড়ানো যেতে পারে।

এইভাবে আমাদের উচিত এমন একটা উদীয়মান মুসলিম জেনারেশন গড়ে তোলা যারা নিজস্ব সংকীর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ও মধ্যযুগীয় ভাবধারার গণ্ডীতে আবদ্ধ না থেকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নমনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। নিজ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণের মত উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষার সাথে তাদেরকে কর্মজীবনে লাভজনক পেশায় অংশগ্রহণের উপযোগী ইংরেজি শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

মুসলমানদের মধ্যে নিম্ন ও মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তাদের নিজ সম্প্রদায় থেকে একজন স্পেশাল ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড বেতনে তাঁকে নিয়োগ করা যেতে পারে। তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে মুসলমান স্কুল ও কলেজেসমূহ[১] সম্পর্কে তদারকি চালিয়ে রিপোর্ট পেশ করা। অনুরূপ একটি চমৎকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতায় রয়েছে এবং তার ছাত্রসংখ্যা ১১০,

---

[১] মাদ্রাসা।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি কোন সরকারী গ্রান্ট পায়নি। ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতার অদূরে পশ্চিম হাওড়ার এক গ্রামে এখনও টিকে আছে, কিন্তু সেটা ভালভাবে চলছে না। ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের মাইমারীতে এবং সাসারামে অনুরূপ আর দুটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব টিকে আছে। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের শিক্ষা বিভাগীয় ইন্সপেক্টরের সম্পূর্ণ অগোচরে রয়েছে। আমার মনে হয়, এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে এখনও কার্যদক্ষতা অক্ষুণ্ন আছে এবং তাদের মান উন্নয়নের জন্য কিছু করা যায় কিনা তা তদারক করে দেখা প্রয়োজন। তারা ইংরেজ অফিসারদের নিয়মিত তদারকিতে রাজী হবে বলে মনে হয় না, কিন্তু সরকারী গ্রান্টের বিনিময়ে তাদের নিজ সম্প্রদায় থেকে নিযুক্ত একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টরের তদারকি ব্যবস্থায় সম্মত হবে। এভাবে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বাংলার কট্টর রাজদ্রোহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা রাজানুগত্যের পক্ষভুক্ত না করতে পারলেও অন্তত শান্তি-শৃঙ্খলার সপক্ষে টেনে আনতে পারব। মুসলমান স্কুলগুলোতে বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সতর্কতার সাথে নির্বাচিত ও সুসম্পাদিত উত্তম পাঠ্য বই প্রবর্তন করতে হবে। কলেজগুলোকে নির্দ্বিধায় ইংরেজ অধ্যক্ষদের এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে এবং এজন্য যে তহবিল বর্তমানে রয়েছে, সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে তাই যথেষ্ট, এবং সরকারী তহবিলের একটা পয়সাও ব্যয় করার প্রয়োজন হবে না।

এভাবে মুসলমান যুবকদেরকে আমরা আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষিত করে তুলতে পারি। তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এবং ধর্ম শিক্ষার বিষয়ে সামান্যতম হস্তক্ষেপ না করেই আমরা তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারি যাতে করে তারা ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করলেও ধর্মান্ধ হবে না। বিশ্বের অন্যতম চরম গোঁড়া সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা যেভাবে সহনশীলতার শিক্ষা পেয়েছে, মুসলমানদেরও সেই পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত করা যেতে পারে। অনুরূপ সহনশীলতা মুসলমানদের তাদের পূর্বপুরুষদের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করে আনবে, যে গোঁড়ামী তাদেরকে নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা ও অপরাধজনক কাজের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। আর এ সবই তারা করে এসেছে ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে। কোন পদ্ধতির প্রবর্তনের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানদের সমভাবে উচ্চতর ধর্মীয় ধারণায় উন্নীত করা সম্ভব সে সম্পর্কে এখানে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে আমি দৃঢ়ভাবে

বিশ্বাস করি যে, অনুরূপ উন্নত অবস্থায় তারা একদিন উপনীত হবে এবং এতদিন নেতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে এ বিষয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ। ইংরেজরা ভারতে এতদিন শুধু প্রতিমা ভঙ্গকারীর নগণ্য ভূমিকাই পালন করে এসেছে।

ইত্যবসরে সরকারের কর্তব্য হবে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ দমনের সাথে সাথে তাদের অসন্তুষ্টির কারণগুলো দূর করা। আমাদের বিজয় ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে তারা যে দুর্দশায় পতিত হয়েছে এবং যে চরম সর্বনাশের মধ্যে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য তাদের প্রতি আমাদের অনুসৃত নীতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজদ্রোহী অংশের সাথে এমনভাবে মোকাবিলা করতে হবে যাতে করে তারা শুধু আদালতের বিচারেই নয়, এমনকি জনমতের কাছেও দোষী সাব্যস্ত হবে। উপযুক্ত সিদ্ধান্তের কার্যকরীকরণের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণের ফলে রোমের সর্বাধিক গুণান্বিত সম্রাটের নামের উপর শত শত বছর ধরে অপবাদ আরোপিত হয়েছে।[১] এতদিন কেবল যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আর কোথায়ও আমরা রক্তপাত ঘটাইনি এবং তার ফলে একদল ওয়াহাবী ধর্ম প্রচারকের সৃষ্টি হলেও ওয়াহাবী মোজাহিদের একটা বাহিনী গড়ে উঠতে পারেনি। আমি যখন এই পৃষ্ঠাটা লিখছি সেই সময় বৃটিশ বাহিনীর সেই কুখ্যাত মাংস সরবরাহকারী[২] ১৮৬৪ সালে যাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, পাটনায় তার সাবেক ধর্ম-ভাইদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তার দণ্ডাদেশ যদি কার্যকরী করা হত, তাহলে প্রতি বছর হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান তার মাজার জিয়ারত করতে যেত। ধর্মের জন্য মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিরা সব যুগেই অখ্যাতি থেকে খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করে থাকে। দিল্লীর সেই অখ্যাত মাংস বিক্রেতার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী না করার মধ্য দিয়ে আমাদের সরকার মৃত্যুদণ্ড প্রদানের অপকারিতা সম্পর্কে সতর্ক হতে পেরেছেন। কারণ দণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হলে মুসলমানরা সেটাকে ধর্মের জন্য শাহাদত বরণ বলেই গণ্য করত। এটা কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, রোমান সেনাবাহিনীর শুকরের মাংস সরবরাহকারী ক্যাপাডসিয়ার জর্জ কিভাবে অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুবরণের পর অখ্যাত, অজ্ঞাত জীবন থেকে দেবতার মর্যাদায় উন্নীত হয়ে মেরী ইংলণ্ডের সেন্ট জর্জ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

---

[১] জুলিয়ানের অধীনস্থ আফ্রিকার ভাইসরয় এবং মিসরের অত্যাচারী ডিউকের ব্যবহার।

[২] মোহাম্মদ শফি।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—১

মক্কার আইনশাস্ত্রবিশারদগণের সিদ্ধান্ত

(মুসলমানদের তিনটি প্রধান ধর্মীয় শাখার প্রধানগণ)

প্রশ্ন

'নিম্নোক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আপনার (আপনার মহত্ত্ব চিরঞ্জীব হোক) মতামত কি ঃ খ্রীস্টান শাসিত ভারত, যেখানে শাসক-শক্তি নিয়মিত ; দৈনন্দিন নামায, দুই ঈদের নামায প্রভৃতিসহ ইসলামের যাবতীয় বিধিসমূহ প্রতিপালনে বাধা দেয় না, অথচ ইসলামের কতিপয় বিধান লংঘন করার অনুমতি দেয়, যেমন, মুসলম্যান পিতার ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণের পরেও মুসলমান পিতৃপুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভের অনুমতি দেয়, এহেন ভারত দারুল-ইসলাম কিনা ? উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দিন এবং তাহলে আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।'

জওয়াব—১

'সকল প্রশংসা শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের প্রভু। হে আল্লাহ, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

যতদিন ইসলামের নিজস্ব বিধিবিধানের কিছুটা চালু থাকবে ততদিন এটা দারুল-ইসলাম থাকবে।

আল্লাহ স্বয়ম্ভু, পবিত্র ও মহান ঃ

এটা এমন এক ব্যক্তির 'নির্দেশ' যিনি সর্বশক্তিমানের গোপন মদদ আশা করেন, যিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন, এবং যিনি পয়গম্বরের শান্তি ও আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করেন।

(স্বাক্ষর) জামাল ইবনে আবদুল্লাহ শেখ ওমারুল হানাফি

মক্কার বর্তমান মুফতি (সম্মানিত)। আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর পিতাকে রহম করুন।'

জওয়াব—২

' সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি অদ্বিতীয় ; এবং আমাদের ধর্মগুরু মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর, তাঁর আওলাদদের উপর, সাহাবীদের উপর এবং তাহার উম্মতদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

হে আল্লাহ, সঠিক পথে চলার জন্য আমি আপনার মদদ প্রার্থী।

হ্যাঁ, ইসলামের কিছু পরিমাণ বিধিবিধান যতদিন প্রচলিত থাকবে ততদিন এটা দারুল-ইসলাম।

আল্লাহ স্বয়ম্ভু, পবিত্র ও মহান।

এমন এক ব্যক্তি এই জওয়াব লিখেছেন যিনি করুণাময় আল্লাহর অনুগ্রহপ্রার্থী। আল্লাহ তাঁকে, তার পিতা-মাতাকে, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও ভ্রাতাগণকে, বন্ধু-বান্ধবদিগকে এবং সকল মুসলমানদের ক্ষমা করুন।

(স্বাক্ষর) আহমদ ইবনে জৈনী দাহ্‌লান,

মক্কার শা'ফী সম্প্রদায়ের মুফতি (পরহেজগার)।

জওয়াব—৩

'সকল প্রশংসা শুধু অদ্বিতীয় আল্লাহরই প্রাপ্য! হে সর্বশক্তিমান! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

দাসুকীর মতামতে লিখিত আছে যে, কোন ইসলামী দেশ কাফেরদের করতলগত হওয়া মাত্রই দারুল-হার্ব হয়ে যায় না ; কেবলমাত্র ইসলামের সকল বা অধিকাংশ বিধিবিধান নাকচ হলেই দেশটি দারুল হার্বে পর্যবসিত হবে।

আল্লাহর স্বয়ম্ভু! আমাদের ধর্মগুরু মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর, তাঁর আওলাদবৃন্দ ও সাহাবীদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

(স্বাক্ষর) হোসেন-বিন-ইবরাহিম,

মক্কায় মালেকী সম্প্রদায়ের মুফতি (মশহুর)'

পরিশিষ্ট—২

উত্তর ভারতের আইনশাস্ত্রবিশারদগণের সিদ্ধান্ত

ভাগলপুরের কমিশনারদের ব্যক্তিগত সচিব সাঈদ আমীর হুসেন কর্তৃক প্রশ্নটি ভাষান্তরিত হয়েছে।

নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে আপনারা যারা বিজ্ঞ ও ইসলামী বিধিবিধানের অনুসারী তাঁরা মতামত দিন ঃ

যে ভারত আগে মুসলমান শাসকের অধীনস্থ ছিল, কিন্তু বর্তমানে খ্রীস্টান সরকারের শাসনাধীনে রয়েছে ; এবং যেখানে খ্রীস্টান শাসক মুসলমান প্রজাগণকে তাদের ধর্মীয় বিধিবিধান প্রতিপালনে, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, শুক্রবারের নামায ও জামাত আদায় করতে কোনভাবেই বাধা দেয় না, এবং উপরোক্ত বিষয়সমূহ চর্চা করতে মুসলমান শাসকের মত সমান রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করেছে ; এবং যেখানে শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন শক্তি ও উপায়-উপকরণ মুসলমান প্রজাদের নেই, এবং যেখানে যুদ্ধ বাঁধলে মুসলমানদের পরাজয়বরণ ও ইসলামের অবমাননার আশংকা রয়েছে— সেই ভারতে জিহাদ আইনসঙ্গত কিনা ?

অনুগ্রহপূর্বক প্রামাণ্য দলিল উল্লেখ করে জওয়াব দিবেন।

ফতোয়া তাং ১৭ই রবিউস্‌সানী, ১২৮৭ হিঃ মোতাবেক ১৭ই জুলাই, ১৮৭০ খ্রীঃ।

এখানে খ্রীস্টানরা মুসলমানদের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা নিয়েছে, এবং যেখানে মুসলমানদের রক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানে জিহাদ চলতে পারে না ; কারণ মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে রক্ষাকবচ ও স্বাধীনতা না থাকলেই শুধু ধর্মযুদ্ধের উদ্ভব হতে পারে, কিন্তু অনুরূপ অবস্থা এখানে বিদ্যমান নেই। এতদ্ব্যতীত এখানে মুসলমানদের বিজয় ও ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। এ কারণে জিহাদ এখানে আইনসিদ্ধ নয়।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে মৌলবীগণ এখানে মানহাজ উলগফফার ও ফতোয়া-ই-আলমগীরী থেকে প্রামাণ্য উদ্ধৃতি পেশ করেন।

মৌলবী আলী মুহাম্মদ (লক্ষ্ণৌ) ;
মৌলবী আব্দুল হাই (লক্ষ্ণৌ) ;
মৌলবী ফজলুল্লাহ (লক্ষ্ণৌ) ;
মৌলবী মোহাম্মদ নঈম (লক্ষ্ণৌ) ;

সীলমোহর

মৌলবী রহমত উল্লাহ্ (লক্ষ্ণৌ) ;
মৌলবী কুতুব-উদ্‌দীন (দিল্লী) ;
মৌলবী লুতফুল্লাহ্ (রামপুর) এবং অন্যান্য।

পরিশিষ্ট—৩

কলকাতা মোহামেডান সোসাইটির সিদ্ধান্ত

উত্তর ভারতের আইনশাস্ত্রবিদগণের মতামতের বিরোধিতার পর ভারত দারুল-ইসলাম এই ঘোষণা প্রচার করে মৌলবী কারামত আলী বলেন ঃ

'দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, " এদেশে জিহাদ করা আইনসঙ্গত কিনা ?" প্রশ্নটির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে গেছে। কারণ, দারুল-ইসলামে জিহাদ কখনও আইনসঙ্গত হতে পারে না। এটা এত স্পষ্ট যে, এর সমর্থনে কোন যুক্তি প্রমাণ বা প্রামাণ্য দলিল পেশ করার প্রয়োজন করে না। এখন কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তি যদি হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বৃটিশ ভারতের শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে সে যুদ্ধকে 'বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করাই সঙ্গত হবে ; এবং মুসলমানী আইনে বিদ্রোহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সুতরাং একই কারণে অনুরূপ যুদ্ধ বেআইনী হবে ; এবং কেউ যদি অনুরূপ যুদ্ধ শুরু করে তবে মুসলমান প্রজারা তাদের শাসককে সাহায্য করতে এবং শাসকের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য থাকবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ফতোয়া-ই-আলমগীরীতে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।'

সমাপ্ত

ানস দি ইন্ডিয়ান মুসল
ানস দি ইন্ডিয়ান মুসল
ানস দি ইন্ডিয়ান মুসল
ানস দি ইন্ডিয়ান মুসল
ানস দি ইন্ডিয়ান মুসল
ানস দি ইন্ডিয়ান মুসল
ানস দি ইন্ডিয়ান মুসল
ানস দি ইন্ডিয়ান মুসল
ানস দি ইন্ডিয়ান মুসল
ানস দি ইন্ডিয়ান মুসল